শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রহ.
মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রহ.

কালিমায়ে তাইয়েবা

বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

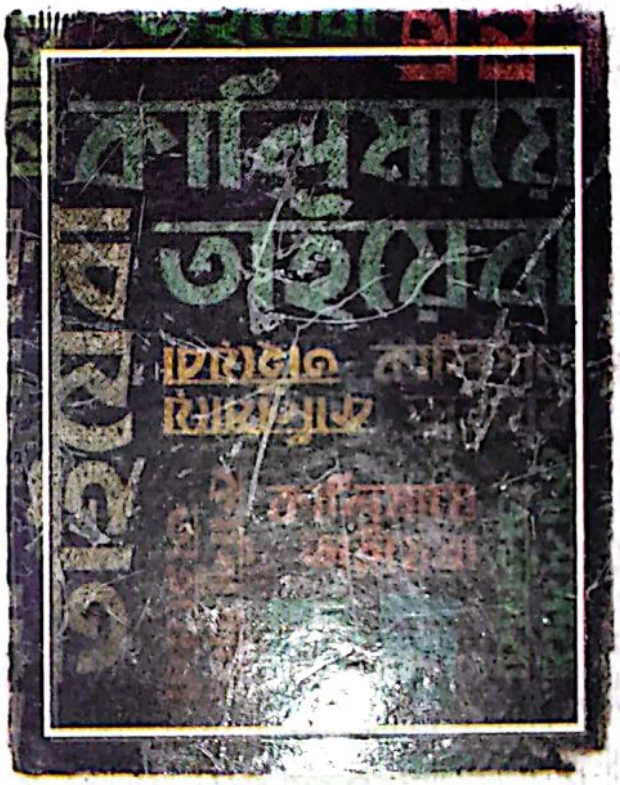

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

কালিমায়ে তাইয়েবা
বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

[দুটি বইয়ের সমষ্টি]

মূল

শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রহ.

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রহ.

অনুবাদ

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

প্রকাশনায়

সওগাত প্রকাশন

CamScanner

কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রহ.
মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

প্রথম সংস্করণ
মুহাররম ১৪৪১ হি.
সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈ.

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হি.
নভেম্বর ২০১৯ ঈ.

দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ
রজব ১৪৪১হি.
মার্চ ২০২০ ঈ.

গ্রন্থস্বত্ব
অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান
মাকতাবাতুন নূর, ২য় তলা, ১১/১ ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৯৭১৯৬০০৭১।

আর-রিহাব প্রকাশনী, ২য় তলা, ১১/১ ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৯১০৭০৬০২৯।

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, মোল্লার বই.কম, পথিকশপ.কম,
আমাদের বই.কম, সিজদা.কম

নির্ধারিত মূল্য
১৮০.০০ (একশো আশি টাকা মাত্র)

CamScanner

সেই কওমের সমীপে-

যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ অবশ্যই এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। (যারা হবে) ঈমানদারদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর। (যারা) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। তা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, পরিজ্ঞাত। [সূরা মায়িদা : ৫৪]

তাঁদের প্রতিপাদ্য

বানাও আমাদের,

হে আল্লাহ!

এ পুস্তিকা অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্য হলো, فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى তথা আসহাবে কাহফের অনুকরণকারী এমন কতিপয় তরুণ তৈরি হওয়া, যারা আপন রবের প্রতি ঈমান আনবে, আর রব তাঁদের বোধ-শোধ বাড়িয়ে দেবেন।

একজন লেখকের এ উক্তিটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়- আসহাবে কাহফের গর্তের পরিমাণ আশ্রয়ের জায়গাও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেবেন না, আল্লাহর প্রতি এমন খারাপ ধারণা আমরা কেনো করছি? আসহাবে কাহফের গর্ত থেকেও শত্রু আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে, শত্রুকে আমরা এতটা কাদেরে মুতলাক কেনো ভাবছি?

CamScanner

চয়নিকা

- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবি আমাদের নিকট এই নয় যে, আমরা তার শব্দগুলো গণনা করব ও মুখস্থ করব। কারণ এ কালিমার শর্তাবলি কত সাধারণ মানুষের অর্জিত রয়েছে এবং তারা তা আঁকড়ে ধরে আছে! কিন্তু যদি তাদের বলা হয়– তার শব্দ-সংখ্যা কয়টি ও কী কী গুণে বলুন দেখি, সুন্দরভাবে বলতে পারবে না। পক্ষান্তরে কালিমার শব্দগুলোর কত হাফেজ আছে, যারা তীরের বেগে সেগুলোতে ছোটাছুটি করে! অথচ তাদের দেখবেন, কালিমার সাংঘর্ষিক অনেক জিনিসের তারা শিকার হচ্ছে। তাওফিক বস্তুত আল্লাহর হাতে। পৃ. ৫০

- ...মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে পরবর্তীতে এক বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাহলো- তারা শাসনব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহর শরিয়তকে বর্জন করেছে। শরিয়তকে পশ্চাদ্‌গামিতা ও পশ্চাৎপদতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এবং সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নশীল যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার যোগ্যতা না থাকার দায়ে দায়ী করেছে। এটি মুসলমানদের জীবনে এক অভিনব ধর্মত্যাগ।

  কারণ, বিষয়টি অসার দোষারোপ ও ভিত্তিহীন অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং শরিয়তকে জীবনের বাস্তবতা থেকে কার্যত অপসারণ করা পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইসলামি শরিয়ত বর্জন করে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ফরাসি বা ব্রিটিশ বা আমেরিকান বা ধর্মদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি জাহিলি ও কুফরি আইন। উদাহরণস্বরূপ ২০১১ সালের ৩০ শে জুন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পৃ. ১১৯

- যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি মুছে গেছে, ফলে সে শরিয়তের পরিবর্তে মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, একজন আলেম তার চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন– 'তার অবস্থা হলো মলের পোকার মতো, যা

CamScanner

মেশক ও সুগন্ধময় গোলাবের সুঘ্রাণে কষ্ট পায় এবং টয়লেটের মল-মূত্রে বেঁচে থাকে।' পৃ. ১৫৬

- শরিয়তের সঙ্গে সবচেয়ে বড় হঠকারিতা, শরিয়তের বিধিবিধানের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাধিক প্রতিযোগিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের স্পষ্টতর বিরোধিতা হলো ঐসব আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেগুলোর ভিত্তি ও উৎস ফরাসি, আমেরিকান, ব্রিটিশ প্রভৃতি মানবরচিত আইন। এর চেয়ে বড় কুফরি আর কী আছে?! 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল' এ সাক্ষ্যদানের বড় বিরোধিতা আর কী হতে পারে?! পৃ. ১৬৬

- কাফেরদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করার ঈমান ভঙ্গের কারণটি বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেছে। প্রথমে হয়েছে মনের টান। তারপর তাদের খোদাদ্রোহী মতবাদসমূহ গ্রহণ করা। এরপর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দেওয়া। তারপর মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো তাদেরকে অবগত করা। এরপর জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করা। পৃ. ১৭৩

- ...আর ক্ষমতাসীনদেরকে দাওয়াতের কাতারে আনার জন্য শিথিলতাকে গ্রহণ করা –তা যত সামান্যই হোক– এক ধরনের আত্মিক পরাজয়। আর এই পরাজয় অর্জন হচ্ছে দাওয়াতের সাহায্যার্থে ক্ষমতাসীনদের উপর ভরসা করার মাধ্যমে। অথচ দাওয়াতের ময়দানে মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা জরুরি। বলাবাহুল্য, পরাজয় যখন অন্তরের গভীরে একবার প্রবেশ করে, তা আর জয়ে রূপান্তরিত হয় না!! পৃ. ২৩৭-২৩৮

- কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর নববি যুগে ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে ইসলামের দিকে দাওয়াত দানকারী এমন কোনো কাফেলার অস্তিত্ব ছিল না, যাদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে তারপর জিজয়া প্রদানের আহ্বান ছিল না। এবং জিজয়া প্রদান করতে অসম্মত হলে এরপর যুদ্ধের আহ্বান ছিল না। পৃ. ২৫৫

CamScanner

অনুবাদকের কৈফিয়ত

الحمدُ للهِ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد،

বক্ষ্যমাণ الـوَلَاءُ وَالـبَرَاءُ فِي الإسـلامِ কিতাবটির বাংলাভাষায় তরজমা হলে তার নাম দেওয়া যাবে 'ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা'। মূল বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে সঙ্গত কারণেই কিতাবটির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল। লেখক শায়খ ডক্টর মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রাহিমাহুল্লাহ [১৩৭৬-১৪৪০হি.] যেমন প্রয়োজন অনুভব করেছেন, তেমনি পূরণও করেছেন। ভূমিকায় তিনি তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন–

১. তাওহিদের কালিমা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'তে বর্ণিত ইসলামের হাকিকত, কালিমার তাৎপর্য ও শর্তাবলি।

২. 'ওয়ালা-বারা' তথা 'শত্রুতা-মিত্রতা' বিষয়টি তাওহিদের কালিমার আবশ্যক বিষয়াদির অন্যতম।

৩. ঈমান ভঙ্গের কারণাদি তথা শিরক, কুফর, নিফাক ও ইরতিদাদ।

* * *

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও কিতাবটির মানের বিবেচনায় এটি বাংলাভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করছিলাম। কাজটি যদি এ দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় হয় এবং আমার জন্য উপকারী হয়, তাহলে আল্লাহ যেন ইতকান ও ইখলাস তথা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

উক্ত ভাবনার পরবর্তী একদিনের অভিজ্ঞতা– জনৈক ভাইয়ের সঙ্গে 'কালিমার দাওয়াত', 'নবিওয়ালা কাজ', 'আল্লাহর রাস্তার

মেহনত' ও 'নবির তরিকা' প্রভৃতি বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তখন তীব্রভাবে অনুভব করলাম; আপাতত এ কিতাবের ভূমিকা অংশটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সামনে আসা সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন,

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

যাতে যে ধ্বংস হওয়ার, সে প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সুরা আনফাল : ৪২]

বস্তুত কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য শুধু নিয়ত খালেস থাকা যথেষ্ট নয়। কবুল হওয়ার জন্য আমলটি সম্পাদনও হতে হয় নববি তরিকায়। যেমনটি হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ [১০৭-১৮৭ হি.] বলেছেন–

আমল যদি খালেস নিয়তে হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তা কবুল হয় না। তদ্রূপ যদি যথাযথ হয় কিন্তু খালেস নিয়তে না হয়, তা-ও কবুল হয় না। যতক্ষণ না খালেস নিয়তে হয় এবং যথাযথ হয়। খালেস তখন হয়, যখন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়। পক্ষান্তরে যথাযথ তখন হয়, যখন তা সুন্নাহ অনুসারে হয়।[১]

তারপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফিকে অনুবাদ কর্মটি সমাপ্ত হয় এবং আমার সুযোগ ও সামর্থ অনুসারে কাজটিকে আমি উপকারী বানানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক অনূদিত পুস্তিকাটিতে যত্নের নিদর্শন পাবেন।

* * *

'যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ' এবং 'মানব-জীবনে লা-ইলাহা

---

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত اِقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ পৃ. ৪৫১, তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ আল-ফেকি রাহিমাহুল্লাহ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৯ হি।

ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতির প্রভাব' শিরোনামের লেখা দুটো, মূল আরবি কিতাবে উল্লিখিত তিন বিষয়ের দ্বিতীয়টির অধীনে ছিল। লেখা দুটো আমার কাছে প্রথম বিষয়টির অংশ হওয়া উপযোগী মনে হয়েছে। তাই বাংলা অনুবাদে লেখা দুটো প্রথম বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদে এ জাতীয় ছোট-খাট আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

কিতাবটির বিভিন্ন স্থানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা যুক্ত করা আবশ্যক মনে হয়েছে এবং নিঃসঙ্কোচে সেগুলো যুক্ত করা হয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে যুক্ত কথাগুলো এই ( ) বন্ধনীর ভেতরে রেখেছি। অতএব অনূদিত পুস্তিকার এই ( ) বন্ধনীর সবগুলো কথা আমার পক্ষ থেকে যুক্ত। মূল আরবি কিতাবের লেখকের উপর এগুলোর দায় বর্তাবে না। পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য যুক্ত অংশগুলোর শেষে '-অনুবাদক' লিখে দিয়েছি। আর সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত পুস্তিকার এই [ ] বন্ধনীর লেখাগুলো মূল কিতাবের অংশ। অবশ্য মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখগুলো সবই বাংলা অনুবাদের সংযোজন। তারিখগুলো মূল কিতাবের নয়। অতএব এগুলোতে যদি কোনো ভুল থাকে, তার জন্য মূল লেখক দায়ী থাকবেন না।

* * *

মূল الوَلَاءُ والبَرَاءُ فِي الإسلام কিতাবটির পাঠদান মাহাদে আমার দায়িত্বে রয়েছে এবং আমার পুত্র সাইফুল্লাহ ফুআদ চলতি শিক্ষাবর্ষে [১৪৪০-৪১ হি.] এ কিতাবের আমার ছাত্রও বটে। বর্তমান পুস্তিকার এ কাজে তার উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। দোআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাকে, তাকে, তার ভাইবোন এবং দীনি মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ সকলকে কাবিলিয়্যাত ও মাকবুলিয়্যাত [যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা] দান করুন। এবং সুস্থতা ও অবসরতার সাথে নববি তরিকায়[১] কালিমা তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে দাওয়াত দানে জীবন ব্যয় করে, মাগফিরাত ও আজরে কারিমের সুসংবাদ লাভ করে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করার তাওফিক দিন। আমিন!

---

১. ২৫৪-২৫৭ নং পৃষ্ঠায় নববি তরিকার দাওয়াতের বিবরণ দেখুন।

CamScanner

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে চোখের শীতলতা এবং বানান আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ। [সূরা ফুরকান : ৭৪]

আমার অন্তরের কামনা হলো- মসজিদে মসজিদে সম্মিলিত তালিমের হালকা ও সর্বস্তরের মাঝে পুস্তিকাটির তালিম ও মুজাকারা [পারস্পরিক আলোচনা] যেন ব্যাপকতর হয় এবং সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তা পড়া ও শোনা হয়। ইনশাআল্লাহ কালিমার হাকিকত বুঝার জন্য এবং নিজের ঈমানের হেফাজতের জন্য এটি অনেক বড় মাধ্যম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

প্রসঙ্গত, ইসলামের দাওয়াতের নববি তরিকা অবগত হওয়ার জন্য, উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের শায়খ যুবাইর আহমদ সিদ্দিকি দা. বা. রচিত 'আদ-দীন আন-নাসিহাহ' বইটি পাঠ করা যায়। বইটির বাংলা অনুবাদ এ নামেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান : ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* * *

শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.), ইমাম হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) ও মহান মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ হি.) রাহিমাহুমুল্লাহর উদ্ধৃতি, ভূমিকাসহ পুরো কিতাবে যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে। তাই তাঁদের পরিচিতিমূলক কিছু জরুরি কথা এখানে উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি-

শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩৩-১৪২০ হি.) তাঁর অমর গ্রন্থ رِجَالُ الفِكْرِ وَالدَّعْوَةِ فِي الإِسْلَامِ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে দীর্ঘ ৩২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী (৪১৭-৭৪৫) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর জীবনী লিখেছেন। সেখানে তিনি তাঁর সম্বন্ধে হাফেজ জাহাবি (৬৭৩-৭৪৮ হি.), ইবনে কাসির (৭০১-৭৭৪ হি.), ইবনুল

কাইয়িম রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মনীষীদের অনেক স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর অন্যতম প্রতিপক্ষ ছিলেন সে যুগের শাফেয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা কামালুদ্দিন জামালকানি রাহিমাহুল্লাহ (৬৬৬-৭২৭ হি.)। প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য করেছেন দেখুন! আল্লামা জামালকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন–

'আল্লাহ তাঁর [ইবনে তাইমিয়ার] জন্য উলুম ও মারিফাত এতো সহজ করে দিয়েছেন, যেমন দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে সহজ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে যখন ইলমের কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হতো, দর্শক ও শ্রোতা বিস্ময়ে ভেবে উঠত- তিনি বুঝি এ শাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই জানেন না! অগত্যা এ সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলত- তাঁর দৃষ্টান্ত হতে পারে না। সকল মাজহাবের ফকিহগণ যখন তাঁর মজলিসে বসতেন, নিজ নিজ মাজহাবের এমন অনেক দুর্লভ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হতেন, যা তাঁরা পূর্বে অবগত ছিলেন না। এমন কথা কেউ শুনেনি যে, তিনি কোনো বিষয়ে কারো সঙ্গে যুক্তি-তর্কে হেরে গেছেন। যখনই তিনি ইলমের কোনো শাখায় মুখ খুলেছেন –চাই তা শরয়ি বিষয়ে হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে– সে শাখার শাস্ত্রজ্ঞ ও ধারকবাহকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। রচনার সৌন্দর্যে তাঁর ছিল সবিশেষ পাণ্ডিত্ব।' الكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ পৃ. ৫ দ্রষ্টব্য।

আরবি 'উইকিপিডিয়া'তে قائِمَةُ مُؤَلَّفَاتِ ابنِ تَيْمِيَةَ [ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলির তালিকা] শিরোনামের প্রবন্ধে আছে– أَسْمَاءُ مُؤَلَّفَاتِ ابنِ تيمية [ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলির নাম] নামক কিতাবে উল্লেখিত তাঁর রচনাবলির সংখ্যা প্রায় ৩৩০টি। সেগুলোর অনেকগুলো مَجمُوعُ الفَتَاوَى [ফাতওয়াসমগ্র] কিতাবে একত্র করা হয়েছে যা ৩৭ খণ্ডে মুদ্রিত রয়েছে।

তিনি রণাঙ্গনের অনেক বড় সক্রিয় একজন মুজাহিদও ছিলেন। তাতারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মুজাহিদদের তিনি মুরুব্বি

ছিলেন। উপরন্তু মিশরের সুলতান নাসির মুহাম্মদের মুরুব্বিও ছিলেন। মুজাহিদদের সাহস যোগানো, মনোবল হারানো বাদশাহর মন চাঙ্গা করাসহ যুদ্ধে নানাবিধ কার্যক্রমে তিনি তৎপর ছিলেন। রাতে সীমান্তপ্রহরী মুজাহিদদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁদের উৎসাহ বাড়াতেন। লড়াইয়ের উদ্দীপনায় তাঁদেরকে উজ্জীবিত করতেন।

তাতারিদের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ফতোয়া এখনো ইতিহাসের পাতায় দীপ্তমান। তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন, 'যদি তোমরা আমাকে তাতারিদের কাতারে তাদের সাহায্যকারীরূপে দেখতে পাও, তাহলে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, যদিও আমার গলায় কোরআনের কপি ঝুলানো থাকে।'

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন رِجَالُ الفِكْرِ والدَّعْوَةِ فِي الإسلام চতুর্থ সংস্করণ, দারু ইবনি কাসির, দামেশক।

ইমাম হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর নাম মুহাম্মদ। পিতার নাম আবু বকর। পিতা মহোদয় দামেশকের জাওজিয়্যা মাদরাসার পরিচালক হওয়ার কারণে তাঁকে ইবনুল কাইয়িম (পরিচালকের পুত্র) বা ইবনু কাইয়িমিল জাওজিয়্যা (জাওজিয়্যার পরিচালকের পুত্র) বা ইবনু কাইয়িমিল মাদরাসাতিল জাওজিয়্যা (জাওজিয়্যা মাদরাসার পরিচালকের পুত্র) বলা হয়।

তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর অন্যতম শিষ্য ও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ ধারক-বাহক। শায়খের মৃতুর পর শায়খের ইলমের পুনর্বিন্যাস তিনি যেমন করেছেন, তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের পক্ষে তেমনটি সম্ভব হয়নি। তাঁকে শায়খুল ইসলামের বিমূর্ত প্রতীক বলা হত। ইলম-মারেফাত, তাকওয়া-তাহারাতে তিনি ছিলেন যুগের অদ্বিতীয়।

সে যুগের হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম কাজি বুরহানুদ্দিন জুরায়ি রাহিমাহুল্লাহ [৬৮৮-৭৪১ হি.] বলেছেন–

'বর্তমানে আসমানের নিচে তাঁর তুলনায় ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী কেউ নেই।' তিনি তাফসির, হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ- এককথায় ইলমের বিভিন্ন শাখায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিশেষভাবে কোরআন পাকের তাফসিরের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল সীমাহীন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রচনা নিম্নরূপ-

١. «زَادُ المَعَادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ العِبَادِ»، ٢. «التفسيرُ القَيِّمُ»، ٣. «مَدَارِجُ السالِكِينَ بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، ٤. «الرُّوحُ فِي الكلامِ على أَرْوَاحِ الأَمْوَاتِ»، ٥. «إِعْلَامُ المُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ العالَمِينَ».

তিনি ৬৯১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরির ১৩ই রজব পরম করুণাময়ের দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত رِجَالُ الفِكْرِ والدَّعْوَةِ فِي الإسلامِ খ. ২ পৃ. ৭১৯-৭৩২।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ

ভারত উপমহাদেশের কতক মহলে মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে কিছু নেতিবাচক ধারণা আছে। সেটি লক্ষ্য রেখে বলা যায়, দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার আমরণ সদস্য ও আমাদের দেওবন্দি ধারার প্রখ্যাত আকাবির হজরত মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রাহিমাহুল্লাহ [১৩২৩-১৪১৭ হি.] সেসকল ধারণা সবিস্তারে খণ্ডন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে 'ওয়াহাবি আন্দোলন ও উলামায়ে দেওবন্দের মূল্যায়ন' নামে। অনুবাদক : আবদুল্লাহ আল ফারুক। প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার ঢাকা। শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভি ও কারি মুহাম্মদ তাইয়িব রাহিমাহুমাল্লাহ বইটির বিষয়বস্তু সমর্থন ও সত্যায়ন করে ভূমিকা লিখেছেন। তাই শায়খ

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য উক্ত বইটি পাঠ করার বিশেষ পরামর্শ রইল।

* * *

এখন এ মলাটের দ্বিতীয় বইটি সম্পর্কে কিছু কথা। হজরত মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রাহিমাহুল্লাহ রচিত **'কালিমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য'** শিরোনামের আমার এ অনুবাদটি পূর্বে আরো দু-বার ছাপা হয়েছে। এ হিসেবে এটি তৃতীয় প্রকাশ। তবে একে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম প্রকাশও বলা যাবে। (এখন -রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরিতে- বলতে হবে 'তৃতীয় সংস্করণের প্রথম প্রকাশ'।) কারণ, অনুবাদটি বর্তমানে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ'** বইটির সঙ্গে ছাপা উপলক্ষে আল্লাহর তাওফিকে নতুনকরে পরিমার্জন করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াতের কালিমা তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ-র উভয়াংশের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বইটির ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে কালিমার উভয়াংশ তথা তাওহিদে ইলাহি ও রিসালাতে মুহাম্মদি-র ব্যাখ্যা পূর্ণ তাহকিকের সাথে যথাসম্ভব প্রভাবপূর্ণ শৈলীতে করা হয়েছে। কালিমার প্রাণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, গ্রহণকারীদের নিকট এর দাবি কী? আল্লাহ তাআলা মূল উর্দুর মতো বাংলা অনুবাদটিকেও উপকারি বানান এবং একে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন! আমিন!

একটি নিবেদন : সচেতন পাঠকের সামনে আমাদের যে সকল বিচ্যুতি প্রকাশ পাবে, অনুগ্রহপূর্বক আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে সেগুলো উপহার দেবেন। আপনাদের জন্য থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান এবং থাকল আমাদের পক্ষ থেকে অগ্রিম কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ চাহেত পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব।

একটি আবেগের কথা- এমন বন্ধু বর্তমানে খুবই কম, যে হয় আন্তরিক, স্পষ্টভাষী, চাটুকারিতা থেকে দূরে, হিংসা এড়িয়ে চলে, বন্ধুকে তার দোষ-ত্রুটির সংবাদ দেয়, তাতে বৃদ্ধিও করে না,হ্রাসও করে না, যা

CamScanner

ত্রুটি নয় তাকে ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে না, সকল অনৈতিক স্বার্থপরতার উর্ধ্বে থাকে। আল্লাহ আমাকে এবং দীনের জন্য যারা আমাকে ভালোবাসেন, তাদের সকলকে এমন কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু জুগিয়ে দিন। আমিন!

وَصَلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصَحْبِه وتابِعِيهِم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

বিনীত

সফিউল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)

মুকিম, মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা

১৮-০১-১৪৪১ হি. মোতাবেক ১৮-৯-২০১৯ ঈ.

বুধবার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

أَحْمَدُ اللهَ تعالى، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على خَيْرِ خَلْقِهِ وصَفْوَةِ رُسُلِهِ محمدِ بن عبدِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وتابِعِيهِم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد،

পুস্তিকার প্রথম সংস্করণটি ছাপার জন্য প্রেসে যাওয়ার পর থেকেই, খুচরা সময়গুলোতে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আল্লাহর তাওফিকে শুরু করে দিয়েছিলাম। তাই প্রকাশিত হওয়ার মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে যখন অবগত হলাম, প্রায় সবগুলো কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করার সময় সন্নিকটে, তখন বাড়তি সময় নেওয়ার জন্য প্রকাশকের নিকট অনুরোধ করার প্রয়োজন হয়নি। সংস্করণ দুটো পাশাপাশি রেখে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হলে সচেতন পাঠক কমপক্ষে ৩৭০টি স্থানে চলতি সংস্করণের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করবেন। (তালিকা সংরক্ষিত আছে।) ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

পুস্তিকাটির এই নতুন প্রকাশ-ক্ষণে المُعْجَمُ الوَسِيطُ فِي الإعرابِ কিতাবের সম্পাদক ডক্টর মুস্তফা জুযু-এর একটি উক্তি মনে পড়ছে। লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অনুষদের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এ অধ্যাপক, উল্লিখিত কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের শুরুতে লিখেছেন-

حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ إنسانًا حَتَّى تُخْطِئَ وتَنْسَى وتَسْهُوَ. تِلْكَ مُسَلَّمَةٌ. ولِذلِكَ تَدْعُوكَ كُتُبُكَ -كُلَّمَا أَرَدْتَ إعَادَةَ طَبْعِهَا- إلى تَنْقِيحِهَا والِاسْتِدْرَاكِ، حَتَّى على ما صَوَّبْتَهُ فِيهَا.

মানুষ হওয়াই আপনার জন্য যথেষ্ট যে, আপনি ভুল করবেন, ভুলে যাবেন, বিস্মৃত হবেন। এগুলো মানব জীবনের অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এ কারণেই প্রত্যেক পুনঃমুদ্রণের ইচ্ছার সময় আপনার বই-পুস্তক আপনাকে ডাকতে থাকে, আপনি যেন পরিমার্জন করেন, সেগুলোর ভুল বের করেন, এমনকি সেগুলো সংশোধন করেছেন সেগুলোরও।

* * *

আমার রব তো আমাকে আদেশ করেছেন–

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

বলো, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। [সুরা আনআম : ১৬২]

আমি যদি শুধু মুখে এ কথা বলি, সঙ্গে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ও অন্তরের সত্যতা না থাকে, অর্থাৎ বাস্তবে সালাতসহ আমার সকল ইবাদত এবং জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য নিবেদিত না হয়, তাহলে আমার এ মুখের দাবি আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে কি?

সহিহ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন এ ভাষায়–

«وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلَ».

আমার মন চায়, আল্লাহর পথে আমাকে শহিদ করা হবে, তারপর জীবিত করা হবে, আবার শহিদ করা হবে এবং জীবিত করা হবে। তারপর শহিদ করা হবে। [সহিহ বুখারি]

এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাস্তার যুদ্ধকে তাগুত[১] কর্তৃক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে –আল্লাহ পানাহ!– একমত পোষণ করে আমার খায়েশ ও আগ্রহ যদি হয় উদাহরণস্বরূপ তাহাজ্জুদের সালাতের সিজদায় মৃত্যুবরণ করা, তাহলে আমার প্রবৃত্তি রাসুলের আনীত দীনের অনুগত বলে স্বীকৃতি পাবে কি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন–

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার অনুগত হয়ে যায়। [কিতাবুল হুজ্জাহ]

তাহাজ্জুদের সালাতসহ নবিজির সকল আমল (যেমন দাওয়াত ও তাবলিগ[২]) মৃত্যু পর্যন্ত নববি পদ্ধতিতে পালন করার আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার খাতেমা বিল খায়রের জন্য যারা দুআ করেন

---

১. ১৫৫ ও ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দেখুন।

২. ১৫৪-১৫৭ নং পৃষ্ঠায় নববি দাওয়াতের বিবরণ দেখুন।

তাঁদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাঁদেরকেও জীবনের শুভ সমাপ্তি দান করে ধন্য করুন। আমিন!

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِينِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيَ فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيَ فِيهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

হে আল্লাহ! আমার দীনদারি উপযোগী করে দিন যা আমার (সকল) বিষয়ের রক্ষাকবচ। আমার দুনিয়া উপযোগী করে দিন যাতে রয়েছে আমার জীবনোপকরণ। আমার আখেরাত উপযোগী করে দিন যার দিকে রয়েছে আমার প্রত্যাবর্তন। আমার জীবনকে বানান সকল কল্যাণে অগ্রসরতার মাধ্যম এবং আমার মৃত্যুকে বানান সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তির উপায়।[৩] আমিন!

উল্লেখ্য, গত রাত ২টা ৪৪ মিনিটে আল্লাহ তাআলা আমাদের ঘরে নতুন মেহমান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তার আম্মু ও ভাই-বোনদের সম্মতিক্রমে আমি তার নাম রেখেছি আবদুল্লাহ ফুআদ। হে আল্লাহ! তুমি তাকে এবং তার ভাই-বোন সকলকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করো, তাদেরকে উত্তমরূপে গ্রহণ করো, উত্তমরূপে তাদের পরিবর্ধন সমাধা করো এবং আমাদের সকলের অভিভাবক হয়ে যাও। আমিন![৪]

هذا وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على حَبِيبه محمدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ تَبِعَهُمْ إلى يوم الدين، وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

বিনীত

সফিউল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)

১৫-৩-১৪৪১ হি. মোতাবেক ১৩-১১-২০১৯ ঈ.

বুধবার

---

৩. এটি মূলত একটি নববি দুআ। সহিহ মুসলিম দ্রষ্টব্য। হাদিস নং ৭০৭৮।

৪. সুরা আলে-ইমরানের ৩৬ ও ৩৭ আয়াতদ্বয়ের আলোকে এ দুআ করা হয়েছে।

CamScanner

সূচিপত্র

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

ভূমিকার বিষয়বস্তু ও সেগুলোর গুরুত্ব ——— ২৯

উলুহিয়্যাত বিষয়ে আলোচনার কারণ ——— ৩৫

রুবুবিয়্যাতের তাওহিদ ——— ৩৬

উলুহিয়্যাতের তাওহিদ ——— ৩৬

নাম ও গুণাবলির তাওহিদ ——— ৩৬

মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা ও তা প্রকাশ করার আবশ্যকতা ৩৭

মুসলমান বন্দিকে কুফরি গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ ——— ৩৮

তাওহিদের কালিমা

কালিমার বার্তা শত্রুতা-মিত্রতা ——— ৪১

কালিমার বার্তা প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ ——— ৪২

প্রত্যাখ্যাত চার জিনিসের বিবরণ :

সকল বাতিল ইলাহ, তাগুত, সমকক্ষ ও রব ——— ৪২

সাব্যস্তকৃত চার জিনিসের বিবরণ :

ইচ্ছা, সম্মান ও ভালোবাসা, ভয় ও আশা ——— ৪৩

তাকওয়ার সংজ্ঞা ——— ৪৫

নির্জনে তাকওয়া অবলম্বনে কিছু পদক্ষেপ ——— ৪৫

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়ার জন্য করণীয় ——— ৪৬

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলি

প্রথম শর্ত : কালিমার উদ্দিষ্ট অর্থ জানা ——— ৫১

দ্বিতীয় শর্ত : নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা ——— ৫২

CamScanner

তৃতীয় শর্ত : কালিমার দাবিসমূহ মুখে ও অন্তরে গ্রহণ করা — ৫৪
চতুর্থ শর্ত : কালিমার তাৎপর্যের অনুগত হওয়া ——— ৫৫
পঞ্চম শর্ত : সত্যবাদিতা ——— ৫৭
ষষ্ঠ শর্ত : ইখলাস ——— ৬০
সপ্তম শর্ত : কালিমা ও তার দাবিসমূহের
মহব্বত ও তার সাথে সাংঘর্ষিক জিনিসসমূহের ঘৃণা ——— ৬৪

যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর বিবরণ ——— ৬৮
কালিমার মুখের উচ্চারণ ——— ৬৯
অন্তরের উচ্চারণ ——— ৬৯
চিরকুটের হাদিস ——— ৭০
একশ জনের খুনির অন্তরের ঈমানের হাকিকত ——— ৭০
পতিতা মহিলার কালিমার উচ্চারণে
হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ও অন্তরের অনুরণন ——— ৭০
আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহর বিবরণ ৭১
কারো জান-মালের ক্ষতিসাধন কখন অবৈধ হয়? ——— ৭১
মুরজিয়াদের আকিদার ভ্রান্তি ——— ৭২
কিছু সংশয় ও সমাধান ——— ৭৩
ইসলাম প্রকাশ করার পর কখনই কি আর হত্যার বিধান নেই? ৭৩
কালিমার ভূমিকা ও অবদান ——— ৭৬

মানব-জীবনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতির প্রভাব

কালিমার ফজিলত ——— ৭৭

শত্রুতা-মিত্রতার আকিদা

শত্রুতা-মিত্রতা কালিমার আবশ্যক বিষয়
হওয়ার কোরআনের দলিল ——— ৮৩
হাদিস ও সাহাবা-বাণীর দলিল ——— ৮৫
ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাণীর ব্যাখ্যা ——— ৮৭
বর্তমানের মুসলমানদের নিকট শত্রুতা ও মিত্রতা ——— ৮৮
শত্রুতা ও মিত্রতার অর্থ ——— ৮৯
তাওহিদের ধারক-বাহকদের শত্রু থাকা অবশ্যম্ভাবী ——— ৯০
প্রচুর ইলম থাকা কারো হক হওয়ার দলিল নয় ——— ৯০
সত্যান্বেষীদেরকে সন্দিহান করে তোলার অপচেষ্টা ——— ৯১
হকপন্থীদের গভীর ইলম থাকার প্রয়োজনীয়তা ——— ৯২
শত্রুতা ও মিত্রতা ব্যতীত কালিমার তাৎপর্য
বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ার বিবরণ ——— ৯২

ঈমান ভঙ্গের কারণ

ঈমানের হাকিকত ও তার বিপরীত জিনিসসমূহ

বিপরীত জিনিস আলোচনা করার কারণ ——— ৯৫
মুরজিয়াদের শিথিলতা ও খারেজিদের সীমালঙ্ঘন ——— ৯৫
প্রথম মূলনীতি ——— ৯৬
ঈমানের উক্তিমূলক ও কর্মমূলক শাখা ——— ৯৭
কুফরের কর্মমূলক ও উক্তিমূলক শাখা ——— ৯৭
দ্বিতীয় মূলনীতি ——— ৯৭
মনের উক্তি ও মুখের উক্তি ——— ৯৭
অন্তরের কর্ম ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম ——— ৯৭
তৃতীয় মূলনীতি ——— ৯৯
কুফরের দু স্তর ——— ১০৪

CamScanner

জুলুমের দু স্তর ——— ১০৫
ফিস্‌কের দু স্তর ——— ১০৬
জাহালাতের দু স্তর ——— ১০৮
শিরকের দু স্তর ——— ১০৮
নিফাকের দু স্তর ——— ১১০
চতুর্থ মূলনীতি ——— ১১৩
পঞ্চম মূলনীতি ——— ১১৬

একটি জরুরি সংযুক্তি

'ইয়াসাক' সংবিধানের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা – ১১৮
শাসনব্যবস্থা হিসেবে অন্য আইন গ্রহণ করা দ্বারা
ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ৮টি দলিল ——— ১১৯
প্রথম দলিল ——— ১১৯
দ্বিতীয় দলিল ——— ১২০
তৃতীয় দলিল ——— ১২০
চতুর্থ দলিল ——— ১২০
'জরুরিয়াতে দীনে'র সংজ্ঞা ——— ১২১
পঞ্চম দলিল ——— ১২১
ষষ্ঠ দলিল ——— ১২২
সপ্তম দলিল ——— ১২৩
অষ্টম দলিল ——— ১২৪

কুফর, শিরক, নিফাক ও ইরতিদাদ

কুফরির প্রকারভেদ ——— ১২৬
মিথ্যুক মনে করার কুফরি ——— ১২৬
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ও অহংকারজনিত কুফরি ——— ১২৭

CamScanner

বিমুখ থাকাজনিত কুফরি ——— ১২৮
সন্দেহজনিত কুফরি ——— ১২৯
নিফাকজনিত কুফরি ——— ১২৯
শিরকের প্রকারভেদ ——— ১২৯
বড় শিরক ——— ১২৯
ছোট শিরক ——— ১২৯
দুআর শিরক ——— ১৩০
নিয়ত, ইচ্ছা ও অভিলাষের শিরক ——— ১৩০
আনুগত্যের শিরক ——— ১৩১
ভালোবাসার শিরক ——— ১৩২
নিফাকের প্রকারভেদ ——— ১৩২
আকিদার নিফাক ——— ১৩২
আমলের নিফাক ——— ১৩২
ইরতিদাদ ——— ১৩২
ইরতিদাদের প্রকারভেদ : উক্তি, কর্ম, বিশ্বাস ও সন্দেহ ——— ১৩৩
'বাধ্য হওয়া' শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ——— ১৩৪
'ফাতহুল বারি' কিতাবের বিবরণ ——— ১৩৫
'তাবয়িনুল হাকায়িক' কিতাবের বিবরণ ——— ১৩৬
ইকরাহের একটি অত্যাশ্চর্য চিত্র ——— ১৩৭
বাঁচতে চাই, না বাঁচতে চাই? ——— ১৩৮

ঈমান ভঙ্গের কারণ

প্রথম কারণ ——— ১৪০
দ্বিতীয় কারণ ——— ১৪১
তৃতীয় কারণ ——— ১৪১

চতুর্থ কারণ ——— ১৪৩
পঞ্চম কারণ ——— ১৪৫
ষষ্ঠ কারণ ——— ১৪৭
সপ্তম কারণ ——— ১৪৭
অষ্টম কারণ ——— ১৪৮
নবম কারণ ——— ১৪৯
দশম কারণ ——— ১৪৯
চতুর্থ কারণের ব্যাখ্যা ——— ১৫১
তাগুতের সংজ্ঞা ——— ১৫৫
শরিয়ত প্রত্যাখ্যানকারীর উপমা ——— ১৫৬
বর্তমানের মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ ——— ১৫৬
আলেমদের ইউনিফর্মধারী কিছু লোকের দায় ——— ১৫৮
আন্তধর্মীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করার হুকুম ——— ১৬২
ইয়াসাক সংবিধান ——— ১৬৩
শাসকের মুরতাদ হওয়ার অবস্থাসমূহ ——— ১৬৪
তাগুতের সংজ্ঞা ——— ১৬৮
সচেতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার আবশ্যকতা ——— ১৬৯
কিতাব ও রিজালের অনুসরণের নীতিমালা ——— ১৭০
সাধারণ মুসলমানদের করণীয় ——— ১৭২
অষ্টম কারণের ব্যাখ্যা ——— ১৭২
তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা ——— ১৭৪
বর্তমানে কোন্ কোন্ দেশ দারুল হরব? ——— ১৭৬
হিজরত করে কোথায় যাব? ——— ১৭৭

CamScanner

কালেমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য

প্রথম অংশ : তাওহিদে ইলাহি

তাওহিদের গুরুত্ব ——— ১৮১

তাওহিদের তাৎপর্য
ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মার্থ ——— ১৮৫

আরবের মুশরিকদের শিরক এবং তাদের কাছে
তাওহিদের দাওয়াতের দাবি ——— ১৮৫

ইবাদতের সংজ্ঞা ——— ১৮৭

সাহায্যপ্রার্থনার সংজ্ঞা ——— ১৮৮

ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনা
একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য ——— ১৯০

তাওহিদের প্রথম স্তর ——— ১৯২

তাওহিদের পরবর্তী দাবি ——— ১৯৩

মূর্তি ও উপাস্যের আধুনিক সংস্করণ ——— ১৯৫

তাওহিদের উচ্চতর স্তর ——— ১৯৭

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের নিদর্শন ও ফলাফল ——— ১৯৮

ঈমানদারদের ইস্পাততুল্য দৃঢ়তা ও বিপ্লবী শক্তি ——— ২০০

জিহাদের জন্য শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি যথেষ্ট কি-না? ——— ২০২

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের স্তরে পৌঁছার প্রাথমিক সিলেবাস ——— ২০৭

একটি সতর্কীকরণ ——— ২০৯

হাদিসের আলোকে কালিমার ফজিলত ও গুরুত্ব ——— ২১১

দ্বিতীয় অংশ : রিসালাতে মুহাম্মদি

ঈমানদীপ্ত ও ঐতিহাসিক ৬টি বাস্তবতা ——— ২১৪

সর্বকালের ও সমগ্র পৃথিবীর নবিকে আরব দেশে

CamScanner

প্রেরণ করার কারণ ——— ২১৯
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন ——— ২২০
কোরআন ও ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ ——— ২২১
জিহাদ আগে, না খেলাফত প্রতিষ্ঠা আগে? ——— ২২২
কাউকে 'রাসুল' মানার অর্থ ও এর অনিবার্য দাবিসমূহ ——— ২২৬
আল্লাহর রাসুলের সাথে ভালোবাসা ——— ২৩০

* * *

তাগুতদের কূটকৌশল ——— ২৩৪
ইসলামি দাওয়াতের নববি পদ্ধতি ——— ২৫৪
একজন তরুণের অভিব্যক্তি ——— ২৫৮

* * *

প্রথম পুস্তিকা-লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ——— ২৬৫
দ্বিতীয় পুস্তিকার লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ——— ২৬৭
অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ——— ২৬৯

CamScanner

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

মূল

শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রহ.

(১৩৭৬-১৪৪০ হি.)

অনুবাদ

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

CamScanner

ভূমিকার[১] বিষয়বস্তু ও সেগুলোর গুরুত্ব

সঠিক ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে 'শত্রুতা-মিত্রতা' বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ভূমিকায় আমাদের তিনটি বাস্তবতা তুলে ধরা আবশ্যক–

১. তাওহিদের কালিমা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'তে বর্ণিত ইসলামের হাকিকত, কালিমার তাৎপর্য ও শর্তাবলি।

২. 'শত্রুতা-মিত্রতা'র বিষয়টি তাওহিদের কালিমার আবশ্যক বিষয়াদির অন্যতম।

৩. ঈমান ভঙ্গের কারণাদি তথা শিরক, কুফর, নিফাক ও ইরতিদাদ।

এখানে আমার লক্ষ্য হলো, যথাসম্ভব ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও তার বিরোধিতার স্বরূপ তুলে ধরা। পাশাপাশি 'শত্রুতা-মিত্রতা'র বিষয়টির স্বরূপ এবং মুসলমানদের জীবনে তার গুরুত্ব প্রকাশ করা। কারণ, 'শত্রুতা-মিত্রতা' তাওহিদের আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই 'শত্রুতা-মিত্রতা'র আলোচনায় তাওহিদের কালিমার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা না থেকে পারে না। তাওহিদের আকিদা যথাযথভাবে জানা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যেন তাদের শত্রুতা-মিত্রতা এর ভিত্তিতেই হয়। বস্তুত, শরিয়তকর্তৃক নির্ধারিত শত্রুতা-মিত্রতা কার্যকর করা ব্যতীত শরিয়তের কোনো আকিদা নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

---

১. ভূমিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ' পুস্তিকাটি উদ্দেশ্য। এটি الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ فِي الْإِسْلَامِ (ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা) গ্রন্থের ভূমিকা।

তাছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মূলতত্ত্ব এবং এ দাওয়াত মানব ইতিহাসে যে বিপ্লব সাধন করেছে ও যে সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে, তা গভীরভাবে চিন্তাযোগ্য বিষয়। নিজের রব, দীন ও নবির পরিচয় লাভ করার প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে যায় মানুষের সুখ-শান্তির সফর। আলোচ্য দাওয়াতকে পৃথিবী এমন এক সময় লাভ করেছে যখন মানুষ ছিল চূড়ান্ত মূর্খতা ও অন্ধ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। নববি দাওয়াত তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে এবং আত্মিক মৃত্যুর পর জীবন দান করেছে।

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾.

আচ্ছা, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে দান করেছি এমন একটি আলো যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে পতিত, সেখান থেকে সে বের হতে পারে না? [সুরা আনআম : ১২২]

তখনকার মানুষের অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেছেন মহান সাহাবি হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাজিয়াল্লাহু আনহু[২] [মৃ. ৩৩ হি.]। 'হিলয়া' গ্রন্থে আবু নুআইম রাহিমাহুল্লাহর [৩৩৬-৪৩০ হি.] বর্ণনায় হজরত মিকদাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

আল্লাহর শপথ! কোনো নবি প্রেরিত হওয়ার কঠিনতম যে পরিস্থিতি হতে পারে, সে ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের নবি

---

২. হজরত মিকদাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বদর ও অন্যান্য জঙ্গে [জিহাদে] উপস্থিত থেকেছেন। বদর যুদ্ধে অশ্বারোহী ছিলেন। ৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারো কারো মতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। মৃত্যু হয়েছে মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরে জাওফ নামক স্থানে। সেখান থেকে মদিনায় এনে দাফন করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত تهذيب التهذيب খ. ১০ পৃ. ২৮৫ দ্রষ্টব্য।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। নবি প্রেরিত না হওয়ার ও অজ্ঞতার সময়ে শেষ নবি আগমন করেছেন। মূর্তিপূজার তুলনায় উত্তম কোনো ধর্ম আছে বলে মানুষ মনে করত না। এ পরিস্থিতিতে তিনি পার্থক্য নির্ণয়কারী ধর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যার মাধ্যমে হক ও বাতিল এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানের জন্য কারো অন্তরের কপাট খুলে যাওয়ার পর সে যখন তার পিতা বা পুত্র বা ভাইকে কাফের অবস্থায় দেখত, আর সে জানে যে, ঈমানশূন্য ব্যক্তির ঠিকানা জাহান্নাম, তখন প্রিয়জনকে প্রচণ্ড প্রজ্বলিত আগুনের দ্বারপ্রান্তে প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর নিকটে ফরিয়াদ করে বলত–

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾.

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে চোখের শীতলতা। [সুরা ফুরকান : ৭৪] (১)

হেদায়াত দান করে মুসলমানদের উপর অনুগ্রহ করার আলোচনা প্রসঙ্গে কোরআন এই জাহিলিয়াত সম্পর্কে বলেছে–

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি [দীন] আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

---

১. আবু নুআইম রচিত حِلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ খ. ১ পৃ. ১৭৫। حَيَاةُ الصَّحَابَةِ কিতাবের লেখক রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে [১ : ২৪১] বলেছেন– তাবারানিও রেওয়ায়েতটির মূল বক্তব্য বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। একটি সনদে ইয়াহইয়া বিন সালিহ রয়েছেন। যাহাবি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْفَعُ الفَوَائِدِ [খ. ৬ পৃ. ১৭] কিতাবে হাইসামির বিবরণ মতে সনদের অন্য রাবিগণ সহিহ-র রাবি।

যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করেছেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেছো। আর তোমরা ছিলে আগুনের একটি গর্তের প্রান্তে, তারপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও'। [সুরা আলে-ইমরান : ১০৩]

সাহাবায়ে কেরাম যখন জাহিলিয়াত চিনলেন, তারপর ইসলাম জানলেন, তখন তাঁরা কোরআনি তারবিয়ত ও নববি প্রতিপালনের ফলাফলরূপে প্রকাশ লাভ করলেন। তাঁরা এ দাওয়াতের ইতিহাসে পরিচিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

আপনি কি মনে করেন! তাঁদের সম্পর্কে আমরা যা পড়ি ও শুনি, সেই মাহাত্মের রহস্য কী? আমরা বিচ্যুতির যে গভীর গর্তে নিপতিত হয়ে আছি তার কারণে তাদের অবস্থাগুলো আমাদের নিকট স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। সেই প্রজন্মের কোনো একজন যখন ইসলাম গ্রহণ করতেন, জাহিলিয়াতের পুরো অতীতকে ঘরের চৌকাঠে ছুঁড়ে আসতেন। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জগত, ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাচেতনা, অবসন্ন ধ্যান-ধারণা এবং সম্পদ ও মানুষের দাসত্ব থেকে বের হয়ে চলে যেতেন সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত জীবনে। আল্লাহর নুরে পরিপূর্ণ জগতে। পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আল্লাহর দাসত্ব ব্যতীত সকল দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের পথে। দূরে, বহু দূরে।[২]

সেই সফলতা ও মাহাত্ম্যের রহস্য হচ্ছে ঐ সূচনাবিন্দু যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাওয়াতি

---

২. 'দারুশ শুরুক' থেকে প্রকাশিত সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ রচিত مَعَالِمُ فِي الطَّرِيْقِ গ্রন্থের পৃ. ১৬তে جِيْلٌ قُرْآنِيٌّ فَرِيْدٌ [এক বিরল কোরআনি প্রজন্ম] পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। আরও দেখুন অধ্যাপক মুহাম্মদ হাসান ব্রিগেস রচিত أَبُوْ بَصِيْرٍ قِمَّةٌ فِي الْعِزَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ [আবু বাসির ইসলামি গৌরবের শীর্ষে] পৃ. ৪৭। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৭ হি.। প্রকাশক : মাকতাবাতুল হারামাইন, রিয়াদ।

কার্যক্রম শুরু করেছেন। তা হচ্ছে তাওহিদের[১] কালিমা- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। এই কালিমা আকিদার সম্পর্ক, আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসার সম্পর্ক ও ঈমানি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ব্যতীত সকল সম্পর্ককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বস্তুত এর সামনে রক্ত, বংশ, মাটি, জাতি ও বর্ণ ইত্যাদি সকল সম্পর্ক বিলীন হয়ে যায়।

সহিহ মুসলিমে হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أَيْنَ المُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ. («صحيح مسلم» ٤ : ١٩٨٨، ح ٢٥٦٦، «كتاب البر»، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤هـ، دار إحياء الكتب العربية؛ وانظر «المُسْنَد» للإمام أحمد ١٦ : ١٩٢، ح ٨٤٣٦، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، الطبعة الرابعة سنة ١٣٧٣هـ، دار المعارف بمصر، و«المُوَطَّأ» ٢ : ٩٥٢، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.)

আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন বলবেন- আমার মহত্ত্বের ভিত্তিতে যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে তাঁরা কোথায়? আজ আমি তাঁদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেব যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই। [সহিহ মুসলিম]

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال النبيُّ صلى الله عليه وسَلَّمَ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ والشُّهَدَاءُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ

১. তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। অর্থাৎ সত্তা, নাম, গুণাবলি, কার্যাবলি, ইবাদতের উপযুক্ততা ও শাসন- ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা। -অনুবাদক

اللهِ تَعَالَى». قالوا : يا رسولَ اللهِ! تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قال : «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ»، وقرأ هذه الآية : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. (سُنَنُ أَبِي داود ٣ : ٧٩٩، ح ٣٥٢٧، كتاب البيوع، وإسناده صحيح، تعليق عزت الدعاس، الطبعة الأولى سنة ١٣٩١هـ، الناشر محمد علي السيد بسوريا.)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– অবশ্যই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছেন যারা না নবি এবং না শহিদ। কিন্তু নবিগণ ও শহিদগণ আল্লাহর নিকট তাঁদের মর্যাদার কারণে তাদেরকে ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- আমাদেরকে কি বলবেন, তাঁরা কারা? তিনি বললেন– তারা এমন লোক যারা আল্লাহর ভালোবাসায় একে অপরকে ভালোবেসেছে, না কোনো আত্মীয়তার ভিত্তিতে এবং না কোনো আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে। আল্লাহর শপথ! তাদের চেহারাগুলো নুর। যখন মানুষ ভয় পাবে তাঁরা ভয় পাবে না এবং যখন মানুষ চিন্তিত হবে তাঁরা চিন্তিত হবে না। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন– [অর্থ :] জেনে রাখো, অবশ্যই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা দুঃখিত হবে না। [সুরা ইউনুস : ৬২। সুনানু আবি দাউদ।]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তের বছর অবস্থান করেছেন। তিনি তখন মানুষদেরকে এ আকিদার দাওয়াত দেন এবং মুসলমানদের অন্তরে তা সুদৃঢ় করেন। আর তার প্রভাব প্রতিফলিত হত তাদের প্রশংসনীয় কাজকর্মে এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য তাঁদের অব্যাহত জিহাদে।[২]

২. 'দারুল কিতাব' থেকে প্রকাশিত 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবের ১০১৩ নং পৃষ্ঠায় সুরা সাফ্-এর ১০ থেকে ১৩ নং আয়াতগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'দ্বিতীয় জিনিস যাহা আমাদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে উহা হইল জেহাদ। জেহাদের আসল যদিও কাফেরদের সহিত যুদ্ধ ও মোকাবিলা

উলুহিয়্যাত বিষয়ে আলোচনার কারণ

যে বিষয়টি আমাদেরকে উলুহিয়্যাত ও ইসলাম কর্তৃক আনীত তার সঠিক মর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো, বর্তমান সময়ে তা ব্যাখ্যা করা ও মানুষের নিকট বিষয়টি তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজনীয়তা। কারণ, আল্লাহর কতিপয় অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত এই স্বচ্ছ আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

কালিমা বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের নিকট শুধু মুখে উচ্চারিত কিছু শব্দে পরিণত হয়েছে। তার অর্থ ও দাবিসমূহ নিয়ে তারা চিন্তা করছে না। অবস্থা শুধু এতটুকুর মধ্যে ক্ষান্ত থাকেনি। বরং তারা যে ধারণা পোষণ করে তার পক্ষে দলিল পেশ করার জন্য কিতাব ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতিও দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা বিষয় সংশ্লিষ্ট পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতিও সামনে রাখছে না এবং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস জুড়ে সংকলিত হাদিস ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুফাসসির ও সংস্কারক মনীষীদের বিশ্লেষণ দেখারও প্রয়োজন অনুভব করছে না।

'ইবাদত' হলো মানব জীবনের সকল অঙ্গনে আল্লাহর আনুগত্যের নাম। কিন্তু বর্তমানে এ পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপ্ত অর্থটি বিকৃত হয়ে তা তার একটি ক্ষুদ্র অংশ তথা সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত প্রভৃতি আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

জীবনব্যবস্থা কী হবে? মিত্রতা হবে কার সঙ্গে? শত্রুতা হবে কার সঙ্গে? কার সঙ্গে হবে ভালোবাসা? কার প্রতি থাকবে বিদ্বেষ? এগুলো মানুষের কল্পনা ও চিন্তার অঙ্গন থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছে।

এই দীন তো শুধু রুবুবিয়্যাতের তাওহিদের নাম নয়। বরং তা উলুহিয়্যাতের তাওহিদ এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব উপযোগী তাঁর নাম ও গুণাবলির তাওহিদও বটে।

করা, তথাপি জেহাদের মূল লক্ষ্য হইল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁহার হুকুম-আহকাম পূর্ণভাবে চালু করা। আর ইহাই আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য।' এ পুস্তিকার ১৪৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। –অনুবাদক।

(**রুবুবিয়্যাতের তাওহিদ** হলো, নিজ কার্যাবলির [যেমন- সৃষ্টি, রিজিকদান, জীবনদান, মৃত্যুদানের] ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা। **উলুহিয়্যাতের তাওহিদ** হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ইবাদতের উপযুক্ত জ্ঞান করা। পক্ষান্তরে **নাম ও গুণাবলির তাওহিদ** হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আল্লাহর জন্য যেসকল নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। যেসকল নাম ও গুণ আল্লাহর জন্য হওয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা। সাব্যস্ত করা নাম ও গুণগুলোর সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি দান করা এবং সৃষ্টিজগতে সেগুলোর প্রভাব ও দাবি উপলব্ধি করা। -অনুবাদক।)

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহর [১১১৫-১২০৬ হি.] বিবরণ অনুসারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা চিন্তা করুন তো! যখন তিনি মুশরিকদেরকে শিরক থেকে সতর্ক করা শুরু করলেন এবং তাওহিদের আদেশ আরম্ভ করলেন, তারা তা অপছন্দ করল না, বরং তাকে ভালো মনে করল। উপরন্তু তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মনে মনে ভাবতে থাকল।[১] কিন্তু তিনি যখন তাদের ধর্মকে প্রকাশ্যে গালমন্দ করলেন এবং তাদের জ্ঞানীদেরকে মূর্খ বললেন, তখন তারা তাঁর ও তাঁর সাহাবিগণের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামল এবং বলল, সে আমাদের বুদ্ধিমানদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, ধর্মের দোষ ধরেছে এবং উপাস্যদের গালিগালাজ করেছে। আর জানা কথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না গালমন্দ করেছেন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাকে, না ফেরেশতা ও নেককারদেরকে! কিন্তু তিনি যখন বললেন- মূর্তি মানুষের ইবাদত লাভের যোগ্য নয়, এগুলো কারো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না, তখন একে তারা গালমন্দ সাব্যস্ত করল।

১. এ দাবির পক্ষে কোনো দলিল এখনো আমাদের নজরে পড়েনি। -অনুবাদক।

মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা ও তা প্রকাশ করার আবশ্যকতা

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা ব্যতীত কোনো মানুষের ইসলাম টিকে থাকতে পারে না, যদিও সে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহকে এক-অদ্বিতীয় বলে। পাশাপাশি শিরকও বর্জন করে। কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانَ﴾.

আপনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়কে এমন পাবেন না যে, তারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, যদিও তারা হয় তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা জাতি-গোষ্ঠী। আল্লাহ ওদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন। [সুরা মুজাদালা : ২২]

(পূর্বের দাবির দলিল হওয়ার জন্য উল্লিখিত আয়াতের তুলনায় নিম্নোক্ত আয়াতটি অধিক উপযোগী মনে হয়–

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ﴾.

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। [সুরা মুমতাহিনা : ৪] –অনুবাদক।)

অতএব বোঝা গেল, যারা মুসলমান হওয়ার দাবিদার তাদের অনেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই জানে না। অন্যথায় কোন্ জিনিস সাহাবিগণকে ঈমানের পথে আসা শাস্তি, বন্দি, প্রহার প্রভৃতিতে

ধৈর্যধারণ ও হাবশায় হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক দয়াবান। তিনি যদি তাদের জন্য সুযোগ পেতেন অবশ্যই তাদেরকে সুযোগ দিতেন।[১]

মুসলমান বন্দিকে কুফরি গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ

(নিম্নের হাদিসটি এখানে লক্ষ্যণীয়-

عَنْ خَبَّابٍ، قال : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا! أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا! فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، فَقَالَ :

«قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ». (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، بابٌ في الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ، ح ٢٦٥١)

হজরত খাব্বাব রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি কাবাঘরের ছায়ায় ডোরাদার চাদর মাথার নীচে রেখে শুয়ে ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট অভিযোগ করে বললাম- আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবেন না? তখন তিনি ক্রোধ-রক্তিম চেহারা নিয়ে বসে বললেন-

---

১. ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুমাল্লাহ প্রমুখের রচিত مَجْمُوعَةُ التوحيدِ পৃ. ১৯। প্রকাশক : দারুল ফিকর, কায়রো।

তোমাদের আগে যারা ছিল [ঈমান আনার কারণে] তাদের একজনকে ধরে আনা হত। এরপর তার জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হত। তারপর করাত এনে তার মাথা দু-খণ্ডিত করা হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। আর লোহার কাঁটাযুক্ত চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে হাড় হতে শরীরের মাংস ও মাংসপেশী বিচ্ছিন্ন করা হত। তা সত্ত্বেও তা তাঁকে তাঁর দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম! এই দীনকে আল্লাহ তাআলা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এমনকি আরোহী 'সানআ' ও 'হাজ্‌রামাউতে'র মাঝে চলাচল করবে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সে ভয় করবে না এবং নিজের ছাগলের ব্যাপারে বাঘকেও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ। [সুনানু আবি দাউদ] -অনুবাদক।)

তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হাকিকত মানুষের সামনে ব্যাখ্যা করা এবং তার মর্ম, তাৎপর্য, শর্ত, দাবি ও ভঙ্গের কারণসমূহ তুলে ধরা। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

আল্লাহর কাছেই আমরা নির্ভুল লেখার তাওফিক ও সাহায্য কামনা করি।

তাওহিদের কালিমা

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ]

আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

এ কালিমা আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যের 'ইবাদত লাভের উপযুক্ততা' প্রত্যাখ্যান করছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত লাভের যোগ্যতা সাব্যস্ত করছে।[১]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] বলেন–

অন্তরের শান্তি ও তৃপ্তি একমাত্র আল্লাহর মহব্বত এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা দ্বারাই অর্জিত হবে। আর তাঁর মহব্বত লাভ করা তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রিয়জন থেকে বিমুখ থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। এটিই হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হাকিকত। এটি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও সকল নবি-রাসুলের ধর্ম।[২]

কালিমার দ্বিতীয় অংশ তথা 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র তাৎপর্য হচ্ছে- তিনি যা আদেশ করেছেন সে ব্যাপারে একমাত্র তাঁর অনুসরণ করা এবং তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ও বারণ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

---

১. শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ [১১৯৩-১২৮৫ হি.] রচিত فَتْحُ المَجِيدِ شَرْح كتابِ التوحيدِ পৃ. ৩৬ দ্রষ্টব্য।

২. ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর مجموعُ الفَتَاوَى খ. ২২ পৃ. ৩২ দ্রষ্টব্য। তাহকিক : আবদুর রহমান বিন কাসিম। প্রথম সংস্করণ, মাতবাআতুল হুকুমাহ ১৩৮১ হিজরি।

কালিমার বার্তা শত্রুতা-মিত্রতা

তাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে প্রত্যাখ্যান করা হলো শত্রুতা, আর সত্যায়ন করা হলো মিত্রতা। অতএব মিত্রতা হবে- আল্লাহর সাথে, তাঁর ধর্মের সাথে, তাঁর কিতাবের সাথে এবং নবি ও নেক বান্দাদের আদর্শের সাথে। পক্ষান্তরে শত্রুতা হবে- প্রত্যেক তাগুতের সঙ্গে, যার উপাসনা করা হয় আল্লাহর পরিবর্তে।

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾.

অতএব যে কেউ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। [সুরা বাকারা : ২৫৬]

(১৫৫ ও ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দেখুন।)

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

জেনে রাখুন, তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো মানুষ ঈমানদার হতে পারে না। তার দলিল পূর্ববর্তী আয়াত তথা সুরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত।[১]

তাওহিদের কালিমার দাবি হলো- আল্লাহর শরিয়তের সাথে মিত্রতা পোষণ। ইরশাদ হয়েছে–

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾.

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তারই অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা খুবই কম উপদেশ গ্রহণ কর। [সুরা আরাফ : ৩]

---

১. শায়খ আবদুর রহমান বিন কাসিম রাহিমাহুল্লাহ (১৩১৯-১৩৯২ হি.) সংকলিত الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ খ. ১ পৃ. ৯৫ দ্রষ্টব্য।

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.

অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে তোমার সত্ত্বাকে দীনের উপর অবিচল রাখো। [আর অনুসরণ করো] আল্লাহর [সৃষ্ট] প্রকৃতির, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। [সুরা রুম : ৩০]

তাওহিদের কালিমার দাবি এটাও যে, জাহিলিয়াতের বিধান থেকে সম্পর্কহীনতা। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? [সুরা মায়িদা : ৫০]

এবং ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পর্কহীনতা। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা আলে-ইমরান : ৮৫]

কালিমার বার্তা প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ

কালিমা হলো প্রত্যাখ্যান ও সাব্যস্তকরণ– চারটি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং চারটি জিনিসকে সাব্যস্ত করে। যে চারটি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলো হলো– ১. সকল বাতিল ইলাহ। ২. তাগুত। ৩. সমকক্ষ। ৪. রব।

ইলাহ : কোনো কল্যাণ অর্জন করা বা ক্ষতি দূর করার জন্য আপনি যার শরণাপন্ন হলেন, আপনি তাকে ইলাহ ও মাবুদরূপে গ্রহণ করলেন।

তাগুত : যার উপাসনা করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। অথবা উপাসনা করার জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়েছে। (সামনে ১৫৫ ও

১৬৯ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের বিস্তারিত সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। -অনুবাদক।)

সমকক্ষ : পরিবার-পরিজন, বাসস্থান, গোষ্ঠী বা সম্পদ যা আপনাকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিরত রাখে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾.

আর মানুষের মাঝে কতক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে [তাঁর] এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। [সুরা বাকারা : ১৬৫]

রব : সত্যের বিরোধিতায় যে আপনাকে ফতোয়া প্রদান করে আর আপনি তার আনুগত্য করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾.

তারা [ইহুদি ও খ্রিস্টানরা] আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [সুরা তাওবা : ৩১]

তাওহিদের কালিমা যে চারটি জিনিসকে সাব্যস্ত করে সেগুলো হলো– ১. ইচ্ছা। ২. সম্মান ও ভালোবাসা। ৩. ভয়। ৪. আশা।

ইচ্ছা : একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন আপনার লক্ষ্য হওয়া।

সম্মান ও ভালোবাসা : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾.

আর যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে অনেক বেশি ভালোবাসে। [সুরা বাকারা : ১৬৫]

ভয় ও আশা : ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

যদি আল্লাহ তোমার উপর কোনো কষ্ট আপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তার অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি

পবিত্র কোরআনে 'তাওহিদের কালিমা'কে 'তাকওয়ার কালিমা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা ফাতহ : ২৬ দ্রষ্টব্য।

তাকওয়া : তাকওয়া হলো- শিরক ও অন্যান্য গোনাহ বর্জন করা, ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং শরিয়তের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- সওয়াবের আশাবাদি হয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নির্দেশনা অনুসারে তাঁর অবাধ্যতা বর্জন করা।[১]

(নির্জনে তাকওয়া অবলম্বনে কিছু পদক্ষেপ :

- আনন্দ-ফুর্তির অবসানকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা।
- আল্লাহ তাআলার হাজির-নাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখা। অর্থাৎ তাঁর সর্বত্র বিরাজমান থাকা ও সবকিছু দেখার অনুভূতি জাগ্রত রাখা।
- সৎসঙ্গ গ্রহণ করা।
- নিজের আমলের মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনা করা।
- প্রতিদিন আখলাক ও তাকওয়া বিষয়ে অন্ততপক্ষে ১ টি উপদেশ শোনা বা কিতাবে পড়া।
- গুনাহের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রতিদিন চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা।
- গুনাহের আশঙ্কার মুহূর্তগুলোতে একাকি না থাকা ।
- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার না করা।

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً

---

১. শায়খ রশিদ রিজা মিসরি রাহিমাহুল্লাহ (১২৮২-১৩৫৪ হি.) কর্তৃক তাহকিককৃত مجموعةُ الرسائِلِ والمسائلِ النَّجْدِيَّةِ-এর অন্তর্ভুক্ত الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ في الرَّدِّ عَلَى الوَهَّابِيَّةِ খ. ৪ পৃ. ৯৯ দ্রষ্টব্য। প্রথম সংস্করণ ১৩৪৬ হি.। مَطْبَعَةُ المَنَارِ মিশর।

তোমাকে কোনো কল্যাণ দান করতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা ইউনুস : ১০৭]

অতএব যে ব্যক্তি কালিমার এসব তাৎপর্য অবগত হবে, সে আল্লাহ ব্যতীত সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মিথ্যার ভ্রূকুটি সহ্য করা তার জন্য ভারি হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মূর্তি ভাঙ্গা ও নিজ সম্প্রদায় থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করার সংবাদ দান করে ইরশাদ করেছেন-

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾. (بِضْعُ رسائلَ في عقائد الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٣٥، تحقيق محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩هـ، مطبعة المنار بمصر.)

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন- আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। [সুরা মুমতাহিনা : ৪]

কোরআন পাক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ বর্ণনা করে এসেছে- শিরক ও তার আনুষঙ্গিক সকল বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ইখলাস ও শরিয়তের সকল বিধানকে সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং যে সকল উক্তি ও কর্ম আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন, তা তাওহিদের কালিমার তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত তাওহিদের কালিমা বলে কখনো পুরো দীন বোঝানো হয়। কখনো দীনের একটি অংশ বোঝানো হয়। আবার কখনো বোঝানো হয় দীনের আবশ্যক কোনো বিষয়। এর প্রমাণ হলো- আল্লাহ তাআলা

পবিত্র কোরআনে 'তাওহিদের কালিমা'কে 'তাকওয়ার কালিমা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুরা ফাত্হ : ২৬ দ্রষ্টব্য।

তাকওয়া : তাকওয়া হলো- শিরক ও অন্যান্য গোনাহ বর্জন করা, ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং শরিয়তের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- সওয়াবের আশাবাদি হয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নির্দেশনা অনুসারে তাঁর অবাধ্যতা বর্জন করা।[১]

(নির্জনে তাকওয়া অবলম্বনে কিছু পদক্ষেপ :

- আনন্দ-ফুর্তির অবসানকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা।
- আল্লাহ তাআলার হাজির-নাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখা। অর্থাৎ তাঁর সর্বত্র বিরাজমান থাকা ও সবকিছু দেখার অনুভূতি জাগ্রত রাখা।
- সৎসঙ্গ গ্রহণ করা।
- নিজের আমলের মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনা করা।
- প্রতিদিন আখলাক ও তাকওয়া বিষয়ে অন্তত পক্ষে ১ টি উপদেশ শোনা বা কিতাবে পড়া।
- গুনাহের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রতিদিন চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা।
- গুনাহের আশঙ্কার মুহূর্তগুলোতে একাকি না থাকা ।
- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার না করা।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً

---

১. শায়খ রশিদ রিজা মিসরি রাহিমাহুল্লাহ (১২৮২-১৩৫৪ হি.) কর্তৃক তাহকিককৃত مجموعةُ الرسائِلِ والمسائلِ النَّجْدِيَّةِ-এর অন্তর্ভুক্ত المَوْرِدُ العَذْبُ الزُّلَالُ খ. ৪ পৃ. ৯৯ দ্রষ্টব্য। প্রথম সংস্করণ ১৩৪৬ হি.। مَطْبَعَةُ المَنَارِ মিশর।

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন অবস্থাকে প্রকাশ্য অবস্থার তুলনায় উত্তম বানাও এবং আমার প্রকাশ্য অবস্থাকে ভালো বানাও![২] -অনুবাদক।)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়ার জন্য করণীয়

কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের পক্ষে সম্ভব হলো এ কালিমাকে জানা, তার বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরা। তার দাবি ও আবশ্যক বিষয়াদি বাস্তবে পরিণত করা? সবিস্তারে এর উত্তর দিচ্ছেন মহান ইমাম সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ [১০৭-১৯৮ হি.]।

মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক মিস্‌সিসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

১৭০ হিজরিতে আমরা সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল- ঈমান কী? তিনি বললেন- উক্তি ও কর্ম। লোকটি বলল- তা কি বাড়ে-কমে? তিনি বললেন- আল্লাহ চাইলে তা বাড়ে এবং কমে। এতো কমে যে, এতটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। পরিমাণটি আঙ্গুলে ইশারা করে দেখালেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল- আমরা ঐসকল লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব, যারা মনে করে, ঈমান কর্মহীন উক্তির নাম। সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বললেন- ঈমানের বিধি-বিধান ও সীমারেখা নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে তাদের কথাই সঠিক ছিল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন- যেন তারা বলে- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। যখন তারা তা বলবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে কেউ এ কালিমার অধিকার নষ্ট করলে তার কথা ভিন্ন। তার হিসাবগ্রহণ আল্লাহর দায়িত্বে।

২. এটি একটি নববি দুআ। সুনানুত তিরমিজি দ্রষ্টব্য। হাদিস নং ৩৬৬৭।

তারপর আল্লাহ তাআলা যখন সাহাবিদের অন্তরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন রাসুলকে আদেশ করলেন, যেন তিনি তাঁদেরকে সালাতের আদেশ করেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন। তাঁরা পালন করল। আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা তা পালন না করত, তাঁদের প্রথম স্বীকারোক্তি কোনো উপকারে আসত না।

এরপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরের সততা সম্পর্কে অবগত হলেন, তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে মদিনায় হিজরতের আদেশ করেন। তিনি আদেশ করলেন। তাঁরা পালন করল। আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা তা পালন না করত, তাঁদের প্রথম স্বীকারোক্তি ও সালাত কোনো কাজে আসত না।

তারপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তাঁদেরকে মক্কায় ফিরে এসে নিজেদের বাপ-দাদা ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ করলেন যতক্ষণ না তারা তাঁদের মতো কালিমা পাঠ করে, তাঁদের সালাতের মতো সালাত আদায় করে, তাঁদের হিজরত করার মতো হিজরত করে। তিনি তাঁদেরকে আদেশ করলেন। তাঁরা পালন করল। আল্লাহর শপথ! যদি তারা তা পালন না করত, তাঁদের প্রথম স্বীকারোক্তি, তাঁদের সালাত, তাঁদের হিজরত ও তাঁদের যুদ্ধ কোনো উপকারে আসত না।

তারপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁদের অন্তরের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তিনি তাঁকে আদেশ করলেন, যেন তিনি তাঁদেরকে ইবাদতরূপে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার এবং আল্লাহর সকাশে হীনতার প্রকাশরূপে মাথা মুণ্ডন করার আদেশ করেন। তিনি আদেশ করলেন। তাঁরা পালন করল। আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা তা না করত, তাঁদের প্রথম স্বীকারোক্তি, সালাত, হিজরত, বাপ-দাদাদেরকে হত্যা করা কোনো কাজে আসত না।

এরপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁদের অন্তরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তাঁকে আদেশ করলেন যেন তিনি তাঁদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করেন যা দ্বারা তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। তিনি তাঁদেরকে সে আদেশ করেছেন। তারা তা পালন করেছে। এমনকি

ছোট-বড় সব কিছুর সাদাকা দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা তা না দিত, তাঁদের প্রথম স্বীকারোক্তি, সালাত, হিজরত, বাপ-দাদাদেরকে হত্যা করা ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কোনো উপকারে আসত না।

তারপর যখন আল্লাহ তাআলা ঈমানের বিধি-বিধান ও সীমারেখা বিষয়ক পরপর নাজিল হওয়া সকল বিষয়ের ব্যাপারে তাঁদের অন্তরের সততা অবগত হলেন, তখন রাসুলকে আদেশ করলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে পাঠ করে শোনান-

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করলাম। [সুরা মায়িদা : ৩]

সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের কোনো একটি গুণ বর্জন করবে, সে আমাদের নিকট ততটুকু অংশের জন্য কাফের সাব্যস্ত হবে। আর যে তা অলসতা কিংবা শিথিলতাবশত ছেড়ে দেবে, আমাদের মতে সে সে পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে। এটাই সুন্নাহ। যেকেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, তা আমার পক্ষ থেকে তার কাছে পৌঁছে দেবে।[১]

[সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ : তিনি হলেন ইমাম আবু মুহাম্মদ সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা হিলালি। হাদিসের হাফেজ। ইসলামের একজন মনীষী। ১০৭ হিজরিতে জন্ম এবং ১৯৮ হিজরিতে মৃত্যু। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯১ বছর। ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ (১৫০-২০৪ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন- যদি মালেক ও ইবনে উয়াইনা না হতেন, হিজাজের ইলম বিলীন হয়ে যেতো। ইমাম

---

১. আবু বকর মুহাম্মদ বিন হুসাইন আজুরি রাহিমাহুল্লাহ (২৮০-৩৬০ হি.) রচিত كتابُ الشَّرِيعَةِ পৃ. ১০৪। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৯ হি.। তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ ফেকি রাহিমাহুল্লাহ (১৮৯২-১৯৫৯ খ্রি.)। মিশরস্থ أَنْصَارُ السُّنَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ প্রেস।

আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হি.) বলেছেন- ইবনে উয়াইনার তুলনায় হাদিসের বড় আলেম আমি কাউকে দেখেনি। তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের ব্যক্তি। আবেদদের অন্যতম। ৭০ বার হজ করেছেন। شَذَرَاتُ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ খ. ১ পৃ. ৩৫৪ ও الأَعْلَامُ খ. ৩ পৃ. ১০৫ চতুর্থ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।]

আলেমগণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাতটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। শর্তগুলো কারো মধ্যে একত্রে না পাওয়া গেলে কালিমা তার কোনো উপকারে আসবে না। সামনে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

CamScanner

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলি

আমাদের জানা উচিত, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবি আমাদের নিকট এই নয় যে, আমরা তার শব্দগুলো গণনা করব ও মুখস্থ করব। কারণ এ কালিমার শর্তাবলি কত সাধারণ মানুষের অর্জিত রয়েছে এবং তারা তা আঁকড়ে ধরে আছে! কিন্তু যদি তাদের বলা হয়- তার শব্দ-সংখ্যা কয়টি ও কী কী গুণে বলুন দেখি, সুন্দরভাবে বলতে পারবে না। পক্ষান্তরে কালিমার শব্দগুলোর কত হাফেজ আছে, যারা তীরের বেগে সেগুলোতে ছোটাছুটি করে![১] অথচ তাদের দেখবেন, কালিমার সাংঘর্ষিক অনেক জিনিসের তারা শিকার হচ্ছে। তাওফিক বস্তুত আল্লাহর হাতে।[২]

প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবেঈ ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ [৩৪-১১০ হি.] কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন- অবশ্যই। তবে প্রত্যেক চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস, তোমার জন্য দরজা খোলা হবে। অন্যথায় খোলা হবে না।[৩]

---

১. যারা কালিমার বার্তা গ্রহণ না করে ও আগত শর্তাবলি পূরণ না করে কালিমার অধিক পরিমাণে জিকির করে, এ উক্তি দ্বারা তারা উদ্দেশ্য কি-না, আল্লাহই ভালো জানেন। -অনুবাদক।

২. শায়খ হাফেজ হাকামি রাহিমাহুল্লাহ (১৩৪২-১৩৭৭ হি.) রচিত مَعَارِجِ القُبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ খ. ১ পৃ. ৩৭৭। প্রথম সংস্করণ। রিয়াদস্থ إِدَارَاتُ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ-এর ফটোগ্রাফি।

৩. ইমাম বুখারি এটি كتابُ الجنائزِ তে تعليقًا রেওয়ায়েত করেছেন। বাব : مَنْ كان آخِرُ كلامِه «لا إله إلَّا الله» খ. ৩ পৃ. ১০৯।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ : তিনি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ইবনে কামিল আল-ইয়ামানি আস-সানআনি। হজরত আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইজ্‌লি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন- তিনি নির্ভরযোগ্য তাবেঈ।

এই চাবির দাঁত হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ-

প্রথম শর্ত : কালিমার উদ্দিষ্ট অর্থ জানা। তাতে কিছু জিনিস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তদ্রূপ কিছু জিনিস সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

অতএব আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। [সুরা মুহাম্মদ : ১৯]

আরো ইরশাদ করেন-

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

তবে [তারা সুপারিশ করতে পারবে] যারা সত্যকে স্বীকার করেছে জেনেশুনে। [সুরা যুখরুফ : ৮৬]

'সত্য'কে স্বীকার করা দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করা উদ্দেশ্য। 'জেনেশুনে' অর্থাৎ তারা মুখে যা বলছে অন্তরে তা জানে।

আরো ইরশাদ করেন-

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। [এ সাক্ষ্য দিয়েছেন] ফেরেশতা ও জ্ঞানীরাও- [তিনি] ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। [তিনি] মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাবান। [সুরা আলে-ইমরান : ১৮]

সহিহ মুসলিমে আছে, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৩৫ হি.] বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

---

তিনি 'সানআ'র বিচারপতি ছিলেন। আবু যুরআ, নাসায়ি ও ইবনে হিব্বান রাহিমাহুমুল্লাহও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাঁর জন্ম ৩৪ হিজরিতে এবং মৃত্যু ১১০ হিজরিতে। تهذيبُ التهذيبِ খ. ১১ পৃ. ১৬৭ দ্রষ্টব্য।

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ». («مَعَارِجُ القُبول» ١ : ٣٧٨، وانظر «الجامع الفريد» ص٣٥٦. والحديث مرويٌّ في «صحيح مسلم»: ١ : ٥٥، ح ٢٦، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي «كتاب الإيمان».)

যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে জানে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ মুসলিম]

দ্বিতীয় শর্ত : নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর অর্থ হচ্ছে- কালিমার উচ্চারণকারীর কালিমার তাৎপর্যের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে। কারণ ঈমানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশ্বাসই উপকারে আসে। ধারণাপ্রসূত জ্ঞান ঈমানের অঙ্গনে উপকারে আসে না।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.

ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর [তাতে] সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরাই সত্যবাদী। [সুরা হুজুরাত : ১৫]

সহিহ মুসলিমে আছে, হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৫৯ হি.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ. وفي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا فَيُحْجَبُ عَنِ الجَنَّةِ». («صحيح مسلم» ١ : ٥٦، ح ٢٧، «كتابُ الإيمان».)

---

১. مَعَارِجُ القُبول ج. ১ পৃ. ৩৭৮।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যে ব্যক্তি সন্দেহ না করে এই দুই সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সন্দেহ না করে কেউ এই দুই সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে জান্নাত থেকে আড়াল করে রাখা হবে না। [সহিহ মুসলিম]

হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ হলো-

«مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الحائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بها قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». («صحيح مسلم» ١ : ٦٠، ح ٣١، كتاب الإيمان).

এই বাগানের দেয়ালের পেছনে যাকেই এ অবস্থায় পাবে যে, সে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। [সহিহ মুসলিম]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৬৭১ হি.] المُفْهِمُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ কিতাবে বলেছেন-

অনুচ্ছেদ : 'তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য শুধু মুখে উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরের বিশ্বাসও জরুরি।' এই শিরোনামে সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিয়া ফেরকার চিন্তাধারা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যারা বলে- সাক্ষ্য দু'টি শুধু মুখে উচ্চারণ করা ঈমানের জন্য যথেষ্ট।[১] এই অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো তাদের আকিদা ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বরং তাদের আকিদা ভ্রান্ত হওয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই জ্ঞাত বিষয়, যার কাছে রয়েছে শরিয়তের জ্ঞান। তাছাড়া তাদের আকিদা শুদ্ধ হলে নিফাকের বৈধতা দেওয়া এবং মুনাফিকের ঈমানদার হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে যা অকাট্যভাবে ভুল।[২]

---

১. ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত মুরজিয়া ফেরকার এখানকার বিবরণ এবং ৯৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর বিবরণের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়।

২. فَتْحُ المَجِيدِ পৃ. ৩৬।

তৃতীয় শর্ত : কালিমার দাবিসমূহ মুখে ও অন্তরে গ্রহণ করা। কালিমা গ্রহণকারীকে মুক্তি দেওয়া ও তার প্রত্যাখ্যানকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বিষয়ক পূর্ব যুগের একটি ঘটনার বিবরণ আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন–

﴿وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾.

আর এভাবেই, যখনই আমি আপনার পূর্বে কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সেখানকার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে- আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি পথের উপর পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। [সতর্ককারী] বললেন- আমি যদি তোমাদের নিকট সেই পথের চেয়ে অধিক সরল কোনো পথ নিয়ে আসি, যার উপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছ- [তবুও কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে?] তারা বলতে থাকল, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি। তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। সুতরাং দেখুন, কেমন ছিল মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম। [সুরা যুখরুফ : ২৩-২৫]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

অতঃপর আমি আমার রাসুলদেরকে ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করব। এটা আমার দায়িত্ব। [সুরা ইউনুস : ১০৩]

আরো ইরশাদ করেন–

﴿اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾.

যখন তাদেরকে বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তারা অহংকার করত এবং বলত- আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আপন উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? [সুরা সাফ্ফাত : ৩৫-৩৬। مَعَارِجُ القُبولِ ১ : ৩৮০]

চতুর্থ শর্ত : কালিমার তাৎপর্যের অনুগত হওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾.

আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর [পূর্ণ] অনুগত হও। [সুরা যুমার : ৫৪]

আরো ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.

আর ধর্মের দিক থেকে ঐ ব্যক্তির তুলনায় উত্তম আর কে হতে পারে, যে নিজ সত্তাকে আল্লাহর অনুগত করে দিয়েছে, আর সে সৎকর্মশীল? [সুরা নিসা : ১২৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন-

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾.

আর যে ব্যক্তি নিজ সত্তা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ, সে তো মজবুত হাতল ধারণ করে। [সুরা লুকমান : ২২]

মজবুত হাতল দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উদ্দেশ্য।

হাদিসে এসেছে-

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. («مَعَارِجُ القُبول» ١ : ٣٨١. وانظر الرِّسَالة الخامسة حول «لا إله إلا الله» المطبوعةَ مع «الكلمات النافعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ٧٣، ط- ٢ سنة ١٤٠٠هـ السلفية بمصر. والحديثُ مَرْوِيٌّ في «الأربعين النَّوَوِيَّة» للإمام النوويِّ ص ١٣٤، الحديث الحادي والأربعون، الطبعة الثانية سنة ١٩٧٣م، الناشر مطابع قطر. قال النوويُّ : وهو حديث حسن صحيح رُوِّيناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح.

তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার অনুগত হয়ে যায়। [কিতাবুল হুজ্জাহ্]

এই হলো পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত স্তরের আনুগত্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

অতএব নয়, আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক বানাবে। তারপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা পাবে না এবং [তা] মেনে নিবে মেনে নেওয়ার মতো। [সুরা নিসা : ৬৫]

হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ [৭০১-৭৭৪ হি.] এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন–

আল্লাহ তাআলা নিজের মহান ও পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছেন- সকল বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক না বানানো পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হবে না। (রাসুলকে বিচারক বানানোর অর্থ হলো তাঁর সুন্নাহকে বিচারক বানানো। তথা মামলা-মকদ্দমা নিষ্পত্তির উৎস বানানো। -অনুবাদক।) অতএব তিনি যে ফয়সালা দিয়েছেন তা-ই সত্য। গোপনে ও প্রকাশ্যে তার আনুগত্য করা জরুরি। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন–

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

তারপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা পাবে না এবং (তা) মেনে নিবে মেনে নেওয়ার মতো।

অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক বানাবে, আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে এবং আপনার দেওয়া ফয়সালা গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না। বরং গোপনে ও প্রকাশ্যে তার আনুগত্য করবে এবং কোনো ধরনের বিরোধিতা,

প্রতিরোধ ও বিতর্ক না করে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে–

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার অনুগত হয়ে যায়।[১]

পঞ্চম শর্ত : সত্যবাদিতা। তাহলো, হৃদয়ের সততার সাথে কালিমা পাঠ করা এবং অন্তর জিহ্বার অনুকূল হওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ﴾. («مَعَارِجِ الْقَبُوْلِ» ١ : ٣٨١)

মানুষ কি মনে করেছে, তাদেরকে এ কথা বলার কারণে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি। আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। অথচ আমি পরীক্ষা করেছি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে? অতএব আল্লাহ অতি অবশ্যই জেনে নিবেন সত্যবাদীদেরকে এবং জেনে নিবেন মিথ্যাবাদীদেরকে। [সুরা আনকাবুত : ১-৩]

আরো ইরশাদ করেন–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ. فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾.

---

১. হাফেজ ইবনে কাসির রহ. রচিত تفسيرُ القرآنِ العظيم খ. ২ পৃ. ৩০৬। তাহকিক : আবদুল আজিজ গুনাইম, মুহাম্মদ আশুর ও মুহাম্মদ বান্না। الشَّعْب প্রেস।

আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে- আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। অথচ তারা ঈমানদার নয়। দাগাবাজি করে তারা আল্লাহর সাথে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে। মূলত তারা নিজেদের সাথেই দাগাবাজি করছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের মিথ্যা বলার কারণে। [সুরা বাকারা : ৮-১০]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এসেছে, হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ১৮ হি.] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النارِ». («صحيح البخاريّ» ١ : ٢٢٦، ح ١٢٨، «كتاب العلم»، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المطبوعُ مع «فتح الباري» بالمطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٨٠هـ، الطبعة الأولى. وانظر «اللُّؤْلُؤُ والمَرْجَانُ فِيْمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ» للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ١ : ٨، ح٢٠، تصوير «المكتبة الإسلامية بيروت».)

যে কেউ অন্তরের সত্যবাদিতার সাথে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বান্দা ও রাসুল, আল্লাহ তাকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামের উপর হারাম করে দেবেন। [সহিহ বুখারি]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] বলেছেন-

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে সত্যায়ন করার দাবি হচ্ছে, কালিমার সকল অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া ও সেগুলোর অনুগত হওয়া। এই স্বীকৃতি ও আনুগত্য বাস্তবায়ন হবে আল্লাহর সকল সংবাদকে সত্যায়ন করে, তাঁর সকল আদেশ পালন করে ও সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে। আর কালিমার অধিকার হলো ইসলামের ঐসকল বিধান যেগুলো কালিমার ব্যাখ্যা। অতএব প্রকৃতপক্ষে কালিমার

সত্যায়নকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে কালিমার উল্লিখিত দাবিগুলো পালন করে। আর জানা কথা যে, জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা কালিমা পাঠ ও কালিমার দাবিসমূহ পূরণ করা ব্যতীত অর্জিত হয় না। এমনিভাবে পরকালে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভও কালিমা পাঠ ও কালিমার দাবিসমূহ আদায় করা ব্যতীত সম্ভব হয় না।[১]

হাদিসে এসেছে–

«شَفَاعَتِيْ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ» (أخرَجَه الحاكم في كتاب «المُسْتَدْرَك» ١ : ٧٠، كتاب الإيمان، وقال : «صحيح الإسناد» ووَافَقَهُ الذهبيُّ.)

আমার সুপারিশ হবে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ইখলাসের সাথে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তার অন্তর তার জিহ্বাকে সত্যায়ন করে এবং তার জিহ্বা তার অন্তরকে সত্যায়ন করে। [মুসতাদরাক]

আল্লামা ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ [৭৩৬-৭৯৫ হি.] বলেন–

যে ব্যক্তি মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে, তারপর আল্লাহর অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় নিজের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করে, তার কর্ম তার উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। সে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করে আল্লাহর যে পরিমাণ অবাধ্যতা করেছে, তার তাওহিদ সে পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ হবে।

ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ﴾.

আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহর পথনির্দেশনা অনুসরণ না করে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল? [সুরা কাসাস : ৫০]

---

১. ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ রচিত اَلتِّبْيَانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآنِ পৃ. ৪৩। টীকা : তাহা ইউসুফ শাহিন।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾. («كلمة الإخلاص» ص ٢٨)

আর তুমি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। [সুরা সোয়াদ : ২৬]

ষষ্ঠ শর্ত : ইখলাস। তাহলো নিয়তকে শুদ্ধ করে শিরকের সকল কলঙ্ক থেকে আমলকে পবিত্র করা।[২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾.

জেনে রাখো, আল্লাহরই জন্য নির্ভেজাল আনুগত্য। [সুরা যুমার : ৩]

আরো ইরশাদ করেন-

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾.

অথচ তাদেরকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, তারা যেন আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করে। [সুরা বায়্যিনা : ৫]

সহিহ বুখারিতে আছে- হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ নকল করেছেন-

«أَسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِيْ مَنْ قالَ : لا إلٰه إلا اللهُ خالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، (أَوْ قَالَ : نَفْسِه)». (صحيح البخاريّ، كتابُ العلم، بابُ الحِرصِ على الحديث، ١ : ١٩٣، ح ٩٩)

আমার সুপারিশ দ্বারা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি, যে খাঁটি মনে বলবে- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। [সহিহ বুখারি]

সহিহ মুসলিমে আছে- হজরত ইতবান ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু[৩] বলেন-

---

২. مَعَارِجُ القُبولِ খ. ১ পৃ. ৩৮২। আরো দেখুন- الجامِعُ الفَرِيدُ পৃ. ৩৫৬।

৩. তিনি হলেন আনসারি সাহাবি ইতবান বিন মালিক খাজরাজি সালিমি। বদর, উহুদ ও খন্দকের জঙ্গে [জিহাদে] অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর গোত্র বনু সালিমের ইমাম ছিলেন। ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النارِ مَنْ قَالَ : لا إله إلا اللهُ يَبْتَغِيْ بِـذلِكَ وَجْـهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». («صحيحُ مسلمٍ» ١ : ٤٥٦، ح ٢٦٣، «كتاب المساجد».)

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন, যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। [সহিহ মুসলিম]

ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহর [২১৫-৩০৩ হি.] الـيَـوْمُ وَاللَّيْلَـةُ কিতাবে দুই সাহাবির হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ قَالَ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» مُخْلِصًا بِهَا قَلْبَهُ، يُصَدِّقُ بِهَا لِسَانَهُ، إِلَّا فَتَقَ اللهُ لَهَا السَّمَاءَ فَتْقًا حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى قَائِلِهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ. (أورَدَ هذا الحديثَ ابنُ رجبٍ في «كلمة الإخلاص» ص ٦١، وقال فيه الألبانيُّ : عَزَاهُ في «الجامع الكبير» (١/٤٧٧/٢) عن يعقوب بن عاصم، قال : «حدثني رجلان من الصحابة». ويعقوبُ هذا من رجال مسلم، ووَافَقَهُ ابنُ حِبَّان، فـإنْ كان السند إليه صحيحًا، فالحديث ثابت.)

যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ও অন্তর দ্বারা জিহ্বাকে সত্যায়ন করে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُـوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বলবে- [আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই। প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।] আল্লাহ এ কালিমার জন্য আকাশকে বিদীর্ণ করে পৃথিবীর ঐ ব্যক্তির দিকে তাকান, যে তা পাঠ করেছে। আর যে বান্দার দিকে আল্লাহ

ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তিনি মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাকান, তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় যে, তার প্রার্থিত বস্তু আল্লাহ তাকে দান করবেন। [আল জামিউল কাবির]

হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ [১০৭-১৮৭ হি.] বলেছেন–

আমল যদি খালেস নিয়তে হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তা কবুল হয় না। তদ্রূপ যদি যথাযথ হয় কিন্তু খালেস নিয়তে না হয়, তা-ও কবুল হয় না। যতক্ষণ না খালেস নিয়তে হয় এবং যথাযথ হয়। খালেস তখন হয়, যখন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়। পক্ষান্তরে যথাযথ তখন হয়, যখন তা সুন্নাহ অনুসারে হয়।[১]

আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী ও তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারীর অবস্থা বোঝার জন্য একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি এমন, যার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কয়েকজন মালিক অংশীদার, আর অপর ব্যক্তি এমন, যে সম্পূর্ণরূপে এক মালিকেরই, এই দুই ব্যক্তির অবস্থা কি সমান? [সুরা যুমার : ২৯]

অধ্যাপক সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ [১৯০৬-১৯৬৬ খ্রি.] এ আয়াতের তাফসিরে বলেন–

এটি তাওহিদে বিশ্বাসী ও শিরকে নিপতিত মানুষের অবস্থা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলার দেওয়া একটি উপমা। শিরকে নিপতিত মানুষের উপমা হলো এমন এক গোলাম, যার মালিক একাধিক। তাদের প্রত্যেকে তার ব্যাপারে একে অপরের সাথে বিবাদ করে। সে তাদের মাঝে বন্টনকৃত। তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে

---

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত اِقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ পৃ. ৪৫১। তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ ফেকি। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৯ হি. আনসারুস সুন্নাহ ছাপাখানা।

রয়েছে তার প্রতি নির্দেশনা। রয়েছে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া দায়িত্ব। সে তাদের মধ্যে পেরেশান অবস্থায় আছে। না পারছে কোনো এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্থির হতে, আর না পারছে কোনো এক পথে অবিচল থাকতে। তাদের চাহিদাগুলো পরস্পর বিরোধী ও বিবাদপূর্ণ হওয়ার কারণে ইচ্ছা থাকলেও পূরণ করতে পারছে না।

পক্ষান্তরে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষের উপমা হলো এমন এক গোলাম, যার মালিক একজন। সে জানে তার মালিক তার নিকট কী চায় এবং তার উপর কী দায়িত্ব ন্যস্ত করে। তাই সে সুস্পষ্ট অভিন্ন পদ্ধতিতে স্থির থাকতে পেরে আরামে আছে। দু'জন কি সমান? কখনোই নয়। কারণ, যে গোলাম একজন মাত্র মালিকের অনুগত, সে স্থিরতা, জ্ঞান ও বিশ্বাসের আরামে রয়েছে। দায়িত্ব পালনে তার যেমন রয়েছে সামর্থ, তেমনি রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

আর যে গোলাম কয়েকজন মালিকের যৌথ সম্পদ, সে সর্বদা শাস্তি ও উৎকণ্ঠায় থাকে। কোনো অবস্থাতেই স্থির থাকতে পারে না। সকলকে সন্তুষ্ট করবে তো দূরের কথা, তাদের একজনকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না।

উপমাটি দ্বারা সকল অবস্থায় তাওহিদের তাৎপর্য ও শিরকের প্রকৃত তত্ত্ব ফুটে উঠে। অতএব তাওহিদের তাৎপর্যে বিশ্বাসী অন্তর হলো ঐ অন্তর, যা আল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত পথে চলে, একমাত্র তাঁর থেকে সাহায্য লাভ করে এবং শুধু তাঁর দিকে ধাবিত হয়।[১]

শায়খ জামালুদ্দিন কাসেমি রাহিমাহুল্লাহ [১২৮৩-১৩৩২হি.] বলেন–

উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মাবুদকে এক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা এবং শিরক বর্জন করা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

---

১. সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত فِي ظِلَالِ القرآنِ খ. ৫ পৃ. ৩০৪৯। বৈধ সংস্করণ। প্রকাশক : দারুশ শুরুক। আরো দেখুন, ইবনুল কাইয়িম রহ. রচিত التفسيرُ القَيِّمُ পৃ. ৪২৩। সংকলন : মুহাম্মদ উওয়াইস নাদাবি। তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ ফেকি। প্রকাশক : লাজনাতুত তুরাস বৈরুত।

﴿ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾. («مَحَاسِنُ التأويلِ» للشيخ محمد جمال الدين القاسميِّ ١٤ : ٥١٣٨، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى ١٣٧٦هـ، دار إحياء الكُتُبِ.)

ভিন্ন ভিন্ন বহু মাবুদ উত্তম, না পরাক্রমশালী এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ? [সূরা ইউসুফ : ৩৯]

ইসলামে আবশ্যক হলো, একমাত্র আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং অন্য কারো সামনে আত্মসমর্পণ না করা। এটিই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তবতা।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনেও নিজকে অর্পণ করে এবং গায়রুল্লাহর সামনেও সমর্পণ করে, সে মুশরিক। আর আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করা ক্ষমা করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে না, সে অহংকারী। অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিরত থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾. (انظُرْ «اقتضاءُ الصراطِ المُستَقِيمِ» ص ٤٥٤ و«التُّحْفَةُ العِرَاقِيَّة» لابن تيمية ص ٤١)

নিশ্চয়ই যারা অহংকার করে আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা মুমিন : ৬০]

সপ্তম শর্ত : কালিমা ও তার দাবিসমূহকে মহব্বত করা এবং তার উপর আমলকারী ও তার শর্তসমূহ রক্ষাকারীদেরকে ভালোবাসা। উপরন্তু তার সাথে সাংঘর্ষিক জিনিসসমূহকে ঘৃণা করা।

ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾. («أَعْلَامُ السُّنَّةِ المَنشُورَة لِاعْتِقَادِ الطائِفَةِ الناجِيَةِ المنصورة» لحافظ بن أحمد الحَكَمِيِّ ص ١٤، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ، الناشِر : إدارات البحوث العلمية بالرياض، وانظر «مَعَارِج القُبول» ١ : ٣٨٣، و«الجامع الفَرِيد» ص ٣٥٦.)

আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে [তাঁর] এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। আর যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে অনেক বেশি ভালোবাসে। [সুরা বাকারা : ১৬৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ অবশ্যই এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। [যারা হবে] ঈমানদারদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর। [যারা] আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

হাদিসে এসেছে–

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». («صحيح البخاريّ» ١ : ٦٠، ح ١٦، «كتابُ الإيمانِ»، و«صحيحُ مسلمٍ» ١ : ٦٦، ح ٤٣، «كتاب الإيمان».)

যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে– ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তার নিকট অন্যদের তুলনায় প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। ৩. আল্লাহ কুফরি থেকে উদ্ধার করার পর কুফরির দিকে ফিরে যেতে অপছন্দ করা, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]

শায়খ হাফেজ বিন আহমদ হাকামি রাহিমাহুল্লাহ [১৩৪২-১৩৭৭ হি.] বলেছেন–

বান্দার তার রবকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো- সে তার রবের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেবে, যদিও তা তার চাহিদার বিপরীত হয়। এবং তার রব যা ঘৃণা করেন সে-ও তা ঘৃণা করবে, যদিও তার মন সেদিকে ধাবিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, সে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেছে, সে তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে। রাসুলের অনুকরণ করবে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাঁর হেদায়াত গ্রহণ করবে।[১]

(নিম্নের القَصِيدَةُ النُّوْنِيَّةُ-এর অনুবাদের পর শায়খ হাফেজ হাকামি রাহিমাহুল্লাহর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। –অনুবাদক।)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর القَصِيدَةُ النُّوْنِيَّةُ তে বলেছেন–

شَرْطُ المَحَبَّةِ أَنْ تُوَافِقَ مَنْ تُحِبُّ ... عَلَى مَحَبَّتِهِ بِلَا عِصْيَانِ

فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ المَحَبَّةَ مَعَ خِلَا ... فِكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُوْ بُهْتَانِ

أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الحَبِيْبِ وَتَدَّعِيْ ... حُبًّا لَهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِ

وَكَذَا تُعَادِيْ جَاهِدًا أَحْبَابَهُ ... أَيْنَ المَحَبَّةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ

لَيْسَ الْعِبَادَةُ غَيْرَ تَوْحِيدِ المَحَبَّةِ ... مَعَ خُضُوعِ القَلْبِ وَالأَرْكَانِ

إِلَى أَنْ يَقُوْلَ :

وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقٍ يَدَّعِيْ الإِ ... سْلَامَ شِرْكًا ظَاهِرَ التِّبْيَانِ

جَعَلُوْا لَهُ شُرَكَاءَ وَالْوَهُمْ وَسَوَّ ... وْهُمْ بِهِ فِي الحُبِّ لَا السُّلْطَانِ

(«النُّوْنِيَّةُ» ص ١٥٨)

---

١. مَعَارِج القُبولِ ج. ١ ص. ٣٨٣ ।

- ভালোবাসার শর্ত হচ্ছে- তুমি যাকে ভালোবাসবে কোনো ধরনের অবাধ্যতা না করে তার ভালোবাসায় সম্মতি দেবে।
- সে যা পছন্দ করে তার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তুমি যদি তার ভালোবাসার দাবি কর, তাহলে তুমি মিথ্যুক।
- তুমি কি প্রিয়জনকে ভালোবাসার দাবি করা সত্ত্বেও তার শত্রুদেরকে ভালোবাসতে থাকবে? তা অসম্ভব।
- তদ্রূপ তার বন্ধুদের সাথে অনমনীয় শত্রুতা করতে থাকবে? কোথায় গেল তোমার ভালোবাসা হে শয়তানের ভাই!?
- অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনম্র আনুগত্যসহ ভালোবাসাকে একমুখী করা ছাড়া ইবাদত অন্য কিছুর নাম নয়।

তারপর এক পর্যায়ে তিনি বলেন–

- আমরা ইসলামের দাবিদার একদলকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত দেখেছি।
- তারা আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদেরকে তাঁর সমকক্ষ স্থির করেছে। [অর্থাৎ তাদেরকে ভালোবেসেছে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো।] ক্ষমতার ক্ষেত্রে নয়।

[**শায়খ হাফেজ হাকামি রাহিমাহুল্লাহ :** তিনি হলেন শায়খ আল্লামা হাফেজ বিন আহমদ হাকামি। তিহামা এলাকার আলেম। (তিহামা এলাকাটি সৌদিআরব ও ইয়েমেনের কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। যথা মক্কা, জেদ্দা, ইয়াম্বু, আল-লাথ, আল-কুনফুদা, মাহিল আসির, জিজান। -অনুবাদক।) ১৩৪২ হিজরিতে 'জিজানে'র নিকটবর্তী 'আস-সালাম' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধা এবং দ্রুত মুখস্থ করতে ও বুঝতে পারার ক্ষেত্রে আল্লাহর এক বিশেষ নিদর্শন ছিলেন। হাম্বলি মাজহাবের সৌদিআরবের বিশিষ্ট আলেম ও দাঈ শায়খ আবদুল্লাহ কারআবি রাহিমাহুল্লাহর (১৩১৫-১৩৮৯ হি.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইলম, তাকওয়া ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অধিকারী। ১৩৭৭ হিজরিতে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। مَعَارِجُ الْقَبُولِ কিতাবের প্রথম খণ্ডের শুরুতে তাঁর পুত্র আহমদ বিন হাফেজ লিখিত তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।]

যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

তাওহিদ মানুষের শুধু এ স্বীকৃতি প্রদানের নাম নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো স্রষ্টা নেই এবং আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর মালিক ও প্রতিপালক। কারণ, এতটুকু স্বীকৃতি আরবের মূর্তিপূজারীদের মধ্যেও ছিল, অথচ তারা ছিল মুশরিক।

মূলত তাওহিদের জন্য উক্ত স্বীকৃতির পাশাপাশি এমন কিছু বিষয় থাকাও আবশ্যক, যার অসিলায় গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং একই গোনাহে বারবার পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। যেমন- আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর জন্য বিনয়-বশ্যতা, তাঁর আনুগত্য করার জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ, ইবাদতকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করা, সর্বোপরি সকল আচরণ-উচ্চারণের মাধ্যমে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা। কাউকে কোনো কিছু দান করলে আল্লাহর জন্য করা। কাউকে কিছু না দেওয়ার কাজটাও আল্লাহর জন্য করা। কাউকে ভালোবাসা ও কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ- সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানো।

যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝবে, সে-ই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম বুঝবে–

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النارِ مَنْ قَالَ : لا إله إلا اللهُ يَبْتَغِيْ بِـذلِكَ وَجْـهَ اللهِ». («صحيحُ مسلمٍ» ١ : ٤٥٦، ح ٢٦٣، «كتاب المساجد».)

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন, যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। [সহিহ মুসলিম]

এ জাতীয় যে সকল হাদিসে শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উচ্চারণকে জান্নাতে প্রবেশের চাবি বলা হয়েছে এবং উক্ত চাবিতে ঐ সকল দাঁত তথা শর্তের উল্লেখ নেই যেগুলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ফলদায়ক হওয়ার জন্য আবশ্যক, এ জাতীয় হাদিসগুলো অনেক মানুষের নিকট দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাই কেউ তো সেগুলোকে মানসুখ তথা রহিত পর্যন্ত ধারণা করেছেন। কেউ বলেছেন- নবিজি এগুলো বলেছেন আদেশ-নিষেধ আসার আগে এবং শরিয়ত স্থির হওয়ার পূর্বে। কেউ আবার 'জাহান্নাম' দ্বারা কাফের ও মুশরিকদের জাহান্নাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদেরকে যে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকে ঐ জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেউ আবার 'জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'-এর অর্থ নিয়েছেন স্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ইত্যাদি বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলো ভুল হওয়ার কারণ হলো- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উক্ত ফজিলত শুধু মুখে উচ্চারণ করার ফল হিসেবে উল্লেখ করেননি। কেননা এ ফজিলত কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণের ফলাফল হওয়া ইসলাম ধর্মের ঐ সকল বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক, যেগুলো মুসলমান মাত্রই জানে। কারণ, মুনাফিকরাও তো এ কালিমা বলত। অথচ তারা কালিমা প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আখেরাতে তাদের ঠিকানা জাহান্নামের নিম্নতর স্তর।

বস্তুত কালিমা উপকারী হওয়ার জন্য তা মুখে যেমন বলতে হয়, তেমনি অন্তরেও উচ্চারণ করতে হয়। অন্তরের উচ্চারণ হলো- তা জানা। তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া। তাতে কোন্ জিনিস সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কোন্ জিনিস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তা যথাযথ বোঝা। যে 'ইবাদত' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ-ই পাওয়ার উপযুক্ত নয় বলা হয়েছে এবং তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত- তার হাকিকত জানা; এবং কালিমার এ হাকিকত মনের জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবস্থায় পরিণত হওয়া। মূলত এ জিনিসগুলোই কালিমা উচ্চারণকারীকে জাহান্নামের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে।

আপনি চিরকুটের হাদিসটির[১] কথা চিন্তা করুন তো! যে চিরকুট হাশরের ময়দানে দাঁড়িপাল্লার এক পাত্রে রাখা হবে, অপর পাত্রে থাকবে গোনাহের নিরান্নব্বইটি নথি। প্রতিটি নথি হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন চিরকুটের পাত্র ভারি হবে এবং নথিগুলোর পাত্র উপরে উঠে যাবে। তাই চিরকুটওয়ালাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। আর এটি তো জানা কথা যে, তাওহিদের কালিমা উচ্চারণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ চিরকুট আছে। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর নেকির পাল্লা ভারি করল, তা হলো তাঁর কালিমা মুনাফিকদের মতো শুধু মুখের উচ্চারণ ছিল না, অন্তরের উচ্চারণও ছিল বটে।

একশ জনের খুনির[২] অন্তরে ঈমানের যে হাকিকত ছিল আপনি তা-ও চিন্তা করুন। এই হাকিকতই তাকে নেককারদের জনপদ অভিমুখে চলা অব্যাহত রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে। সে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরানো অবস্থায়ও বুকের সাহায্যে এগুচ্ছিল। তা ছিল অন্য এক জিনিস। অন্য এক ঈমান। মুখের পাশাপাশি অন্তরেরও উচ্চারিত কালিমা। এ কারণেই তাঁকে নেককার জনপদের বাসিন্দাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এর কাছাকাছি হলো পতিতা মহিলার[৩] অন্তরের অবস্থা, যে পিপাসায় কাতর অবস্থায় কুকুরটিকে মাটি খেতে দেখেছিল। তখন কোনো উপকরণ, কোনো সাহায্যকারী এবং সে তার আমল দেখাবে এমন কেউ না থাকার পরিস্থিতিতে মুখের কালিমা তার অন্তরে এমনভাবে অনুরণিত হয়েছিল যে, তা তাকে মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলেছিল। সে কূপে নেমে মোজায় পানি ভরেছিল। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ঝুঁকির তোয়াক্কা না করে পানিভর্তি মোজা মুখে বহন করে উপরে উঠেছিল।

---

১. হাদিসটি ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ مُسْنَدُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو-এ [২ : ২১৩ দ্বিতীয় সংস্করণ] উল্লেখ করেছেন। তার সনদ হাসান। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহও الإيمانُ অধ্যায়ে [৭ : ২৯৫] উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং ২৬৪১। রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। অতএব হাদিসটি সহিহ।

২. সহিহ বুখারি ৬ : ৫১২। হাদিস নং ৩৪৭০। কিতাবুল আম্বিয়া। সহিহ মুসলিম ৪ : ২১১৮। হাদিস নং ২৭৬৬। কিতাবুত তাওবাহ।

৩. সহিহ মুসলিম ৪ : ১৭৬১। হাদিস নং ২২৪৫। কিতাবুস সালাম।

তাছাড়া সে এমন এক মাখলুকের সঙ্গে বিনয়ের আচরণ করেছে, যাকে প্রহার করাই হলো মানুষের স্বভাব। তার জন্য নিজ হাতে মোজা ধরে রেখেছিল তার পান করা পর্যন্ত। সে তার কাছে কোনো প্রকার প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করেনি। এই সামান্য পরিমাণ তাওহিদের আগুন তার পূর্বের পতিতাবৃত্তি ও নাগরালি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। কারণ, তার কালিমা শুধু মুখের উচ্চারণ ছিল না; তাতে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ও অন্তরের অনুরণনও ছিল।[১]

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

«مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». (صحيحُ مسلمٍ ١ : ٥٣، ح ٢٣، كتاب الإيمان.)

যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করল, তার জান-মালের ক্ষতিসাধন অবৈধ হয়ে গেল। তার হিসাবগ্রহণ আল্লাহর দায়িত্বে। [সহিহ মুসলিম]

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে যে সকল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এ হাদিসটি সেগুলোর অন্যতম। কেননা তাতে কালিমার শুধু উচ্চারণকে জান-মালের নিরাপত্তা দানকারী সাব্যস্ত করা হয়নি; উচ্চারণের পাশাপাশি তার অর্থ জানাকেও সুরক্ষা দানকারী বলা হয়নি; তার স্বীকৃতি দান করাকেও নিরাপত্তা লাভের জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করা হয়নি; এক-অদ্বিতীয় লা-শরিক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা না করাকেও যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং কারো জান-মালের ক্ষতিসাধন ততক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেউ যদি

---

১. ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ রচিত مَدَارِجُ السالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ খ. ১ পৃ. ৩৩০-৩৩২

তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে বা প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকে, তার জান-মালের ক্ষতিসাধন অবৈধ হবে না।[২]

আমরা এ থেকে মুরজিয়াদের[৩] আকিদার ভ্রান্তি বোঝতে পারি, যারা বলে- ঈমান শুধু জানার নাম এবং কুফরি শুধু অজ্ঞতার নাম। তারা আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ নাজাতের জন্য কোনো আমল করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দানকে যথেষ্ট মনে করে। -অনুবাদক।)

একটি জ্ঞাত বিষয় হলো- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য কী, মক্কার কাফেররা তা বুঝতে পেরে অহংকারবশত তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই তাদের এই ঈমান কোনো কাজে আসেনি যে, আল্লাহ তাআলা এক, তিনি রিজিকদাতা, জীবন দানকারী ও মৃত্যু দানকারী। যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারা বলেছিল-

﴿اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ﴾

সে কি উপাস্য সকলকে একজন মাত্র উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে? এতো এক আশ্চর্যের বিষয়! [সুরা সোয়াদ : ৫]

---

২. فَتْحُ الْمَجِيدِ-এর সঙ্গে মুদ্রিত كِتَابُ التَّوحِيدِ পৃ. ১১৫। সপ্তম সংস্করণ ১৩৭৭ হিজরি। তাহকিক : মুহাম্মদ হামিদ ফেকি। প্রকাশক : أَنْصَارُ السُّنَّةِ প্রেস, মিশর।

৩. الْمُرْجِئَةُ শব্দটি التَّأْخِيرُ [পিছিয়ে দেওয়া] অর্থে الإِرْجَاءُ শব্দ থেকে নির্গত। তাদের আকিদা হলো- ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম। দেখুন- ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহ [২৬০-৩২৪ হি.] প্রণীত مَقَالَاتُ الإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَافُ الْمُصَلِّينَ খ. ১ পৃ. ২১৪ এবং ইমাম আবদুল কাহির বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৪২৯ হি.] রচিত الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ وَبَيَانُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْهُمْ পৃ. ২০২

যখন মূর্খ কাফেররা পর্যন্ত বিষয়টি বুঝল, তখন অবাক লাগে ঐ সকল লোকদের আচরণে যারা মুসলমান হওয়ার দাবিদার, অথচ বিষয়টি বুঝে না। বরং মনে করে, কালিমার মৌখিক উচ্চারণই সব, অন্তরে বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক। বুদ্ধিমান হলো ঐ ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে, কালিমার অর্থ হলো- আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টি করে না, জীবিকা দেয় না, জীবন দান করে না, মৃত্যু দান করে না এবং বিশ্ব পরিচালনা করে না। বস্তুত ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যার তুলনায় মূর্খ কাফেররা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তত্ত্ব বেশি জানে।[১]

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ তাদের খণ্ডন করতে গিয়ে আরো বলেন–

এখানে একটি সংশয় রয়েছে। কতক লোকের ভাষ্য মতে তা হলো- যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিল, হজরত উসামা রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৫৪ হি.] কর্তৃক তাকে হত্যা করার কাজটাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্দা করেছিলেন।[২]

তদ্রূপ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী–

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». («صحيح مسلم» ١ : ٥١، ح٢٠، «كتاب الإيمان».)

মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। [সহিহ মুসলিম]

এমনিভাবে এ অর্থের আরো অন্যান্য হাদিস।

এ সকল হাদিস উল্লেখ করার দ্বারা এই মূর্খদের উদ্দেশ্য হলো- যে ব্যক্তি মুখে কালিমা পাঠ করল, তাকে কাফের বলা যাবে না এবং হত্যা করা যাবে না, সে যা-ই করুক। [মুরজিয়াদের দাবি এটাই। তারা বলে– ঈমান আনার পর কোনো গোনাহ ক্ষতিকর হয় না, যেমনিভাবে

---

১. «مُؤَلَّفَاتُ الإمامِ محمدِ بنِ عبدِ الوَهَّابِ» খ. ৫ পৃ. ১৫। প্রথম সংস্করণ। ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ।

২. সহিহ মুসলিম ১ : ৯৭। হাদিস নং ৯৭

কুফর থাকাবস্থায় কোনো নেক আমল উপকারী হয় না।] তখন এই মূর্খ মুশরিকদেরকে বলা হবে-

জানা কথা যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দি করেছেন, অথচ তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছিল। তদ্রূপ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ বনু হানিফা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সালাত আদায় করছিল এবং মুসলমান থাকার দাবি করছিল। হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৪০ হি.] যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়েছেন তারাও এমন ছিল। [তারা আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইলাহ হওয়ার দাবি করেছিল।]

এ মূর্খরা এটি স্বীকার করে যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করল, সে কাফের, তাকে হত্যা করা হবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো রোকন অস্বীকার করল, সে কাফের, তাকে হত্যা করা হবে যদিও সে কালিমা পাঠ করে। তো এ কেমন যুক্তির কথা যে, ইসলামের কোনো শাখা অস্বীকার করলে কালিমা উপকারে আসবে না, কিন্তু তাওহিদ অস্বীকার করা সত্ত্বেও কালিমা উপকারে আসবে যা হলো নবি-রাসুলগণের দীনের মূল!?

মূলত আল্লাহর শত্রুরা হাদিসগুলোর অর্থ বোঝেনি। যে ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করে, তার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হওয়াটা এই দেখার জন্য যে, তার থেকে উক্ত দাবির বিপরীত কিছু প্রকাশ পায় কি-না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾.

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সফর কর, তখন যাচাই-বাছাই করে নিয়ো এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম প্রদান করে, তাকে বলো না- তুমি মুসলমান নও। [সুরা নিসা : ৯৪]

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, বিরত থাকা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনে। তারপর যদি ইসলামের বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়, تَبَيَّنُوا [যাচাই-বাছাই করো]-এর কারণে তাদেরকে হত্যা করা হবে। ইসলাম প্রকাশ করলেই যদি আর কখনো হত্যার বিধান না থাকত, তাহলে এরপর যাচাই-বাছাই করার আদেশের কোনো তাৎপর্য থাকে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজিদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

«أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

(«صحيحُ مسلمٍ» ٢ : ٧٤٢، ح ١٠٦٤، «كتاب الزكاة».)

তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো। আমি যদি তাদের দেখা পাই, আদ সম্প্রদায়ের হত্যাযজ্ঞের মতো আমি তাদেরকে হত্যা করব। [সহিহ মুসলিম]

অথচ তারা ছিল সর্বাধিক ইবাদতকারী এবং সবচেয়ে বেশি কালিমা ও তাসবিহ পাঠকারীদের অন্যতম। এমনকি সাহাবিগণ নিজেদের সালাতকে তাদের সামনে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। অথচ তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম শিখেছে। কিন্তু তাদের থেকে শরিয়তের বিরোধিতা প্রকাশ পাওয়ার কারণে তাদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', ইবাদতের আধিক্য ও মুসলমান হওয়ার দাবি তাদের উপকারে আসেনি।[১]

প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষ বুঝতে পারে যে, কালিমা যদি শুধু মুখের উচ্চারণ হতো, বিষয়টি কুরাইশের জন্য সহজ হতো। কালিমা উচ্চারণ করেই এই কষ্ট ও উপাস্যদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করা থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। কিন্তু তারা জানত- এ কালিমার মর্ম এমন যে, তা কুরাইশের জাহিলি পরিস্থিতি পালটে দেবে এবং তার দাবিগুলো

১. كَشْفُ الشُّبُهَاتِ পৃ. ৪০

তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও মানুষকে দাস বানানোর অবস্থানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে।

মানুষকে মানুষের দাস হওয়া থেকে মুক্ত করে এক-অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহর গোলাম বানানোর ক্ষেত্রে এ কালিমার রয়েছে বিরাট ভূমিকা। বংশ পরম্পরায় বাপ-দাদাদের থেকে প্রাপ্ত জাহিলি আদত-অভ্যাসের পরিবর্তে তাকওয়াকে কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ড ও গৌরবের বিষয় বানানোর ক্ষেত্রেও কালিমার রয়েছে বিরাট অবদান।

তাই ইসলামের প্রতি আন্তরিক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কালিমাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা আবশ্যক, যেন সে ঐসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে।

মানব-জীবনে
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতির প্রভাব

১. এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনো সংকীর্ণমনা হয় না। পক্ষান্তরে যারা একাধিক ইলাহে বিশ্বাসী কিংবা কালিমাতে অবিশ্বাসী, তারা হয় সংকীর্ণ মনের ও অপ্রশস্ত হৃদয়ের।

২. এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস অন্তরে এমন গর্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে, যার সামনে দুনিয়ার কিছুই দাঁড়াতে পারে না। কারণ, উপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনিই শাসন, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মালিক। একারণেই কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ছাড়া সমস্ত ভয় উপড়ে ফেলা হয়। ফলে সে কোনো মাখলুকের সামনে মস্তক অবনত করে না, কারো নিকট মিনতি করে না, কারো সামনে হাত পাতে না এবং কারো বড়ত্ব ও বিশালত্ব দেখে ভয় পায় না। কেননা আল্লাহই মহান ও ক্ষমতাধর। মুশরিক, কাফের ও নাস্তিকের অবস্থা ভিন্ন।

৩. এই কালিমার প্রতি বিশ্বাস থেকে গর্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের পাশাপাশি জন্ম লাভ করে লাঞ্ছনাহীন বিনয় ও অহংকারমুক্ত উঁচুতা। ফলে ধোঁকাবাজ শয়তান তার রগকে ফোলাতে পারে না এবং তার ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা দ্বারা তাকে অহংকারী বানাতে পারে না। কেননা সে নিশ্চিতভাবে জানে, যে আল্লাহ তাকে তার নিকট থাকা সবকিছু দান করেছেন, তিনি সেগুলো যখন ইচ্ছা ছিনিয়ে নিতে পারেন। ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে যখন কোনো তাৎক্ষণিক নেয়ামত লাভ করে, অহংকার ও অহমিকা প্রদর্শন করে।

৪. এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানে- আত্মশুদ্ধি ও নেকআমল ব্যতীত মুক্তি ও সফলতার কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে মুশরিক ও কাফেররা নিজেদের জীবনকে কিছু অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর অতিবাহিত করে। তাদের কেউ বলে- আল্লাহর পুত্র তার পিতার নিকট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছেন। কেউ বলে- আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। অতএব তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেবেন না। কেউ বলে- আমরা আমাদের বড় ও মুত্তাকিদেরকে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে বলব। আবার কেউ নিজ উপাস্যের নিকট এ ধারণাবশত মান্নত পেশ করে যে, সে তা দ্বারা যা ইচ্ছা তা-ই করার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি যে আল্লাহে বিশ্বাসী নয়, সে মনে করে, সে এ দুনিয়ায় স্বাধীন। আল্লাহর শরিয়তের নিকট সে দায়বদ্ধ নয়। তার উপাস্য হলো তার প্রবৃত্তি ও মনের চাহিদা এবং সে এ দুয়ের দাস।

৫. এ কালিমার প্রবক্তার নিকট পৌঁছার জন্য হতাশা পথ খুঁজে পায় না। তার নিকট আসন গেড়ে বসতে পারে না। কারণ তার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই আসমান-জমিনের ধনভাণ্ডারের মালিক। এ কারণেই সে থাকে শান্ত, নিশ্চিন্ত ও আশাবাদী, যদিও তাকে বিতাড়িত করা হয়, লাঞ্ছিত করা হয় এবং জীবনোপকরণ তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

৬. এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ় সংকল্প, পদক্ষেপগ্রহণ, ধৈর্যধারণ, স্থিরতা, অবিচলতা প্রভৃতি মহান শক্তির উপর প্রতিপালিত করে, যখন সে এ গুণগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধারণ করে। সে অনুভব করে, তার পেছনে রয়েছে আসমান-জমিনের মালিকের অদৃশ্য শক্তি। ফলে তার দৃঢ়তা, অবিচলতা এবং এ আকিদা থেকে গৃহিত অনড়তা হয় সুদৃঢ় পাহাড়সম। কাফের ও মুশরিক এ শক্তি ও অবিচলতা কোত্থেকে পাবে?!

৭. এ কালিমা মানুষকে সাহসী বানায় এবং তাদের অন্তর সাহসে ভরে দেয়। কারণ দুটি জিনিস মানুষকে কাপুরুষ ও হীনবল বানায়। **এক.** নিজের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা। **দুই.** এই বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মৃত্যু দিতে পারে। আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস অন্তর থেকে এ উভয় কারণ উপড়ে ফেলে দেয়।

কালিমা তাকে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী বানায় যে, আল্লাহই তার জান-মালের একমাত্র মালিক। তখন সে তার কাছে থাকা সাধারণ ও মূল্যবান সবকিছু তার রবের সন্তুষ্টির পথে বিসর্জন দেয়। আর এ বিশ্বাস দ্বিতীয় কারণটিকে এভাবে মূলোৎপাটন করে যে- কোনো মানুষ, কোনো প্রাণী, কোনো বোমা, কোনো কামান, কোনো তরবারি ও কোনো পাথর তার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারে না। তা পারেন একমাত্র আল্লাহ।

এ কারণেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির তুলনায় অধিক সাহসী ও নির্ভীক মানুষ পৃথিবীতে হয় না। সেনাবাহিনীর অভিযান, কোষমুক্ত তরবারি, বুলেট ও বোমার বর্ষণ তাকে আতঙ্কিত করতে পারে না এবং তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। কেননা, সে যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য অগ্রসর হয়, তখন নিজের শক্তির তুলনায় দশগুণ বেশি শক্তিকে পরাজিত করে। কাফের, মুশরিক ও ধর্মদ্রোহীরা এ শক্তি কোত্থেকে পাবে?

৮. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে বড়ত্ববোধ, অল্পেতুষ্টি ও মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষিতা। তাদের অন্তরকে লোভ, লালসা, হিংসা, হীনতা, নীচতা প্রভৃতি মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র করে।

৯. এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস মানুষকে শরিয়তের দায়বদ্ধ ও তার প্রতি যত্নশীল বানায়। কারণ ঈমানদার এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে- আল্লাহ তাআলা সব কিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তিনি শাহরগের চেয়েও মানুষের অধিক নিকটবর্তী এবং সে

কোনো মানুষের পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারলেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাস যে পরিমাণ থাকবে, সে সেই পরিমাণ শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হবে। শরিয়তের সীমারেখায় অবিচল থাকবে। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা করার দুঃসাহস দেখাবে না। উপরন্তু আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালনে ও কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হবে।

এ কারণেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাসকে একজন ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার জন্য প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুসলমান হলো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর অনুগত ও তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণকারী। আর কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হয় না যতক্ষণ না সে অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসী হয়। এটাই হলো ইসলামের গোড়ার কথা ও শক্তির উৎস। এ ছাড়া ইসলামের যত আকিদা ও হুকুম এবং বিশ্বাস ও বিধান রয়েছে সেগুলো এর উপর নির্ভরশীল, এর থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে। এই ভিত্তিমূল দূর হয়ে গেলে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এ কালিমার অনেক ফজিলত রয়েছে। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ [৭৩৬-৭৯৫ হি.] كَلِمَةُ الإخلاصِ وتحقيقُ مَعْنَاهَا কিতাবে ইমাম সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ [১০৭-১৯৮ হি.] থেকে নকল করেছেন যে–

মানুষকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঙ্গে পরিচিত করার চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত আল্লাহ তাআলা কাউকে দান করেননি। দুনিয়াবাসীদের জন্য ঠাণ্ডা পানি যেমন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতিদের জন্য তেমন। এ কালিমার জন্যই শান্তির নিবাস ও শাস্তির ঘর তৈরি করা হয়েছে। এর প্রয়োজনেই রাসুলগণকে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে তার জান-মাল নিরাপদ করে ফেলল। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করল, তার জান-

মালের নিরাপত্তা থাকল না। এ কালিমা জান্নাতের চাবি এবং রাসুলগণের দাওয়াতের কুঞ্জি।[১]

আমি যদি কালিমার ফজিলত বিষয়ক আলেমগণের উক্তি, সংশ্লিষ্ট হাদিস ও সালাফের বাণী উল্লেখ করতে চাই, তাহলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এ পর্ব এখানে সমাপ্ত করে সামনের পর্ব শুরু করছি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১. كَلِمَةُ الإخلاصِ পৃ. ৫৩

CamScanner

শত্রুতা-মিত্রতার আকিদা

মিত্রতার গোড়ায় রয়েছে ভালোবাসা এবং শত্রুতার গোড়ায় রয়েছে বিদ্বেষ। আর এ দুটো থেকে অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেক ক্রিয়া জন্ম লাভ করে যা শত্রুতা-মিত্রতার প্রকৃত রূপের অন্তর্ভুক্ত। মিত্রতা যেমন- সাহায্য, সৌজন্য, সমর্থন। শত্রুতা যেমন- জিহাদ, হিজরত প্রভৃতি।[১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়- শত্রুতা-মিত্রতা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অন্যতম আবশ্যক বিষয়। কোরআন-সুন্নাহে তার অনেক দলিল রয়েছে।

কোরআনের দলিল

কোরআন পাকের একটি দলিল হলো এ আয়াত–

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾.

ঈমানদাররা যেন ঈমানদারদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে এ কাজ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এ অবস্থায় [তা করতে পার] যে, তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষা করতে চাও। আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল। [সুরা আলে-ইমরান : ২৮]

---

১. শায়খ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ (১২২৫-১২৯৩ হি.) রচিত الرَّسَائِلُ المُفِيدَةُ পৃ. ২৯৬। পরিমার্জন : আবদুর রহমান রুওয়াইশিদ রাহিমাহুল্লাহ (১৯২৮-২০১৬ খ্রি.)। মুদ্রণ : ১৩৯৮ হি. দারুল উলুম, মিশর।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

আপনি বলুন- যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আপনি বলুন- তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না। [সুরা আলে-ইমরান : ৩১-৩২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুদের লক্ষ্য সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

তারা মনে-প্রাণে কামনা করে- তোমরাও কুফরি কর, যেমন তারা কুফরি করেছে, তাহলে তোমরা সকলে সমান হয়ে যাবে। অতএব তোমরা তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না তারা (দারুল হরব থেকে[২]) আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে।[৩] [সুরা নিসা : ৮৯]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তাদের কতক কতকের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে

২. বর্তমান পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ দারুল হরব, তা জানার জন্য ১৭৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩. বর্তমান যুগে হিজরত করে কোথায় যাবে, এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ১৭৭ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। [সুরা মায়িদা : ৫১]

কোরআন পাকে আরো বলা হয়েছে-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ অবশ্যই এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। [যারা হবে] ঈমানদারদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর। [যারা] আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

হাদিস ও সাহাবা-বাণীর দলিল

এ বিষয়ে হাদিস ও সাহাবা-বাণীর মধ্যেও রয়েছে অনেক দলিল। কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ [১৬৪-২৪১ হি.] বর্ণনা করেছেন-

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَهُ عَلَى أَنْ تَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَتَبْرَأَ مِنَ الكَافِرِ. (المُسْنَدُ للإمام أحمد ٤ : ٣٥٧، ٣٥٨، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٨هـ، الناشر : المَكْتَبُ الإسلاميُّ، وهو حديث حَسَن.)

হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে এই মর্মে শপথ নিয়েছেন যে, তুমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং কাফের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। [মুসনাদু আহমদ]

২. ইমাম ইবনে আবি শাইবা রাহিমাহুল্লাহ [১৫৯-২৩৫ হি.] নিজ সনদে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَوْثَقُ عُرَى الإِيمانِ الحُبُّ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ». («الإِيمَانُ» لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٣٥هـ ص٤٥، تحقيق الألبانيّ، وقال : أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَم الكَبِير» عَنِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا، وهو حَسَن، المَطْبَعَة العُمُومِيَّة بِدِمَشْقَ، وانْظُرْ «المُسْنَد» ٤ : ٢٨٦)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষপোষণ। ['আল-ঈমান' লিবনি আবি শাইবা]

৩. ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ [২৬০-৩৬০ হি.] المُعْجَمُ الكَبِيرُ কিতাবে বর্ণনা করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَوْثَقُ عُرَى الإِيمانِ المُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالحُبُّ فِي اللهِ، وَالبُغْضُ فِي اللهِ». (ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي «الجامع الصغير» ١ : ٦٩، وقال الألبانيُّ : حديث حَسَن. انظُرْ «صحيح الجامع الصغير» ٢ : ٣٤٣، ح ٢٥٣٦)

হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো- আল্লাহর জন্য মিত্রতা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষপোষণ। [আল-জামিউস সাগির]

৪. ইমাম ইবনে জারির [২২৪-৩১০ হি.] ও মুহাম্মদ বিন নাস্‌র মারওয়াজি [২০২-২৯৪ হি.] রাহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ بِذلِكَ؛ وَلَنْ

يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُوْنَ كَذٰلِكَ؛ وَقَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاةُ النَاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذٰلِكَ لَا يُجْدِيْ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا». («حِلْيَةُ الأولياءِ وطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ» ١:٣١٢ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ و«جامِعُ العُلومِ والحِكَمِ» لابنِ رَجَبٍ الحَنْبَلِيِّ ص٣٠، الطبعة الثالثة ١٣٨٢هـ، الناشر: مصطفى البابي الحَلَبِيُّ بمصر.)

হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছে, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করেছে, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করেছে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করেছে, তো এর মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জিত হবে। আর কোনো বান্দা ঈমানের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত আস্বাদন করতে পারবে না যতক্ষণ না সে এমন হয়, যদিও তার সালাত-সিয়াম অনেক হয়। বর্তমানে মানুষের ভ্রাতৃত্ব হয়ে পড়েছে দুনিয়ার বিষয়াদির ভিত্তিতে। আর এমন ভ্রাতৃত্ব লোকদের কোনো উপকারে আসবে না। [হিলয়াতুল আউলিয়া]

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমার বাণীর ব্যাখ্যা

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহর পৌত্র ও তাঁর ইলমের প্রচারক শায়খ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ [১২০০-১২৩৩ হি.] হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমার উল্লিখিত বাণীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَالَى فِي اللهِ [আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করেছে] : এটি আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ। তাহলো, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব। এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে- শুধু ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। বরং তার পাশাপাশি বন্ধুত্ব থাকাও জরুরি, যা ভালোবাসার আবশ্যক বিষয়। আর বন্ধুত্ব থাকার প্রকাশক্ষেত্র হলো- সাহায্য করা, সম্মান প্রদর্শন করা, শ্রদ্ধা করা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ক্ষেত্রে প্রিয়জনদের সঙ্গে থাকা।

وَعَادَى فِي اللهِ [এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করেছে] : এটি আল্লাহর জন্য বিদ্বেষপোষণের আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ। তাহলো, আল্লাহর

জন্য শত্রুতা। অর্থাৎ কার্যত শত্রুতা প্রকাশ করা। যেমন- আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ক্ষেত্রে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। তাতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শুধু অন্তরের বিদ্বেষ থাকা যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি তার আবশ্যক কাজগুলোও করা জরুরি।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾. («تيسيرُ العزيزِ الحميدِ شرحُ كتابِ التوحيد» للشيخ سُلَيمَانَ بنِ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ص٤٢٢، الناشر: إدارات البحوث العلمية بالرياض، بدون تاريخ.)

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন- আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। [সুরা মুমতাহিনা : ৪]

বর্তমানের মুসলমানদের নিকট শত্রুতা ও মিত্রতা

(এক লেখক যথার্থ লিখেছেন- এখন পুরা পৃথিবীর দৃশ্য হচ্ছে, বন্ধু দেশ ও বন্ধু প্রতিবেশী হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো উল্লেখ নেই। শত্রু দেশ ও শত্রু প্রতিবেশী হিসাবে কুফরের কোন উল্লেখ নেই। মুসলিম প্রধান দু'টি দেশ পরস্পরে ইসলামের কারণে বন্ধু নয়। একটি অমুসলিম প্রধান দেশ ও একটি মুসলিম প্রধান দেশ পরস্পরে ধর্মের কারণে শত্রুদেশ নয়। বন্ধুত্ব ও শত্রুতার যে মাপকাঠি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দিয়েছেন, তার কোনটাই এখন মুসলমানদের কাছে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং সে মাপকাঠিগুলো অপরাধের প্রতীক।

ধর্মের জন্য লড়াই, ধর্মভিত্তিক বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এখন সর্বোচ্চ অপরাধ। -অনুবাদক।)

শত্রুতা ও মিত্রতার অর্থ

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করার অর্থ হলো- আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁর দীনকে সাহায্য করা, তাঁর বন্ধুদেরকে ভালোবাসা ও তাঁদেরকে সাহায্য করা। তদ্রূপ আল্লাহর জন্য শত্রুতা করার অর্থ হলো- আল্লাহর শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ ভিত্তিতেই প্রজ্ঞাবান শরিয়ত প্রবর্তক প্রথম দলকে 'আল্লাহর বন্ধু' নামে অভিহিত করেছেন এবং দ্বিতীয় দলকে 'শয়তানের বন্ধু' নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

﴿اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾.

আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করেছে, তাদের বন্ধু তাগুত। তারা তাদেরকে বের করে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারসমূহের দিকে। ওরা জাহান্নামের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। [সুরা বাকারা : ২৫৭]

আরো ইরশাদ করেছেন–

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۗءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا﴾.

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের তারা তাগুতের রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সুরা নিসা : ৭৬]

তাওহিদের ধারক-বাহকদের শত্রু থাকা অবশ্যম্ভাবী

জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা যে নবিকেই এই তাওহিদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর জন্য কিছু শত্রু তৈরি করে রেখেছেন। কোরআন পাকে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾.

আর এভাবেই আমি তৈরি করেছি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু তথা দুষ্ট মানুষ ও জিন, যারা [লোকদেরকে] ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অন্যের নিকট সাজানো কথাবার্তা আদান-প্রদান করে। [সুরা আনআম : ১১২]

প্রচুর ইলম থাকা কারো হক হওয়ার দলিল নয়

كَشْفُ الشُّبُهَاتِ কিতাবে রয়েছে– কখনো কখনো তাওহিদের শত্রুদের অনেক ইলম থাকে এবং থাকে অনেক কিতাব ও দলিল-প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

তো, যখন তাদের রাসুলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তাদের নিকট যে জ্ঞান ছিল তার কারণে তারা দম্ভ করতে লাগল। আর যে বস্তু নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছে। [সুরা মুমিন : ৮৩]

মুসলমানের জন্য এ পরিমাণ দীনের ইলম শিক্ষাগ্রহণ করা আবশ্যক যা তার জন্য মানবরূপী এই শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্র হয়। তাহলে না থাকবে তার ভয় এবং না কোনো দুঃশ্চিন্তা। কেননা–

﴿كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾.

শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সুরা নিসা : ৭৬]

একজন তাওহিদে বিশ্বাসী সাধারণ ব্যক্তি হাজার মুশরিক আলেমদের উপর বিজয় লাভ করে। যেমন আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। [সুরা সাফ্ফাত : ১৭৩]

অতএব আল্লাহর বাহিনীই যুক্তি ও তর্কে বিজয়ী হয়, যেমনিভাবে তারা তরবারি ও অস্ত্রে বিজয়ী হয়।[১]

সত্যান্বেষীদেরকে সন্দিহান করে তোলার অপচেষ্টা

(ইলমের শীর্ষ স্তরের কতকের একটি অবস্থা হলো, বিভিন্ন প্রমাণিত বাস্তবতা সম্পর্কে সত্যান্বেষীদেরকে তারা বিশেষ পদ্ধতিতে ধাঁধাঁয় ফেলেন ও সন্দিহান করে তোলেন। যেমন তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলার ভুল-নির্ভুল বিভিন্ন দিক আবিষ্কার করে নির্ভুল কোন্‌টি, তা জানার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল বা নির্দেশনা পেশ করার পরিবর্তে, অনির্দিষ্টভাবে উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করার তারা পরামর্শ দেন। অবস্থা যেন এমন যে, উচ্চতর ইলমি গ্রন্থসমূহ খুললেই সংশ্লিষ্ট আলোচনা সামনে এসে যাবে। এবং সে আলোচনায় দৃষ্টি ফেললে তাদের প্রতিপক্ষের অবস্থানগুলো ভুলই সাব্যস্ত হবে।

ওদিকে এ স্তরের ব্যাপক অধ্যয়ন করা অনেকের জন্য সম্ভবও হয় না। ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে সেসকল প্রমাণিত বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। মিশরে এ ধরনের সংশয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম ছিলেন ডক্টর তাহা হোসাইন প্রমুখ।

তাছাড়া দীনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের জন্যও দলিল পেশ করার দায়বদ্ধতা কার্যত তারা অস্বীকার করেন। এবং তারা চান যে,

---

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ রচিত كَشْفُ الشُّبُهَاتِ পৃ. ২০। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮৮ হি.। প্রকাশক : مُؤَسَّسَةُ النُّوْرِ রিয়াদ। আরো দেখুন– مَجْمُوْعَةُ الرَّسَائِلِ والمَسَائِلِ النَّجْدِيَّةِ খ. ৪ পৃ. ৪৬

মানুষ শুধু তাদের উপর নির্ভর করে সেগুলো মেনে নিক। মানুষের যেসকল সন্দেহ দলিলের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে, দলিলের আলোকে সেগুলো দূর হওয়ার মানুষকে তারা যোগ্য মনে করেন না। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। -অনুবাদক।)

হকপন্থীদের প্রয়োজনীয় ইলম থাকার প্রয়োজনীয়তা

জায়নবাদী দার্শনিকদের 'সংবিধান প্রনয়ণের নির্ধারিত মূলনীতি'র বিবরণ মতে ধর্মদ্রোহী, ইহুদি, খ্রিস্টান, আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞ অনারব, আন্তর্জাতিক জায়নবাদ, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র প্রভৃতি ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্য যখন মুসলমানদেরকে 'ক্ষমতাসীন জাতির[২] গর্দভে' পরিণত করার জন্য তাদের আকিদাকে দুর্বল করা ও তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে বিলীন করা, তখন মুসলমানদের জন্য দীনের এ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব পরিষ্কার হয়, যদ্বারা তারা দুশমনদের খনন করা ধ্বংসের খাদে পিছলে পড়া থেকে রক্ষা পাবে।

ধর্মদ্রোহী বিকৃত পক্ষগুলো এমন এক জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছে যার কয়েকটি শিরোনাম এ রকম- 'ভ্রাতৃত্ব', 'সমতা', 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'। এ গ্রন্থের ['ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা'] শেষ অধ্যায়ে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।[৩]

শত্রুতা ও মিত্রতা ব্যতীত কালিমার তাৎপর্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

কোরআন-সুন্নাহের উল্লিখিত দলিলগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শত্রুতা-মিত্রতার বিষয়টি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অন্যতম আবশ্যক বিষয়। উপরন্তু তা কালিমার তাৎপর্যের বাস্তবায়নও বটে। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

---

২. 'ক্ষমতাসীন জাতি' দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ইহুদি জাতি।

৩. লেখক সামনে এক স্থানে লিখেছেন- 'মুসলমানদের জীবনকে গ্রাস করে নেওয়া এই বিচ্যুতির বিরাট অংশের জন্য আলেমদের ইউনিফর্ম ধারণকারী কিছু লোক দায়ী।' আমরা সেখানে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কিছু উক্তি প্রতিস্থাপন করব। ১৫৮-১৬১ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদান বাস্তবায়নের দাবি হচ্ছে, কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। কারো সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা। একমাত্র আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা। একমাত্র আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা। আল্লাহ যা ভালোবেসেছেন তা ভালোবাসা এবং যা অপছন্দ করেছেন তা অপছন্দ করা।[১] মুসলমানরা যেখানেরই বাসিন্দা হোক, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং কাফেররা যত ঘনিষ্ঠই হোক তাদের সাথে শত্রুতা করা।

তাওহিদের আকিদার দ্বিতীয় রোকন হলো তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা। তা ছাড়া তাওহিদ পূর্ণ হয় না। এটি শত্রুতা-মিত্রতার অংশ। ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾.

অতএব যে কেউ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। [সুরা বাকারা : ২৫৬]

অতএব কোনো ব্যক্তি তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত ঈমানদার হতে পারে না। আর তাগুত হলো- প্রত্যেক ঐ সত্তা আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাকে অনুসরণ করা হয় বা যাকে প্রত্যাশা করা হয় বা যাকে ভয় করা হয়। সুতরাং ঈমান গ্রহণ করা ও মজবুত হাতল আকড়ে ধরার জন্য তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, যেমনটি আয়াত দ্বারা বোঝা গেল।

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত الاِحْتِجَاجُ بِالقَـدْرِ পৃ. ৬২। ১৩৯৩ হি. সংস্করণ। আল-মাকতাবুল ইসলামি।

CamScanner

ঈমানের হাকিকত ও তার বিপরীত জিনিসমূহ

বিপরীত জিনিস আলোচনা করার কারণ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাৎপর্য, শর্ত, হাকিকত ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন তুলে ধরব তা ভঙ্গের কারণসমূহ। যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হাকিকতের পূর্ণরূপ স্পষ্ট হয়। কারণ, কোনো বিষয় স্পষ্ট হওয়ার জন্য তার বিপরীত বিষয় জানার গুরুত্ব অপরিসীম। কথায় আছে- 'বিপরীত বস্তু দ্বারা বস্তু পৃথক ও আলাদা হয়।'

একটি জানা কথা- কুফর, শিরক, নিফাক ও ইরতিদাদ হলো ঈমান ভঙ্গের কারণ। (ইরতিরাদ অর্থ- ইসলাম ত্যাগ করা।) এগুলোর রয়েছে বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশক্ষেত্র। রূপ ও ধরনগুলোর বিবরণ দানের পূর্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা জরুরি। মূলনীতিগুলো দ্বারা সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহের মূল ও শাখাগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে যাবে। এবং মুরজিয়া ফেরকার খণ্ডন হয়ে যাবে। মুরজিয়ারা তাওহিদের আকিদার তাৎপর্যকে হালকা করে ফেলেছে ও নষ্ট করে দিয়েছে। সেগুলো দ্বারা খারেজি ফেরকার খণ্ডনও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা সীমালঙ্ঘন করে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম হলো শিথিলতা ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রান্তিকতামুক্ত ধর্ম।

মুরজিয়াদের শিথিলতা ও খারেজিদের সীমালঙ্ঘন

(মুরজিয়ারা ঈমানের ব্যাপারে শিথিলতা করে। তাদের শিথিলতা হলো- তারা 'অন্তরের বিশ্বাস' বিদ্যমান থাকাকে আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট মনে করে, 'অন্তরের কর্ম' বিদ্যমান না থাকলেও। আগত 'দ্বিতীয় মূলনীতি' দ্রষ্টব্য। আর খারেজি ফেরকার লোকেরা করেছে সীমালঙ্ঘন। তাদের সীমালঙ্ঘন হলো- তারা কবিরা

গুনাহ প্রকাশ পাওয়াকে ঈমান ভঙ্গের কারণ মনে করে এবং কবিরা গুনাহ সাধনকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলে- তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তাছাড়া খারেজিরা ফাসেক ও জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ জ্ঞান করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অবস্থান হলো- সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। 'সুস্পষ্ট কুফরি' বোঝার জন্য ১১৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'একটি জরুরি সংযুক্তি' শিরোনামের অধীনস্ত দলিল ৮টি ও তার পরবর্তী আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। -অনুবাদক।)

আলেমগণ অতীতে ও বর্তমানে ঈমান ভঙ্গের কারণ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকের আলাপ-আলোচনার রয়েছে নিজস্ব রীতি। তবে আমি এ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর একটি মূল্যবান আলোচনা পেয়েছি। দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আলোচনাটি এখানে পরিপূর্ণ তুলে ধরছি। তিনি তাঁর الصَّلَاةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا নামক গ্রন্থে লিখেন-

প্রথম মূলনীতি : কুফর ও ঈমান একটি অপরটির মুখোমুখি অবস্থানরত। একটি বিলুপ্ত হলে অপরটি তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ঈমান হলো বহুসংখ্যক শাখাবিশিষ্ট একটি ভিত্তি। প্রতিটি শাখাকে ঈমান নামে নামকরণ করা হয়। যেমন- সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে সিয়াম, হজ ও জাকাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জা, আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহমুখী হওয়া ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ কর্মগুলোও ঈমান। সর্বশেষ হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। এটিও ঈমানের একটি শাখা।

এ শাখাগুলোর মধ্যে কতক রয়েছে যা বিলুপ্ত হলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- তাওহিদের সাক্ষ্যদান। আবার কতক রয়েছে যা লুপ্ত হলে ঈমান লুপ্ত হয়ে যায় না। যেমন- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। এই দুই শাখার মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধানসম্বলিত অনেক শাখা। সেগুলোর কতক 'তাওহিদের সাক্ষ্যদান শাখা'র সঙ্গে যুক্ত ও তার অধিক নিকটবর্তী। আবার কতক 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো' শাখার সঙ্গে সংযুক্ত ও তার ঢের নিকটস্থ।

অনুরূপভাবে কুফরিরও রয়েছে একটি মূল ও অনেকগুলো শাখা। তো যেভাবে ঈমানের শাখাগুলো ঈমান, তদ্রূপ কুফরির শাখাগুলোও কুফরি। লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। লজ্জার স্বল্পতা কুফরির একটি শাখা। সত্যবাদিতা ঈমানের একটি শাখা। মিথ্যাবাদিতা কুফরির একটি শাখা। সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত ঈমানের শাখা। এগুলো বর্জন করা কুফরির শাখা। আল্লাহর নাজিলকৃত হুকুম দ্বারা ফয়সালা করা ঈমানের শাখা। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা মীমাংসা করা কুফরির শাখা। আল্লাহর সকল অবাধ্যতা কুফরি, যেমনিভাবে তাঁর সমস্ত আনুগত্য ঈমান।

ঈমানের শাখাগুলো দু' প্রকার- উক্তিমূলক ও কর্মমূলক। কুফরির শাখাগুলোও দু' রকম- কর্মমূলক ও উক্তিমূলক। ঈমানের উক্তিমূলক শাখাগুলোর মধ্যে কতক শাখা এমন রয়েছে, যা বিলুপ্ত হলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ তার কর্মমূলক শাখাগুলোর মধ্যেও কতক শাখা এমন রয়েছে যা বিলুপ্ত হলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায়। কুফরির উক্তিমূলক ও কর্মমূলক শাখাগুলোও এমন। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করা একটি কুফরি কাজ। এর দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়। তদ্রূপ মূর্তিকে প্রণাম করা ও কোরআন পাকের কোনো কপির সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করা- এ জাতীয় কুফরি কর্ম দ্বারাও মানুষ কাফের হয়ে যায়। এটি একটি মূলনীতি।

দ্বিতীয় মূলনীতি : এখানে আরেকটি মূলনীতি রয়েছে। তাহলো, ঈমানের হাকিকত উক্তি ও কর্ম উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। আর উক্তি দু' প্রকার- মনের উক্তি ও মুখের উক্তি। মনের উক্তি হলো বিশ্বাসের নাম। পক্ষান্তরে মুখের উক্তি হলো ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করার নাম। কর্মও দু' রকম- অন্তরের কর্ম ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম। অন্তরের কর্ম হলো নিয়ত ও ইখলাস। (আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম হলো- সালাত, সিয়াম, হজ প্রভৃতি। -অনুবাদক।)

যখন এ চারটিই বিলুপ্ত হয়ে যায়, ঈমান তখন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যখন অন্তরের সত্যায়ন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন অপর তিনটি অংশ উপকারে আসে না। কারণ, কালিমার বিশ্বাস সঠিক ও উপকারী

হওয়ার জন্য অন্তরের সত্যায়ন থাকা শর্ত। যদি অন্তরে সত্যতার বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অন্তরের কর্ম বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এটা মুরজিয়া ফেরকা ও আহলুস সুন্নাহর মতপার্থক্যের স্থান।[১]

আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত যে, তার ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্তরের কর্ম তথা ভালোবাসা ও আনুগত্য না থাকাবস্থায় অন্তরের সত্যায়ন উপকারে আসে না, যেমন শয়তান, ফেরাউন, কিবতি সম্প্রদায়, ইহুদি, মুশরিক ও সেসকল লোকদের ক্ষেত্রে অন্তরের বিশ্বাস উপকারে আসেনি, যারা রাসুলকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করত, বরং গোপনে-প্রকাশ্যে তার স্বীকৃতিও দিত- বলত- তিনি গণক নন, তবে আমরা তার অনুসরণ করব না এবং তার প্রতি ঈমান আনব না।

(যেমন ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾.

তারা অন্যায় ও অহংকারবশত সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ তাদের অন্তর সেগুলো বিশ্বাস করেছে। [সুরা নাম্‌ল : ১৪] -অনুবাদক।)

অন্তরের আমল বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বড় আমল (যেমন- সালাত) বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষকরে আমলটি যখন অন্তরের ভালোবাসা ও আনুগত্য না থাকার অপরিহার্য বিষয় হয়, যা নিশ্চিত সত্যায়ন না থাকার অপরিহার্য বিষয়। বস্তুত অন্তরের আনুগত্য না থাকার আবশ্যক হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুগত্য না থাকা। কারণ অন্তর যদি অনুগত হতো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনুগত হতো। আর অন্তর অনুগত না হওয়ার আবশ্যক হলো তাতে সেই সত্যায়ন বিদ্যমান না থাকা, যা আনুগত্যকে আবশ্যক করে। আর এটিই হলো ঈমানের হাকিকত।

---

১. ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত মুরজিয়া ফেরকার এখানকার বিবরণ এবং ৫৩ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহর বিবরণের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়।

কেননা পূর্বে বলা হয়েছে- ঈমান শুধু সত্যায়নের নাম নয়। ঈমান বস্তুত ঐ সত্যায়নের নাম যা আনুগত্য ও বশ্যতাকে আবশ্যক করে। তদ্রূপ হেদায়েত শুধু হক জানা ও তা স্পষ্ট হওয়ার নাম নয়। বরং ঐ হক জানার নাম হেদায়েত, যা তার অনুসরণ করাকে ও তার দাবি অনুসারে আমল করাকে আবশ্যক করে। যেমনিভাবে সত্যায়নের বিশ্বাসকে সত্যায়ন নামে নামকরণ করা হলেও তা ঐ সত্যায়ন নয়, যা ঈমানকে আবশ্যক করে। মূলনীতিটি পুনরায় পাঠ করা ও লক্ষ্য রাখা জরুরি।

(আলোচ্য মূলনীতিটি ভালোভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য বিরতি দিয়ে দিয়ে মনোযোগের সাথে কয়েকবার পাঠ করতে হবে। -অনুবাদক।)

তৃতীয় মূলনীতি : এখানে আরেকটি মূলনীতি রয়েছে। তা হলো- কুফরি দু' প্রকার- **এক.** আমলের কুফরি। **দুই.** প্রত্যাখ্যান ও হঠকারিতার কুফরি। প্রত্যাখ্যানের কুফরি হলো- আল্লাহর নাম, গুণ, কর্ম ও বিধান ইত্যাদি যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিদিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন, প্রত্যাখ্যান ও হঠকারিতাবশত তা অস্বীকার করা। এ কুফরির প্রতিটি দিক ঈমান-বিধ্বংসী।

পক্ষান্তরে আমলের কুফরির দু'টি ভাগ রয়েছে- কতক ঈমান-বিধ্বংসী, কতক ঈমান-বিধ্বংসী নয়। যেমন মূর্তিকে প্রণাম করা, কোরআন পাকের কোনো কপির সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করা, নবিকে হত্যা করা ও গালি দেওয়া ইত্যাদি কুফরি কর্মগুলো ঈমান-বিধ্বংসী। (পক্ষান্তরে ব্যভিচার, চুরি, মদপান ও ছিনতাই প্রভৃতি কুফরি কর্মগুলো ঈমান-বিধ্বংসী নয়। -অনুবাদক।)

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার করা ও সালাত বর্জন করা নিশ্চিতভাবে আমলের কুফরির অন্তর্ভুক্ত। [সামনে 'একটি জরুরি সংযুক্তি' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য হুকুম দ্বারা ফায়সালা করা কখন ফায়সালাকারীর জন্য ঈমান ভঙ্গের কারণ হবে, আর কখন তা করা সত্ত্বেও ফায়সালাকারীর ঈমান বাকি থাকবে।] আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যখন এ কর্মকে কুফরি বলেছেন, তখন তাকে কুফরি না বলার অবকাশ নেই। মোট কথা, কোরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারী বিচারক কাফের এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুসারে সালাত বর্জনকারী কাফের। কিন্তু তা আমলের কুফরি, আকিদার কুফরি নয়।

এতো অসম্ভব যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচারকারীকে আল্লাহ তাআলা কাফের বলবেন[১] এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত বর্জনকারীকে কাফের বলবেন[২], আর তাদের কর্মকে কুফরি বলা হবে না! ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপ ও ঐ ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অবিচার থেকে নিরাপদ নয়- তারা ঈমানদার নয় বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তারা আমলের দিক থেকে কাফের, প্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাসের দিক থেকে নয়।

অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস-

«لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». («صحيح مسلم» ١ : ٨١، ح ٦٥، كتاب الإيمان.)

আমার পর তোমরা কাফের অবস্থায় ফিরে যেও না যে, তোমাদের কতক কতকের ঘাড়ে আঘাত করবে। [সহিহ মুসলিম]

এটি আমলের কুফরি। তদ্রূপ রাসুলের এ হাদিস-

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». (أبو داود في «الطب» ٤ : ٢٢٥، ح ٣٩٠٤. وانظر «مشكاة المصابيح» ٢ : ١٢٩٤، ح ٤٥٩٩، وقال الألبانيُّ : إسناده صحيح.)

যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসল এবং সে যা বলে তাকে সত্য জ্ঞান করল, অথবা নিজ স্ত্রীর নিকট তার পেছনের পথ দিয়ে গেল, মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ল। [সুনানু আবি দাউদ]

---

১. সুরা মায়িদা : ৪৪

২. সহিহ মুসলিম ১ : ৮৮, হাদিস নং ৮২। কিতাবুল ঈমান।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন-

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ!، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». («صحيح مسلم» ١ : ٧٩، ح ٦٠، كتاب الإيمانِ.)

যখন কেউ তার ভাইকে সম্বোধন করে বলে, 'হে কাফের!', তখন তাদের কোনো একজন তা নিয়ে ফিরে। [সহিহ মুসলিম]

যে ব্যক্তি কোরআন পাকের কিছু অংশের উপর আমল করেছে এবং অপর কিছু অংশের উপর আমল বর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে যে অংশের উপর আমল করেছে সে অংশের মুমিন এবং যে অংশের উপর আমল বর্জন করেছে সে অংশের কাফের সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন-

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

আর স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি- তোমরা নিজেদের রক্ত ঝরাবে না এবং নিজেদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না। তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছ। আর তোমরা সাক্ষ্য দানকারী ছিলে। এই যে! তোমরা তারপর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করছ, পাপ ও সীমালঙ্ঘন করে একে অপরকে সাহায্য করছ। আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, মুক্তিপণ দিয়ে তোমরা তাদেরকে ছাড়িয়ে নাও, অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করা ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর?

অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করবে, তার একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখবর নন। [সুরা বাকারা : ৮৪-৮৫]

এখানে আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিলেন- তিনি বনু কুরায়জা ও বনু নাজিরের ইহুদিদেরকে যে প্রতিশ্রুতি পূরণের আদেশ করেছেন, তারা তা স্বীকার করেছে এবং রক্ষা করেছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়- তারা স্বীকৃতি দিয়েছে যে- তাদের কতক কতককে হত্যা করবে না এবং কতক কতককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না।

তারপর সংবাদ দিলেন যে, তারা তাঁর আদেশ অমান্য করেছে- তাদের একদল অপর দলকে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে। এ হলো ঐ প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার বিবরণ যা তিনি তাওরাতে তাদের থেকে নিয়েছেন। তারপর সংবাদ দিলেন যে, তারা যেন মুক্তিপণ প্রদান করে ঐ দলের বন্দী হওয়া লোকদেরকে মুক্ত করে। এ হলো ঐ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার বিবরণ, যা আল্লাহ তাওরাতে তাদের থেকে নিয়েছেন।

এভাবে তারা অঙ্গীকারের উপর যে পরিমাণ আমল করেছে, সে পরিমাণ ঈমানদার এবং যে পরিমাণ বর্জন করেছে, সে পরিমাণ কাফের সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং আমলি ঈমানের বিপরীত হলো আমলি কুফর এবং আকিদাগত ঈমানের বিপরীত হলো আকিদাগত কুফর। এই পার্থক্যের বিষয়টি নিম্নোক্ত সহিহ হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা দ্বারা দৃশ্যমান হয়-

«سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». («صحيحُ مسلِمٍ» ١ : ٨١، ح ٦٤، كتاب الإيمانِ.)

ঈমানদারকে গালি দেওয়া অন্যায় কাজ, আর তার সঙ্গে লড়াই করা কুফরি কাজ। [সহিহ মুসলিম]

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা ও তাকে গালি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন- একটাকে এমন অন্যায় সাব্যস্ত করেছেন যার দ্বারা ব্যক্তি কাফের হয় না। অপরটাকে কুফরি আখ্যা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এখানে তাঁর উদ্দেশ্য আমলের কুফরি, আকিদার কুফরি নয়। এ কুফরির কারণে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায় না, যেমনিভাবে বের হয়ে যায় না ব্যভিচারী, চোর ও মদ্যপ। যদিও তারা এ সকল অপকর্ম করা অবস্থায় ঈমানদার থাকে না।

[এখানে ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য সম্ভবত মুসলমানদের কতকের বিরুদ্ধে কতকের যুদ্ধ, যেমনটি সাহাবিগণের মধ্যে হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, তার এমন কুফরিতে জড়িত হয়ে পড়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যা তাকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দেবে। যেমনটা ইসলামের শত্রুদের অবস্থা, যারা কোনো ঈমানদারের না আত্মীয়তার প্রতি খেয়াল রাখে, আর না তার কোনো চুক্তির তোয়াক্কা করে। বরং তাদের লক্ষ্য হলো- 'তারা তোমাদের কাফের হওয়া কামনা করে যেভাবে তারা কাফের হয়েছে, ফলে তোমরা পরস্পর সমান হয়ে যাবে'। -সুরা নিসা : ৮৯]

উল্লিখিত ব্যাখ্যা হলো সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য, যাঁরা ছিলেন আল্লাহর কিতাব, ইসলাম, কুফর ও এ দুয়ের আবশ্যক বিষয়সমূহের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই এ সকল বিষয় তাঁদের নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী লোকেরা তাঁদের উদ্দেশ্য না বোঝে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে- একদল কবিরা গুনাহের কারণে মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি সাব্যস্ত করেছে। [এর দ্বারা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য খারেজি ফেরকা।] অপরদল তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার গণ্য করেছে। [এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মুরজিয়া ফেরকা।] ওরা করেছে সীমালঙ্ঘন। এরা করেছে শিথিলতা।

আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহকে আদর্শ পদ্ধতি ও প্রান্তিকতামুক্ত মত গ্রহণ করার তাওফিক দান করেছেন। ইসলামের ভেতরকার

ফেরকাগুলোর মধ্যে আহলুস সুন্নাহর উদাহরণ তেমনই, যেমন ইসলামের উদাহরণ সকল ধর্মের মধ্যে।

মোট কথা কুফরি দু'প্রকার- **এক.** এমন কুফরি যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। **দুই.** এমন কুফরি যাতে জড়িত ব্যক্তি তখনও মুসলমান বাকি থাকে। নিফাক, শিরক, ফিসৃক, জুলুম প্রভৃতি প্রতিটি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রতিটির রয়েছে দুটি স্তর।

কুফরি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾.

আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই কাফের। [সুরা মায়িদা : ৪৪]

সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন- উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে হিশাম ইবনে হুজাইর রাহিমাহুল্লাহ হজরত তাউস রাহিমাহুল্লাহর [মৃ. ১০৬ হি.] সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমার [মৃ. ৬৮ হি.] নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন-

'তা তাদের মধ্যে বিদ্যমান একটি কুফর। তা ঐ ব্যক্তির কুফরের মতো নয় যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসুলগণকে অস্বীকার করেছে।' অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, 'তা এমন কুফর যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না।'

তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন- 'তা এমন কুফর নয় যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়।'[১]

ওয়াকি বিন সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহ [১২৮/১২৯-১৯৭ হি.] ইবনে জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহর [৮০-১৫০ হি.] সূত্রে হজরত আতা রাহিমাহুল্লাহর [২৭-১১৪ হি.] উক্তি উদ্ধৃত করেছেন- (তা) প্রধান

১. তাফসিরে ইবনে কাসির ৩ : ১১১

কুফরির তুলনায় নিম্নমানের কুফর; প্রধান জুলুমের তুলনায় নিম্নমানের জুলুম; প্রধান ফিস্‌কের তুলনায় নিম্নমানের ফিস্‌ক।[১]

যে ব্যক্তি কোরআন বুঝেছে, হজরত আতা রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা তাঁর সামনে পরিষ্কার। কারণ, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা বিচারকারীকে আল্লাহ তাআলা কাফের বলেছেন। এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যানকারীকেও কাফের বলেছেন। বলাবাহুল্য, এ দুই কাফের সমান স্তরের নয়।

জুলুম

আল্লাহ তাআলা প্রকৃত কাফেরকেও কখনো কখনো 'জালেম' বলেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾.

আর কাফেররাই জালেম। [সুরা বাকারা : ২৫৪]

অপর এক আয়াতে বিবাহ, তালাক, রাজআত ও স্ত্রীকে খোলা তালাক দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা 'জালেম' আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ﴾.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমাগুলো লঙ্ঘন করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করল। [সুরা তালাক : ১]

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছেন–

﴿لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾.

আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা আম্বিয়া : ৮৭]

হজরত আদম ও হজরত হাওয়া আলাইহিমাস সালাম বলেছেন–

১. প্রাগুক্ত।

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলেছি। [সুরা আরাফ : ২৩]

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন–

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾.

হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করে ফেলেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। [সুরা কাসাস : ১৬]

এই জুলুম সেই জুলুম নয়।

ফিস্‌ক

আল্লাহ তাআলা কাফেরকে 'ফাসেক' বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾.

আর তিনি তা দ্বারা কেবল ফাসেকদেরকে গোমরাহ করেন, যারা আল্লাহর [সঙ্গে কৃত] অঙ্গীকার দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে। [সুরা বাকারা : ২৬-২৭]

আরো ইরশাদ করেছেন–

﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾.

আর অবশ্যই আমি আপনার নিকট অনেক সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি। আর ফাসেক ছাড়া কেউ সেগুলো অস্বীকার করে না। [সুরা বাকারা : ৯৯]

কোরআন পাকে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারকেও ফাসেক বলেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের নিকট কোনো ফাসেক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে যাচাই-বাছাই করে নিয়ো, যাতে কোনো সম্প্রদায়কে অজ্ঞতাবশত আক্রমণ করে না বস, ফলে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পরে অনুতাপ করবে। [সুরা হুজুরাত : ৬]

এ আয়াতটি সাহাবি হজরত হাকাম ইবনু আবিল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু [মৃ. ৩১ হি.] সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। অতএব এই ফাসেক সেই ফাসেক নয়।

(এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে তাবারি'র এক বর্ণনায় আছে- فَحَدَّثَهُ الشَّيْطَانُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ অর্থাৎ শয়তান একজন মানুষের বেশে উপস্থিত হয়ে সাহাবিকে বলল, বনু মুস্তালিকের লোকেরা আপনাকে হত্যা করতে চায়।

এ তাফসির অনুসারে আয়াতে সাহাবিকে ফাসেক বলা হয়নি, বরং শয়তানকে ফাসেক বলা হয়েছে। অতএব ফাসেক শব্দ দ্বারা এ আয়াতে কাফেরকেই বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক।)

আরো ইরশাদ করেছেন-

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি [ব্যভিচারের] অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তাদেরকে আশিটি চাবুক মারো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর ওরাই ফাসেক। [সুরা নুর : ৪]

ইবলিস সম্পর্কে বলেছেন-

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾.

তারপর সে তার প্রভুর আদেশের ব্যাপারে ফাসেকি করল। [অর্থাৎ আদেশ অমান্য করল] [সুরা কাহাফ : ৫০]

ইরশাদ করেছেন-

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.

অতএব যে ব্যক্তি তাতে [হজের মাসগুলোতে ইহরাম বেঁধে নিজের উপর] হজ ফরজ করে নিবে, তার জন্য হজে কোনো অশ্লীলতা, ফাসেকি ও ঝগড়া করার সুযোগ নেই। [সুরা বাকারা : ১৯৭]

এই ফাসেকি সেই ফাসেকি নয়।

জাহালাত

কুফর দু'প্রকার, জুলুম দু'প্রকার, ফিস্‌ক দু'প্রকার। অনুরূপভাবে জাহালাত ও অজ্ঞতাও দু'প্রকার। এক প্রকার জাহালত কুফরি। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং জাহেলদেরকে [কাফেরদেরকে] এড়িয়ে চলুন। [সুরা আরাফ : ১৯৯]

দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞতা কুফরি নয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾.

কেবল এমন লোকদের তওবা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্ব, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কর্ম করে, তারপর অবিলম্বে তাওবা করে। [সুরা নিসা : ১৭]

শিরক

অনুরূপভাবে শিরক দু'প্রকার- **এক.** বড় শিরক যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। **দুই.** ছোট শিরক যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তা আমলের শিরক, যেমন রিয়া বা মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা।

আল্লাহ তাআলা 'বড় শিরক' সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। [সুরা মায়িদা : ৭২]

আরো ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বাতাস তাকে [উড়িয়ে নিয়ে] কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। [সুরা হজ : ৩১]

রিয়া বা লোক প্রদর্শনের শিরক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে [অর্থাৎ আখেরাতের উপর যার ঈমান আছে], সে যেন নেকআমল করে এবং নিজের রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। [সুরা কাহাফ : ১১০]

নিম্নোক্ত হাদিসে এ ছোট শিরকই উদ্দেশ্য–

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». (أبو داود ٣ : ٥٧٠، ح ٣٢٥١، كتاب الأَيْمان والنُّذُور؛ وأخرجه الترمذيّ ٥ : ٢٥٣، ح ١٥٣٥ في النذور والأَيْمان، واللفظ عنده : «فقد كَفَرَ أو أشرَكَ»، وقال : حديث حسن، وقال الشوكانيُّ : صحَّحه الحاكم. انظر «نَيْل الأَوْطارِ» ٨ : ٢٥٧).

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল, সে শিরক করল। [সুনানু আবি দাউদ]

আর জানা কথা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা, শপথকারী ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না এবং তার জন্য কাফেরদের হুকুম সাব্যস্ত করে না। সামনের হাদিসটিও এ শ্রেণির। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

«الشِّرْكُ فِي هذِهِ الأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ». (المُسْنَد ٤ : ٤٠٣. قال الألبانيُّ : صحيح، انظر «صحيح الجامع الصغير» ٣ : ٢٣٣، ح ٣٦٢٤.)

এ উম্মতের শিরক পিপড়ার হামাগুড়ির চেয়েও গোপন। [মুসনাদু আবি ইয়ালা।]

নিফাক

লক্ষ্য করুন- শিরক, কুফর, ফিস্ক, জুলুম, জাহালাত প্রভৃতির প্রতিটি কিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হলো- **এক.** এমন কুফর যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। **দুই.** যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তদ্রূপ নিফাকও দু'ভাগে বিভক্ত- **এক.** আকিদার নিফাক। **দুই.** আমলের নিফাক। আকিদার নিফাক হলো মুনাফিকদের সে অবস্থা, কোরআন পাকে আল্লাহ তাআলা যার নিন্দা করেছেন এবং যার কারণে তাদের জন্য জাহান্নামের নিম্নতর স্তর সাব্যস্ত করেছেন।

(শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

'এই নিফাকের ধরন হলো- [নিজের মুসলমান হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও] রাসুলকে মিথ্যুক মনে করা বা তাঁর আনীত কতক জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাঁর অনুসরণ জরুরি হওয়ার বিশ্বাস না রাখা বা কোথাও তাঁর ধর্মের প্রভাব দুর্বল হওয়াতে আনন্দিত হওয়া বা সবল হওয়াতে কষ্ট পাওয়া- এককথায় এমন কিছু অবস্থা, যা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদেরই হয়ে থাকে।'[১] -অনুবাদক।)

পক্ষান্তরে আমলের নিফাকের উদাহরণ এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত সহিহ হাদিসে-

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا أُئْتُمِنَ خَانَ». («صحيح البخاريّ» ١ : ٨٩، ح ٣٣، ٣٤، كتاب الإيمان؛ و«صحيح مسلم» ١ : ٧٨، ح ٥٨, ٥٩، كتاب الإيمان.)

মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি- **এক.** যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। **দুই.** যখন প্রতিশ্রুতি দেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। **তিন.** আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাস ঘাতকতা করে। [সহিহ বুখারি]

সহিহ হাদিসে আরো এসেছে-

---

১. الفَتَاوَى খ. ২৮ পৃ. ৪৩৪।

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ».

চারটি স্বভাব যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে সেগুলোর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব থেকে যাবে তা বর্জন করা পর্যন্ত– **এক.** যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। **দুই.** যখন প্রতিশ্রুতি দেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। **তিন.** যখন ঝগড়া করে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। **চার.** যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে। [সহিহ বুখারি]

এগুলো হলো আমলের নিফাক যা কখনো মূল ঈমানের সঙ্গে একত্রিত হয়। কিন্তু এগুলো যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণতা লাভ করে, তখন ব্যক্তি কখনো কখনো ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায়, যদিও সে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং নিজকে মুসলমান মনে করে। কারণ, ঈমান মুমিনকে এসকল স্বভাব থেকে বিরত রাখে। অতএব যখন কারো মধ্যে সেগুলো পূর্ণতা লাভ করে এবং এমন কিছু থাকে না, যা তাকে এগুলোর কোনোটি থেকে বিরত রাখবে, তাহলে সে নির্ভেজাল মুনাফিকই হবে।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর উক্তি দ্বারাও উল্লিখিত দু'প্রকারে কুফরির বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে। কারণ, ইসমাইল বিন সাঈদ সালান্‌জি[১] রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৩০ হি.] বলেছেন, আমি আহমদ

---

১. ইসমাঈল সালান্‌জি হলেন আবু ইসহাক ইসমাইল বিন সাঈদ সালান্‌জি। আবু বকর খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ (২৩৫-৩১১হি.) তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন– তাঁর রয়েছে প্রচুর মাসআলার জ্ঞান। আবু আবদুল্লাহর –আহমদ বিন হাম্বল– শিষ্যদের মধ্যে কারো সম্পর্কে আমার মনে হয় না, যিনি আবু আবদুল্লাহ থেকে তাঁর তুলনায় উত্তম বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর তুলনায় অধিক তৃপ্তিকর ও অধিক সংখ্যক মাসআলা রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ছিলেন ফকিহ আলেম। ফকিহগণের নিকট তাঁর রয়েছে বিরাট মর্যাদা ও পরিচিতি। البَيَانُ عَلَى ترتيبِ الفُقَهَاءِ শিরোনামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। ইবনে আবি ইয়ালা রচিত طَبَقَاتُ الحَنَابِلَةِ খ. ১ পৃ. ১০৪ দ্রষ্টব্য।

বিন হাম্বলকে কবিরা গুনাহে অনড় ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি- যে চেষ্টা ব্যয় করে কবিরা গুনাহ করে, তবে সে সালাত-সিয়াম-জাকাত বর্জন করেনি, যার অবস্থা এরূপ, সে কি 'গুনাহের ব্যাপারে অনড়' বলে সাব্যস্ত হবে? তিনি বলেছেন, তাকে 'অনড়' বলা হবে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». («صحيح مسلم» ١: ٧٦، ح ٥٧، كتاب الإيمان.)

'ব্যভিচারী ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না।' [সহিহ মুসলিম]

ব্যভিচারি ব্যক্তি উক্ত অবস্থায় ঈমান থেকে বেরিয়ে যায়, তবে ইসলামে বাকি থাকে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«لَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وهُوَ مُؤْمِنٌ». («صحيح مسلم» ١: ٧٦، ح ٥٧، كتاب الإيمان.)

মদ্যপ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করে না এবং চোর ঈমানদার অবস্থায় চুরি করে না। [সহিহ মুসলিম]

যেমন আল্লাহ তাআলার নিম্নের বাণী সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমার বক্তব্য-

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾.

আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই কাফের। [সুরা মায়িদা : ৪৪]

ইসমাইল বললেন- আমি আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে বললাম- এটা কেমন কুফরি? তিনি বললেন- এর কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। ঈমানের সকল শাখা যেমন এক স্তরের নয়, তদ্রূপ কুফরের সকল শাখাও সমান স্তরের নয়। অবশ্য তা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যার [কারণে ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়ার] ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

চতুর্থ মূলনীতি : এখানে আরেকটি মূলনীতি রয়েছে। তাহলো- কারো মধ্যে কখনো কখনো কুফর ও ঈমান, শিরক ও তাওহিদ, তাকওয়া ও অবাধ্যতা এবং ঈমান ও নিফাক একত্রিত হয়। এটি আহলুস সুন্নাহর অন্যতম মূলনীতি। খারেজি, মুতাজিলা[১] ও কাদরিয়্যা[২] প্রভৃতি বিদআতি দলগুলো এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহের বিরোধিতা করেছে। কবিরা গুনাহে লিপ্ত লোকেরা জাহান্নাম থেকে বের হবে কি-না, নাকি তাতে চিরস্থায়ী হবে, এ বিষয়টি এ মূলনীতির উপরই নির্ভরশীল। মূলনীতিটি কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾.

আর তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু এভাবে যে, [তাঁর সঙ্গে] শিরকও করে। [সুরা ইউসুফ : ১০৬]

এখানে শিরক করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের জন্য ঈমান সাব্যস্ত করেছেন।

---

১. খারেজিদের বিষয়ে ৯৫-৯৬ নং পৃষ্ঠায় আলোকপাত করা হয়েছে। (-অনুবাদক।) মুতাজিলা ঐ সকল লোক, যারা কোরআনকে মাখলুক বলে। তারা জান্নাতে জান্নাতিদের আল্লাহ তাআলাকে দেখা, কবরের আজাব, হাশরের মাঠে রাসুলের সুপারিশ ও হাউসে কাউসারকে অস্বীকার করে। তারা নিজেদের মতাদর্শের লোক ব্যতীত অন্য কোনো আহলে কিবলার পেছনে সাধারণ সালাত ও জুমার সালাত আদায় করাকে বৈধ জ্ঞান করে না। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত السُّنَّةُ। পৃ. ৮১ এবং ইমাম ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ [৫১০-৫৯৭ হি.] রচিত تلبيسُ إبليسَ পৃ. ৩০ দ্রষ্টব্য।

২. কাদরিয়্যা হলো ঐ সকল লোক যারা মনে করে- সাধ্য, ইচ্ছা ও সক্ষমতা তাদের নিজেদের। তারা নিজেদের কল্যাণ, অকল্যাণ, লাভ, ক্ষতি, আনুগত্য, অবাধ্যতা, হেদায়াত ও গোমরাহি প্রভৃতির মালিক নিজেরাই। মানুষ শুরু থেকেই কাজ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বা আল্লাহর জ্ঞানে তাদের কাজের কোনো পূর্বপরিকল্পনা নেই। কাদরিয়্যাদের কথা অগ্নিপূজারিদের কথার মতো। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ রচিত السُّنَّةُ। পৃ. ৮১ দ্রষ্টব্য।

(মদিনা মুনাওয়ারার 'বাদশাহ ফাহাদ কমপ্লেক্সে'র পক্ষ থেকে রচিত أُصُولُ الإيمانِ في ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ কিতাবে [পৃ. ১৫] সাহাবি ও তাবেঈ মুফাসসিরগণের এই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে কিছু লোকের যে ঈমান থাকার কথা বলা হয়েছে, তাহলো রুবুবিয়্যাতের তাওহিদ। আর যে ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, তাহলো উলুহিয়্যাতের তাওহিদ। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহলে এ আয়াতটি আলোচ্য দাবির পক্ষে দলিল হবে না। কারণ, উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা হলো, শিরকে আকবার। আর বলাবাহুল্য, শিরকে আসগার ও ঈমান কারো মধ্যে একত্রিত হতে পারলেও, শিরকে আকবার ও ঈমান কখনো একত্রিত হতে পারে না।-অনুবাদক।)

আরো ইরশাদ করেছেন-

﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾.

বেদুইনরা বলেছে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আপনি বলুন- তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বলো- 'আমরা মুসলমান হয়েছি।' ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ কর, তবে তিনি তোমাদের আমল থেকে কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা হুজুরাত : ১৪]

এখানে কোরআন পাক তাদের ঈমান থাকার কথা অস্বীকার করার পাশাপাশি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাদের বশ্যতা ও আনুগত্য থাকার কথা স্বীকার করেছে। এটি হলো সেই পূর্ণাঙ্গ ঈমান, যা পূর্ণ হলে ঈমান নাম লাভের উপযুক্ত হয়। ইরশাদ হয়েছে-

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾.

ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর (তাতে) সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরাই সত্যবাদী। [সুরা হুজুরাত : ১৫]

সঠিকতর মতানুসারে তারা মুনাফিক নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাদের যে পরিমাণ আনুগত্য রয়েছে, তার ভিত্তিতে তারা মুসলমান। তারা ঈমানদার নয়, যদিও তাদের নিকট এ পরিমাণ ঈমান রয়েছে, যা তাদেরকে কাফেরদের দলভুক্ত করে না।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন– যে ব্যক্তি এ চার কাজ করল বা সেগুলোর অনুরূপ কাজ করল বা সেগুলোর তুলনায় উর্ধ্বের কাজ করল, –তাঁর উদ্দেশ্য হলো- ব্যভিচার, চুরি, মদপান ও ছিনতাই–, সে মুসলমান, তবে আমি তাকে ঈমানদার বলব না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলোর তুলনায় নিম্নমানের কাজ করল –তাঁর উদ্দেশ্য, কবিরা গুনাহের তুলনায় নিম্নমানের– আমি তাকে ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের ঈমানদার বলব। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা বুঝে আসে–

«فَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

যার মধ্যে সেগুলোর কোনো একটি স্বভাব থাকে, তার মধ্যে নিফাকের একটা স্বভাব রয়েছে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন ব্যক্তির মধ্যে নিফাক ও ইসলাম একত্র হতে পারে।

অনুরূপভাবে রিয়া (মানুষকে দেখানোর উদ্দশ্যে আমল করা) একটি আমলি শিরক। অতএব যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করল, তার মধ্যে ইসলাম ও শিরক একত্র হলো।

শাসক যখন আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করেন, অথবা এমন কাজ করেন যাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফরি সাব্যস্ত করেছেন আর

তিনি ইসলাম ও তার বিধিবিধান রক্ষা করে চলেন, তাহলে তার মধ্যে কুফরি ও ইসলাম একত্র হলো।

আমরা পূর্বে বলে এসেছি- সকল গুনাহ কুফরির শাখা, যেমনিভাবে আল্লাহর সকল আনুগত্য ঈমানের শাখা। একজন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের এক বা একাধিক শাখা বিদ্যমান থাকে। আর ঐ শাখার কারণে কখনো তাকে ঈমানদার বলা হয়, আবার কখনো বলা হয় না। (যেমন অভাবীদেরকে দান করা ঈমানের একটি শাখা। এ শাখার কারণে অন্তরের সত্যায়ন থাকলে দানকারীকে 'ঈমানদার' বলা হয়। পক্ষান্তরে অন্তরের সত্যায়ন না থাকলে আপন স্থানে তা ঈমানের শাখা হওয়া সত্ত্বেও এর কারণে দানকারীকে 'ঈমানদার' বলা হয় না। -অনুবাদক।)

যেমনিভাবে কুফরির কোনো এক শাখা বিদ্যমান থাকার কারণে একজনকে কাফের বলা হয়। আবার কখনো কাফের বলা হয় না। (যেমন আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার করা কুফরির একটি শাখা। এ শাখার কারণে ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়, [সুরা মায়িদা-র ৪৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। যদিও তাতে এ বিশ্লেষণ রয়েছে যে, তার কারণে ব্যক্তি কখন ইসলাম ধর্ম থেকেই বের হয়ে যায়, আর কখন বের হয়ে যায় না। আগত 'একটি জরুরি সংযুক্তি' দ্রষ্টব্য।] আবার ঈমানদারকে গালি দেওয়া কুফরির একটি শাখা। কিন্তু গালি দানকারী ব্যক্তির মধ্যে যদি অন্তরের সত্যায়ন বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ শাখার কারণে তাকে কাফের বলা হয় না। -অনুবাদক।)

তাহলে এখানে দু'টি বিষয় হলো- একটি নামসর্বস্ব ও শাব্দিক। অপরটি অর্থগত ও বিধানজনিত। বিধানগত হওয়ার বিবরণ হলো- এ স্বভাবটা কুফরি কি-না? নামসর্বস্ব হওয়ার বিবরণ হলো- এই স্বভাবধারী ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে কি-না? প্রথমটি নিছক শরয়ি বিষয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির আভিধানিক ও শরয়ি- উভয় দিক রয়েছে।

পঞ্চম মূলনীতি : এখানে আরেকটি মূলনীতি রয়েছে। তাহলো- কারো মধ্যে ঈমানের কোনো শাখা বিদ্যমান থাকলে এটা জরুরি হয়ে যায় না যে, তাকে ঈমানদার বলা হবে, যদিও যা বিদ্যমান আছে তা

ঈমান। অনুরূপভাবে কারো মধ্যে কুফরের কোনো শাখা পাওয়া গেলে তাকে কাফের বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে না, যদিও তার মধ্যে যা রয়েছে তা কুফর। যেমনিভাবে কারো মধ্যে ইলমের কোনো অংশ বিদ্যমান থাকলেই সে 'আলেম' নামে ভূষিত হয় না; এবং ফিকহের কিছু মাসআলা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু কথা জানলেই কেউ ফকিহ ও চিকিৎসক হয়ে যায় না। এর অর্থ এই নয় যে, ঈমানের শাখাকে ঈমান বলা হবে না, নিফাকের শাখাকে নিফাক বলা হবে না এবং কুফরির শাখাকে কুফরি বলা হবে না।

কখনো কারো ব্যাপারে ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস–

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ [যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরি করল]; مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ [যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল সে কুফরি করল]; مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ؛ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ [যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে কুফরি করল। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল সে কুফরি করল]। হাকিম তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে হাদিসটি এ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো হারাম কাজ করল, তার ব্যাপারে বলা যাবে, সে একটা ফাসিকি কাজ করল এবং এই হারাম কাজের ভিত্তিতে সে ফাসিক। কারো জন্য ফাসিক শব্দ তখনই আবশ্যক হবে, যখন তার থেকে ফাসিকি কাজ বেশিরভাগ সময় প্রকাশ হয়।

৯৬ নং পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হওয়া الصلاةُ وحُكْمُ تارِكِهَا কিতাবের[১] বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হলো। উক্ত বক্তব্য বিষয়ে আমার একটি জরুরি সংযুক্তি রয়েছে।

১. দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯১ হি. আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, মিশর। পৃ. ২৫-৩১ দ্রষ্টব্য।

একটি জরুরি সংযুক্তি

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর উল্লিখিত বর্ণনার কিছু বাক্য দ্বারা কতক পাঠক 'হাকিমিয়্যাত' [শাসন] বিষয়ে ভ্রান্তিতে পড়তে পারেন। কেননা তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য বিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনাকে এমন কুফরি আখ্যা দিয়েছেন, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যেন সম্ভাব্য সকল অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।

ইসলামি সমাজ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে আল্লাহর শরিয়ত অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে আসছে। তাঁর সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণ এ নীতিতেই চলেছেন। তাঁদের পর উমাইয়া খলিফাগণও অভিন্ন নীতিতে শাসন পরিচালনা করেছেন। তাঁদের থেকে কিছু বিচ্যুতি প্রকাশ পেলেও আল্লাহর শরিয়তের নিকটই মানুষ বিচার প্রার্থনা করত। শরিয়ত নিজ পতাকাতলে তাদেরকে আশ্রয় দিত এবং প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের দেখাশুনা করত। তারপর এসেছে আব্বাসি শাসন। বড় ধরনের কিছু বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শরিয়তই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা। তারপর আবির্ভাব হয়েছে তাতারিদের। হালাকু খান [১২১৮-১২৬৫ খ্রি.] তাদের জন্য 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান প্রণয়ন করল। সামনে উপযুক্ত স্থানে এ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করা হবে। (১৬৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক।)

এ পরিস্থিতিতে ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য পূর্বসূরি আলেমগণের বক্তব্যে ভ্রান্তির কিছু নেই। কেননা বিচারক যখন ঘুষগ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, কারো অন্যায় সুপারিশ ইত্যাদি কোনো কারণে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা বিচার না করেন, তখন সে শরয়ি অর্থে কাফের হয়ে যায় না।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে পরবর্তীতে এক বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাহলো- তারা শাসনব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহর শরিয়তকে বর্জন করেছে। শরিয়তকে পশ্চাদ্‌গামিতা ও পশ্চাৎপদতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এবং সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নশীল যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার যোগ্যতা না থাকার দায়ে দায়ী করেছে। এটি মুসলমানদের জীবনে এক অভিনব ধর্মত্যাগ। কারণ, বিষয়টি অসার দোষারোপ ও ভিত্তিহীন অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং শরিয়তকে জীবনের বাস্তবতা থেকে কার্যত অপসারণ করা পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইসলামি শরিয়ত বর্জন করে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ফরাসি বা ব্রিটিশ বা আমেরিকান বা ধর্মদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি জাহিলি ও কুফরি আইন। (উদাহরণস্বরূপ ২০১১ সালের ৩০ শে জুন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।[১] -অনুবাদক।)

শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামি শরিয়ত বর্জন করে অন্য আইন গ্রহণ করা দ্বারা ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়- এ দাবির পক্ষে আমার নিকট অনেকগুলো দলিল আছে। কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. পূর্বের বর্ণনায় স্বয়ং ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর উক্তি উল্লেখ করেছেন- [পৃ. ১১২] 'অবশ্য তা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যার (কারণে ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়ার) ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।'

হ্যাঁ, বিষয়টি এমন স্তরেই পৌঁছে গেছে। কেননা শরিয়তকে শাসনব্যবস্থা থেকে অপসারণ করা, ত্রুটি ও ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা, প্রচলিত আইনকে তার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান করা এবং যুগের উন্নয়নের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে পারার ক্ষেত্রে শরিয়তের তুলনায় প্রচলিত আইন কোমল হওয়ার দাবি করা- সুস্পষ্ট কুফরি।

---

১. এখানে একটি চিন্তনীয় দিক হলো, 'আল্লাহর উপর ঈমান'কে যারা বিলুপ্ত করেছে এবং পরবর্তীতে যারা এ বিলুপ্তিকে গ্রহণ করে চলছে, তা তাদের থেকে প্রকাশিত 'কুফরে বাওয়াহ' [প্রকাশ্য কুফরি] কি-না।

২. 'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দ্বারা বিচার করা ছোট কুফরি'- এ কথা স্বয়ং ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ঐ শাসকের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলেছেন (পৃ. ১১৫-১১৬), যিনি ইসলাম ও তার বিধিবিধান রক্ষা করে চলেন। তো এমন শাসক যখন কোরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করে বা তা থেকে বিচ্যুত হয়, তার ব্যাপারে উল্লিখিত উক্তি প্রযোজ্য হবে। ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যে আল্লাহর শরিয়তকে অপসারণ করে প্রচলিত আইনকে শাসনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে।

৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে- বৈধ সাব্যস্ত করা, অবৈধ সাব্যস্ত করা, আইনপ্রণয়ন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহর একক বৈশিষ্ট্য। অতএব যে ব্যক্তি সেগুলো নিজের জন্য দাবি করল, সে নিজকে ইলাহ বানাল এবং আল্লাহর এমন সমকক্ষ স্থির করল আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। অচিরেই এর ব্যাখ্যা আসবে।

(হাদিসে এসেছে- হজরত আদি ইবনে হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত পড়তে শুনলেন- [অর্থ :] 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।' আদি বললেন- তারা তাদের ইবাদত করেনি। রাসুল বললেন- অবশ্যই করেছে। আলেম ও আবেদরা তাদের জন্য কিছু বৈধ বিষয় অবৈধ করেছে এবং কিছু অবৈধ বিষয় বৈধ করেছে, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এটিই এদের পক্ষ থেকে ওদের ইবাদত করা।[২] -অনুবাদক।)

৪. আল্লাহর শরিয়তকে শাসনব্যবস্থা থেকে সরিয়ে মানবরচিত আইনকে তার স্থলবর্তী করা সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার কর্তাকে অতীত ও বর্তমান সকল যুগের আলেমগণ কাফের সাব্যস্ত করেছেন। কেননা শরিয়তকে আইনরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি 'জরুরিয়াতে দীনে'র অন্তর্ভুক্ত।

২. সুনানুত তিরমিজি ৮ : ২৪৮। হাদিস নং ৩০৯৮

('জরুরিয়াতে দীন' [দীনের সর্বজনবিদিত বিষয়] ইসলামের ঐ সকল আকিদা ও আহকামকে বলা হয়, যেগুলো 'তাওয়াতুরে'র মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে এবং যেগুলো ইসলামের অংশ হওয়া সকল মুসলমানের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অন্য ভাষায়- যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। কেউ যদি সেগুলো অস্বীকার করে, সে যেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করল এবং তাঁর নবুয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এ কারণেই সেগুলো অস্বীকার করা, ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়ার একটি কারণ হিসেবে গণ্য হয়। -অনুবাদক।)

এ ব্যাপারে বিবাদ করা কার পক্ষে সম্ভব! যখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾.

জেনে রাখ! সৃষ্টি করা ও হুকুম দেওয়া তাঁরই এখতিয়ারে। [সুরা আরাফ : ৫৪]

মুমিন-কাফের সকলের স্বীকৃতি অনুসারে যখন আল্লাহ তাআলাই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, এমতাবস্থায় তিনিই তো আদেশ, ক্ষমতা, শাসন ও কর্তৃত্বের মালিক হওয়ার কথা! [তাফসিরে ইবনে কাসিরে ও 'ফি জিলালিল কোরআন' কিতাবে এ আয়াতের তাফসির দেখুন।]

৫. মহান মনীষী শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আ-লুশ শায়খ রাহিমাহুল্লাহ [১৩১১-১৩৮৯ হি.] ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর উপরোল্লেখিত উক্তির [পৃ. ১১২] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন-

হজরত জিবরাঈল আলাহিস সালাম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে যা অবতীর্ণ করেছেন, তার স্থলে অভিশপ্ত আইনকে প্রতিস্থাপন করা সুস্পষ্ট বড় কুফরি।[১]

---

১. تحكيمُ القوانِينِ الوَضْعِيَّةِ পৃ. ১, মুদ্রণ : ১৩৮০ হিজরি, প্রকাশনায় : মক্কাস্থ মাতাবিউস সাকাফাতি।

৬. হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ مَدَارِجُ السَالِكِيْنَ গ্রন্থে শাসন বিষয়ে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন–

সঠিক কথা হলো, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার করা কখনো হয় ছোট কুফরি, আবার কখনো হয় বড় কুফরি। তা নির্ভর করে বিচারকের অবস্থার উপর।

বিচারক যদি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে বিচার করা জরুরি হওয়ার আকিদা পোষণ করে, তারপর অবাধ্যতাবশত তা পরিত্যাগ করে এবং এর কারণে সে শাস্তির উপযুক্ত– এই স্বীকৃতি তার থাকে, তাহলে তা ছোট কুফরি।

পক্ষান্তরে যদি মনে করে, আল্লাহর নাজিলকৃত হুকুম অনুসারে ফায়সালা করা তার জন্য জরুরি নয়, বরং এ ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে, অথচ সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, তা আল্লাহর হুকুম, তাহলে তা বড় কুফরি। আর যদি তার অজ্ঞতা থাকে এবং সে ভুল করে থাকে, তাহলে সে ভুলকারী। তখন তার ব্যাপারে ভুলকারীদের বিধান প্রযোজ্য হবে।[২]

(বিভিন্ন দেশের শাসকদের ব্যাপারে অনেক বন্ধু অজ্ঞতার ওজর পেশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন করেছে, তারা কি জানে না, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন করার জন্য কোন্ আকিদা তারা রহিত করেছে? তারা কি এ বিষয়ে অজ্ঞ? তাছাড়া ইসলামি দলগুলো যখন –তাদের কর্মপদ্ধতি সঠিক হোক বা না হোক– দেশে শরয়ি আইন চালু করার জন্য শাসকদের নিকট যুগ যুগ ধরে দাবি উত্থাপন করছে, আর শাসকরা তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করছে, এমতাবস্থায় শাসকরা কী প্রত্যাখ্যান করছে, তা তাদের না জানার দাবি করা গ্রহণযোগ্য কি-না, বিবেকবানদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

২. مَدَارِجُ السَالِكِيْنَ খ. ১ পৃ. ৩৩৭

প্রসঙ্গত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহ [১২৯২-১৩৫২ হি.] লিখেছেন-

যে ব্যক্তি মনে করে, 'তার অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে এবং হৃদয়কে সন্তুষ্ট করাতে হবে, এরপর যদি সে হটকারিতা প্রদর্শন করে, তাহলে কাফের হবে, অন্যথায় নয়।' এই লোক মূলত দীনের কোনো বাস্তবতাই অবশিষ্ট রাখেনি। সে দীনকে কল্পনাপ্রসূত বানিয়েছে। এটা নিশ্চিত একটা অসার দাবি।[১] -অনুবাদক।)

৭. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ مِنْهَاجُ السُّنَّةِ কিতাবে লিখেন-

আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিচার করা জরুরি হওয়ার আকিদা যার নেই, সে নিঃসন্দেহে কাফের। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার না করে নিজে যা ন্যায়বিচার মনে করে সে অনুপাতে বিচার করাকে বৈধ মনে করে, সে কাফের।

বস্তুত প্রত্যেক জাতিই ন্যায়বিচার করার আদেশ করে। কিন্তু কখনো কখনো তাদের ধর্মের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড হয় তাদের বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি। বরং মুসলমান নামধারী অনেক লোকও নিজেদের আদত-অভ্যাসের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করে। তা আল্লাহর নাজিলকৃত হুকুম কি-না, সে দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। যেমন গ্রাম্য লোকদের রীতিনীতি দ্বারা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা বিচার করে। তারাই সেখানকার মান্যবর ব্যক্তিবর্গ। তারা মনে করে- কোরআন-সুন্নাহের পরিবর্তে এ অনুসারেই বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটাই কুফরি।

কেননা অনেক লোক মুসলমান হওয়ার পরও তাদের মান্যবর লোকদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রচলিত মনগড়া রীতিনীতি অনুসারে বিচার করে। তো এই লোকগুলো যখন জানবে-

১. إكفارُ المُلْحِدِينَ পৃ. ১২৮

আল্লাহর নাজিলকৃত হুকুম ব্যতীত অন্য হুকুম দ্বারা ফায়সালা করা জায়েজ নয়, তারপর তা অমান্য করবে, উপরন্তু আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিপরীত হুকুম দ্বারা ফায়সালা করাকে জায়েজ মনে করবে, তাহলে তারা কাফের।[২]

৮. চিরস্থায়ী জাহান্নামি কাফেরদের ভাষায় কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে-

﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾.

আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে, যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম। [সুরা শুআরা : ৯৭-৯৮]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসিরে লিখেন-

এই 'সমকক্ষ সাব্যস্ত করা' ছিল তাদেরকে ভালোবাসা, তাদেরকে মান্যবররূপে গ্রহণ ও তাদের প্রণীত বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে। সৃষ্টি, ক্ষমতা ও প্রতিপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করেনি। কাফেরদের উল্লিখিত সমকক্ষ স্থিরকরণের সংবাদই আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন-

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ﴾.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। তবু কাফেররা তাদের প্রভুর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। [সুরা আনআম : ১]

সঠিকতর উক্তি অনুসারে ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ-এর অর্থ হলো- কাফেররা তাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে- তারা যেভাবে

২. مجموعةُ التوحيدِ দ্বাদশ পুস্তিকা, পৃ. ২৭৮, দারুল ফিকর সংস্করণ।

আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর আদেশকে সম্মান করে, সেভাবেই নিজেদের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সমকক্ষদেরকে ভালোবাসে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাদের আনুগত্য করে। তারা নিজেদের উপাস্যদেরকে কর্ম ও গুণাবলিতে আল্লাহর সমস্তরের মনে করত না। আল্লাহ ও অন্যান্য উপাস্যদের মধ্যে তাদের সমকক্ষতা সাব্যস্তকরণের দিক ছিল- ভালোবাসা, আনুগত্য ও সম্মানপ্রদর্শন। এসব ক্ষেত্রেও তারা আল্লাহর ও তাদের মধ্যে পার্থক্য করত। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের সংশোধন বলতে এই সংশোধনকেই বোঝানো হয়।[১]

(কারো মনে একটি প্রশ্ন দানা বাধতে পারে- স্বেচ্ছায় মুসলমান নামধারী শাসক ও বিচারকগণ যা-ই করুক, মনে মনে ইসলামকে তো আর অবিশ্বাস করে না। সুতরাং আল্লাহর শরিয়তকে শাসনব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত এ শরিয়তের সত্যতার বিশ্বাস কারো অন্তরে বিদ্যমান থাকবে, তার তো কাফের হওয়ার কথা নয়। আকিদার কুফরির প্রকারভেদের নিম্নের আলোচনায় এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। -অনুবাদক।)

---

১. التفسيرُ القَيِّمُ পৃ. ৩৯৬

কুফর, শিরক, নিফাক ও ইরতিদাদ

কুফরির প্রকারভেদ

আলেমগণ আকিদার কুফরিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ-[২]

১. **মিথ্যুক মনে করার কুফরি :** তা হলো মন থেকে রাসুলকে মিথ্যুক মনে করা।

পৃথিবীতে এ প্রকারের কাফের খুবই কম। কারণ, আল্লাহ তাআলা রাসুলগণকে তাঁদের সত্যবাদিতার পক্ষে এতো অধিক পরিমাণ দলিল-প্রমাণ প্রদান করেছেন যে, সেগুলো দ্বারা তাঁদের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয় এবং ওজর ও অজুহাত পেশ করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। দেখুন- ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾.

তারা অন্যায় ও অহংকারবশত সেগুলো [মুসা আ.-এর দেখানো নিদর্শনগুলো] প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ তাদের অন্তর সেগুলো বিশ্বাস করেছে। [সুরা নাম্‌ল : ১৪]

(আয়াতটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়- হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সত্যতার ব্যাপারে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের অন্তরের বিশ্বাস ছিল। অতএব শুধু অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা কেউ ঈমানদার হয়ে যায় না। -অনুবাদক।)

---

২. প্রকারগুলো আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ مَدَارِجُ السَالِكِينَ কিতাবে (১ : ৩৩৭-৩৩৮) উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন–

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

আসলে তারা আপনাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে না। কিন্তু জালেমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। [সুরা আনআম : ৩৩]

(এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ দীনকে প্রত্যাখ্যান করলে কাফের হয়ে যায়, অন্তরে তা সত্য বলে বিশ্বাস করলেও। -অনুবাদক।)

২. **ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ও অহংকারজনিত কুফরি :** যেমন ইবলিসের কুফরি।

যারা রাসুলকে চিনেছে, কিন্তু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ও অহংকারবশত তাঁর আনুগত্য বর্জন করে থেকেছে, তারা এ প্রকারের কাফের। নবি-রাসুলগণের অধিকাংশ শত্রুর কুফরির প্রকার ছিল এ প্রকারই। আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এই ভাষায়–

﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾.

তখন তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের সেবাদাস! [সুরা মুমিনুন : ৪৭]

আবু তালেবের কুফরি এমনই ছিল। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। রাসুলের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অহমিকা ও পূর্বপুরুষদের সম্মানবোধের কারণে তাদের ভ্রান্ত ধর্ম ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(ইলমের অনেক মারকাজের কর্ণধারদের মধ্যেও বর্তমানে আবু তালিবি এ চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত দেখা যায়। অতএব সাবধান! উস্তাদ, শায়খ বা মাদারে ইলমির অহমিকা ও অগ্রহণযোগ্য শ্রদ্ধা কাউকে যেন অশুভ পরিণতির দিকে না নিয়ে যায়। আল্লাহ পানাহ! -অনুবাদক।)

৩. **বিমুখ থাকাজনিত কুফরি :** এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তি, যে রাসুলের ব্যাপারে নিরুৎসাহী থাকে- রাসুলের বক্তব্য শ্রবণ করে না। তাঁকে সত্যবাদীও বলে না, মিথ্যাবাদীও মনে করে না। তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কও রাখে না এবং শত্রুতাও করে না। তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন, তার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। যেমন তায়েফের সাকিফ গোত্রের এক নেতা আবদু ইয়ালিল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল[১]-

'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে একটি কথা বলছি- তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তুমি আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে মহিমান্বিত যে, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আমি তোমার মতো তুচ্ছতর মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' [নাউজুবিল্লাহ!]

[শায়খ মুহাম্মদ হামেদ ফেকি রাহিমাহুল্লাহ (১৮৯২-১৯৫৯ খ্রি.) এ উক্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন-

এটা হলো বর্তমানের ঐ সকল ধর্মত্যাগীদের কুফরি, যারা ইসলামি নাম ধারণ করে এবং ইহুদি-খ্রিস্টান প্রভৃতি ইউরোপীয়দের অনুসরণ করে। তারা প্রত্যেক সৎচরিত্র ও সৎগুণের বাধন থেকে মুক্ত থাকে এবং নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে একে উন্নতি ও সভ্যতার প্রতীক মনে করে।[২]]

---

১. এখানে আরবি কিতাবের ইবারতে রয়েছে- كَمَا قَالَ أَحَدُ بَنِيْ عَبْدِ يالِيْلَ- বলাবাহুল্য, এই ইবারতের অর্থ হয়- 'যেমন আবদু ইয়ালিল গোত্রের একজন বলেছে।' এর দ্বারা অনুমিত হয়, লোকটা আবদু ইয়ালিল ছিল না। বরং আবদু ইয়ালিল নামক গোত্রের একজন ছিল। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। বাস্তবতা হলো, আবদু ইয়ালিলই ছিল ঐ মালাউনের নাম। আর সে ছিল তায়েফের সাকিফ গোত্রের একজন নেতা। যারা বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয় তাদের কেউ মূল কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উল্লিখিত অনুবাদকে ভুল মনে করতে পারে। তাই এ সতর্কীকরণ। -অনুবাদক।

২. مَدَارِجُ السالِكِيْنَ খ. ১ পৃ. ২২৮-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. **সন্দেহজনিত কুফরি :** তা হলো, রাসুলকে নিশ্চিতভাবে সত্যবাদিও না জানা এবং মিথ্যাবাদিও না জানা। বরং তাঁর ব্যাপারে সন্দিহান থাকা।

এ সন্দেহ স্থায়ী থাকে না। অবশ্য কেউ যদি রাসুলের সত্যবাদিতার নিদর্শনসমূহ থেকে বিমুখ থাকাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়, তার অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু যারা প্রমাণ ও নিদর্শনগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, তাদের কোনো সন্দেহ বাকি থাকবে না। কেননা সেগুলো দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

৫. **নিফাকজনিত কুফরি :** তা হলো মনে কুফরি গোপন রেখে মুখে ঈমান প্রকাশ করা। এটা হলো বড় নিফাক।

(শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

'এই নিফাকের ধরন হলো- (নিজের মুসলমান হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও) রাসুলকে মিথ্যুক মনে করা বা তাঁর আনীত কতক জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাঁর অনুসরণ জরুরি হওয়ার বিশ্বাস না রাখা বা কোথাও তাঁর ধর্মের প্রভাব দুর্বল হওয়াতে আনন্দিত হওয়া বা সবল হওয়াতে কষ্ট পাওয়া- এককথায় এমন কিছু অবস্থা, যা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদেরই হয়ে থাকে।'[১] -অনুবাদক।)

শিরকের প্রকারভেদ

বড় ও ছোট উভয় প্রকারের কুফরি স্পষ্ট করার পর -আল্লাহর নিকট আমরা তা থেকে আশ্রয় চাই- এখন শিরকের বিবরণ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকেও আশ্রয় দান করুন! ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর পূর্বের বর্ণনায়, শিরক দুই প্রকারে বিভক্ত হওয়ার আলোচনা এসেছে- **এক.** বড় শিরক। তা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। **দুই.** ছোট শিরক। তা হলো রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা।

---

১. الفَتَاوَى খ. ২৮ পৃ. ৪৩৪

বড় শিরকের দলিল আল্লাহ তাআলার এই বাণী-

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের [গোনাহ] -যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করল, সে ভয়াবহ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হলো। [সুরা নিসা : ১১৬]

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ শিরককে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন-[২]

১. **দুআর শিরক।** দুআর মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করা। আল্লাহর নিকট যেমন চাওয়া হয়, তদ্রূপ গায়রুল্লাহর নিকটও চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

যখন তারা নৌযানে আরোহন করে [এবং বিপদের সম্মুখীন হয়] আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকতে থাকে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা শিরক করতে শুরু করে। [সুরা আনকাবুত : ৬৫]

২. **নিয়ত, ইচ্ছা ও অভিলাষের শিরক।** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

---

২. مجموعة التوحيد পৃ. ৩

যারা [শুধু] পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করবে, আমি দুনিয়াতে তাদেরকে তাদের আমল [আমলের প্রতিফল] পুরোপুরি দিয়ে দেব এবং এখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। ওরাই তারা যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছে তা বরবাদ হয়ে যাবে এবং যে [নেক] আমল তারা করত তা নিষ্ফল হয়ে যাবে। [সুরা হুদ : ১৫-১৬]

৩. **আনুগত্যের শিরক**। ইরশাদ হয়েছে-

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

তারা [ইহুদি ও খ্রিস্টানরা] আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [সুরা তাওবা : ৩১]

হাদিসে এসেছে- হজরত আদি ইবনে হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত পড়তে শুনলেন- [অর্থ :] 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে', আদি বললেন- তারা তাদের ইবাদত করেনি। রাসুল বললেন- অবশ্যই করেছে। আলেম ও আবেদরা তাদের জন্য কিছু বৈধ বিষয় অবৈধ করেছে এবং কিছু অবৈধ বিষয় বৈধ করেছে, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এটিই এদের পক্ষ থেকে ওদের ইবাদত করা।[১]

হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামান [মৃ. ৩৬ হি.] ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস প্রমুখ সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন-

তারা [আলেম ও আবেদরা] যা বৈধ ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, তারা [সাধারণ লোকেরা] তাতে তাদের অনুসরণ করেছে।

---

১. হাদিসটি ইমাম তিরমিজি كتابُ التفسيرِ-এ উল্লেখ করেছেন ৮ : ২৪৮। হাদিস নং ৩০৯৪। তাহকিক : الدعاس- তিরমিজি বলেছেন- هـذا حـديثٌ غَرِيـب- হাদিসটি ইবনে কাসির এ আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেছেন [৪ : ৭৭] এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনে জারিরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। আলবানি বলেছেন- حديثٌ حَسَنٌ, দেখুন غَايَةُ المَرَامِ في تخريجِ الحلالِ والحرامِ পৃ. ২০

৪. **ভালোবাসার শিরক।** ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾.

আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে [তাঁর] এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। [সুরা বাকারা : ১৬৫]

নিফাকের প্রকারভেদ

নিফাকও দু'ভাগে বিভক্ত– **এক.** বড় নিফাক। তা আকিদার নিফাক। তা ব্যক্তিকে ধর্ম থেকে বের করে দেয়। **দুই.** ছোট নিফাক। তা হলো- আমলের নিফাক তথা রিয়া। আকিদার নিফাক সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

'নিফাকের একটি প্রকার হলো বড় নিফাক, যাতে লিপ্ত ব্যক্তির ঠিকানা জাহান্নামের নিম্নতর স্তর। যেমন আবদুল্লাহ বিন উবাই প্রমুখের নিফাক। এই নিফাকের ধরন হলো- (নিজের মুসলমান হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও) রাসুলকে মিথ্যুক মনে করা বা তাঁর আনীত কতক জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাঁর অনুসরণ জরুরি হওয়ার বিশ্বাস না রাখা বা কোথাও তাঁর ধর্মের প্রভাব দুর্বল হওয়াতে আনন্দিত হওয়া বা সবল হওয়াতে কষ্ট পাওয়া– এককথায় এমন কিছু অবস্থা, যা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদেরই হয়ে থাকে।'[২]

ইরতিদাদ

ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ হলো ঈমান আনয়নের পর কুফরি করার নাম। যে ব্যক্তি কুফরি কথা বলল বা কুফরি কাজ করল বা কুফরি কথা বা কাজে ইচ্ছাপূর্বক সন্তুষ্ট হলো, সে মুরতাদ হয়ে গেল; যদিও সে মন থেকে তা ঘৃণা করে। আলেমগণ এমনটিই বলেছেন। তাঁরা লিখেছেন– মুরতাদ সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণের পর উক্তি বা কর্ম বা বিশ্বাসগত কুফরি করে।

---

২. الفَتَاوَى খ. ২৮ পৃ. ৪৩৪

তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো- যে ব্যক্তি কুফরি কথা বলবে, সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও কথাটি তার আকিদা না হয় এবং সে তা অনুযায়ী আমল না করে। অবশ্য কেউ যদি কুফরি কথা বলতে বাধ্য হয়, তাহলে কাফের হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুফরি কাজ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে এরূপ আকিদা পোষণ না করে এবং এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ না করে। ঐ ব্যক্তিও মুরতাদ, যার অন্তর কুফরিকে গ্রহণ করে নিয়েছে, যদিও সে মুখে কোনো কুফরি কথা উচ্চারণ করেনি এবং কোনো কুফরি কাজ করেনি।

এ বিশ্লেষণ ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবে থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ইলমের সাথে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, সে এগুলোর সন্ধান অবশ্যই পেয়ে থাকবে।[১]

(যেসকল বিষয় দ্বারা ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হয় الفِقْهُ المُيَسَّرُ فِي ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ কিতাবের ৩৭১ নং পৃষ্ঠায় সেগুলোকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কিতাবটি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত 'বাদশা ফাহাদ কমপ্লেক্সে'র পক্ষ থেকে রচিত।

ইরতিদাদের প্রকারভেদ

১. **উক্তি :** যেমন- আল্লাহ তাআলা বা রাসুল বা ফেরেশতাদেরকে গালি দেওয়া। অথবা নবুয়তের দাবি করা। অথবা গায়বের ইলম থাকার দাবি করা। অথবা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা।

---

১. শায়খ হামদ বিন আতিক রাহিমাহুল্লাহ [১২২৭-১৩০১ হি.] রচিত الدِّفَاعُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ والاِتِّبَاعِ পৃ. ২৮। আরো দেখুন আবদুল কাদির আওদাহ রাহিমাহুল্লাহ [১৯০৬-১৯৫৪ খ্রি.] রচিত التشريعُ الجِنَائِيُّ الإسلاميُّ مُقَارَنًا بِالقانونِ الوَضْعِيِّ খ. ২ পৃ. ৭০৮ এবং ডক্টর মুহাম্মদ কাজিম হাবিব হালাবি রাহিমাহুল্লাহ [১৯৩৩-২০১৩ খ্রি.] রচিত الرِّدَّةُ بَيْنَ الأَمْسِ والحاضِرِ পৃ. ৩৩

২. **কর্ম :** যেমন- মূর্তি, কবর প্রভৃতির সিজদা করা। অথবা কোরআন পাকের কোনো কপি ফেলে দেওয়া। অথবা ইচ্ছাপূর্বক তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করা। অথবা কাফেরদেরকে সমর্থন করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা।

৩. **বিশ্বাস :** যেমন- আল্লাহ তাআলার শরিক বা স্ত্রী বা সন্তান থাকার আকিদা পোষণ করা। অথবা ব্যভিচার বা মদকে বৈধ মনে করা। অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো দিকনির্দেশনাকে রাসুলের দিকনির্দেশনার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ মনে করা।

৪. **সন্দেহ :** যেমন- যে জিনিস হালাল হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে, তা হারাম হওয়ার সন্দেহ করা। অথবা যে জিনিস হারাম হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে উম্মত একমত, তা হালাল হওয়ার সন্দেহ করা। আর বিষয়টি এমন যে, মুসলিম সমাজে বসবাস করার কারণে তার মতো লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কথা নয়।

বি. দ্র. ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ সাব্যস্তকারী কোনো উক্তি বা কর্ম যদি কেউ 'বাধ্য হয়ে' করে, তাহলে তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলা হবে না।

'বাধ্য হওয়া' শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত

আমাদের এক দোস্ত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানের কিছু কুফরি মূলনীতি সম্পর্কে বললেন- দেখতে হবে, কর্তৃপক্ষ জাতিসংঙ্ঘ বা বাইরের অন্য কারো চাপের মুখে পড়ে নীতিগুলো নির্ধারণ করেছে কি-না। এটাও দেখতে হবে যে, কাজটা তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে করেছে কি-না এবং কুফরিটা মন থেকে গ্রহণ করেছে কি-না। উল্লেখ্য, 'মনে কুফরি না থাকলেও কুফরি উক্তি ও কুফরি কর্মের কারণে মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়, যদি সে কুফরিটা বাধ্য না হয়ে করে থাকে'- এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

তাই এখন অনিবার্যরূপে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছে- কারো সম্পর্কে যদি বলা হয়- তিনি অমুক কাজটা 'বাধ্য হয়ে' করেছেন,

তাহলে করণীয় কী? হ্যাঁ, করণীয় হলো- দেখতে হবে, তিনি শরয়ি অর্থে 'বাধ্য' ছিলেন কি-না। নিজের কল্পনাপ্রসূত অর্থে 'বাধ্য' হলে শরিয়তে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। কুফরি কথা বলার জন্য বা কুফরি কাজ করার জন্য কেউ যদি শরয়ি অর্থে 'বাধ্য' হয়, সে তখনই শুধু মুরতাদ হয় না। শরয়ি অর্থে 'বাধ্য' সাব্যস্ত না হলে মুরতাদ হয়ে যায়। শরয়ি পরিভাষায় এভাবে 'বাধ্য করা'কে 'ইকরাহ' বলা হয়। শরিয়তে 'ইকরাহ' কখন প্রমাণিত হয়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। নিম্নে দুটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক–

এক. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ [৭৭৩-৮৫২ হি.] فَتْحُ الْبَارِيْ কিতাবের কিতাবুল ইকরাহ-তে লিখেছেন–

ইকরাহের অধ্যায়- ইকরাহ্ [বাধ্য করা] বলা হয় অন্যের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া, যা সে চাচ্ছে না। ইকরাহ্ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত চারটি–

১. মুকরিহ্ [বাধ্যকারী] যার হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া এবং মুকরাহ্ [বাধ্য ব্যক্তি] তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া, চাই তা পলায়ন করার মাধ্যমেই হোক না কেন।

২. মুকরাহের [বাধ্য ব্যক্তির] প্রবল ধারণা হওয়া যে, যদি সে কাজটি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে মুকরিহ্ তার প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন করবে।

৩. যার হুমকি দিচ্ছে তা তাৎক্ষণিক হতে হবে। যদি এমন বলে- তুমি যদি এ কাজটি না কর, তাহলে তোমাকে আগামীকাল প্রহার করব, তা ইকরাহ্ [বাধ্য করা] হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তবে ইকরাহ হিসেবে ধর্তব্য হবে যদি খুবই নিকটবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে বা সকলেই জানে- সে যা বলে তা করেই ছাড়ে।

৪. আদিষ্ট ব্যক্তির অন্যায় কাজটি স্বেচ্ছায় করার কোনো প্রমাণ না থাকতে হবে। যেমন- কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলো। ফলে সে একান্ত নিরুপায় হয়ে প্রবেশ করাল। তারপর বের করে ফেলার তার সুযোগ ছিল।

কিন্তু সে মনে মনে ভাবল, বীর্যস্খলন হয়ে গেল কি-না। এটি ভাবতে ভাবতে বীর্যস্খলন পর্যন্ত বিলম্ব করে ফেলল। তাহলে সে মুকরাহ্ [বাধ্য] সাব্যস্ত হবে না।[১]

দুই. হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা ফখরুদ্দিন জাইলায়ি [মৃ. ৭৪৩ হি.] রাহিমাহুল্লাহ تَبْيِينُ الحقائِق কিতাবে লিখেছেন-

ইকরাহ্ [চাপ প্রয়োগ] দু' প্রকার- ১. বাধ্যকারী। ২. বাধ্যকারী নয়। বাধ্যকারী হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইকরাহ্ [চাপ প্রয়োগ]। আর তা হচ্ছে এমন শাস্তি দিয়ে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করা, যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানির আশঙ্কাবোধ করে। এমতাবস্থায় অন্যায় কাজটি করার প্রতি তার সন্তুষ্টি থাকে না। কাজটি করতে তার বাধ্য হওয়া প্রমাণিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে 'বাধ্যকারী নয়' হলো স্বল্পমাত্রার ইকরাহ্। তা হলো, এমন শাস্তি দিয়ে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করা, যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানির আশঙ্কাবোধ করে না। যেমন- কঠিন প্রহার, বন্দিকরণ ও গ্রেফতারের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা। কেননা এতে কাজটি করার প্রতি যদিও তার সন্তুষ্টি থাকে না, কিন্তু কাজটি করতে তার বাধ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না এবং তার ইচ্ছাশক্তিও বাতিল হয় না।[২]

অর্থাৎ শরিয়তে ইকরাহ সাব্যস্ত হয় 'বাধ্যকারী চাপ প্রয়োগ' তথা এমন চাপ প্রয়োগ দ্বারা যাতে বাস্তবিক অর্থেই ব্যক্তির আর কিছু করার থাকে না সে একান্তই বাধ্য হয়ে যায়। 'বাধ্যকারী নয় এমন চাপ প্রয়োগ' দ্বারা ইকরাহ্ সাব্যস্ত হয় না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটি পাঠ করার পর আমরা ভেবে দেখি- আমাদের উল্লিখিত দোস্ত যাদের সম্পর্কে বলেছেন- 'তারা কুফরি নীতিগুলো নির্ধারণ করেছে **বাধ্য হয়ে**,' শরিয়তের নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে তাদের 'বাধ্য ও অপারগ হওয়া' প্রমাণিত হয় কি-না।

---

১. فَتْحُ الباري খ. ১৬ পৃ. ২১১-২১২। দারু তায়বা সংস্করণ।

২. تبيينُ الحقائِق খ. ৫ পৃ. ১৮১

বিষয়টি শুধু আলোচ্য সংবিধানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা সাধারণ লোকেরাও অনেক সময় 'হেকমতের দাবি' নাম দিয়ে শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কাজ করে ফেলি আর বলি- কাজটা করতে আমরা বাধ্য ছিলাম, অমুক ও তমুকের চাপে এমনটা করেছি। আমাদেরও আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে একান্তে চিন্তা করা জরুরি যে, এ উত্তর আখেরাতে আল্লাহর আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে কি-না!

এ পর্যায়ে একজন লেখকের দু'টি কথা উল্লেখ করে এখানকার আলোচনা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। তাতে আশা করা যায়, ইকরাহের বিষয়টি অধিক পরিষ্কার হবে এবং ঈমান হেফাজত করা আমাদের জন্য সহজ হবে। নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন! আমিন!!

﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾.

তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সঙ্গে প্রতারণা করে। বস্তুত তারা নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণা করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। [সুরা বাকারা : ৯]

উক্ত লেখকের কথা দুটি হলো-

ইকরাহের একটি অত্যাশ্চর্য চিত্র

এক. পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য ইকরাহের চিত্র হলো- ইকরাহের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে নিজের ও অন্যের জান-মাল, মেধা-সময়, ইজ্জত-আবরু প্রভৃতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা হয়। মুকরাহ [অপারগ]দের দুআ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এ ভাষায়- رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا [হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী]। আর আজ যাদের ব্যাপারে আমরা মুকরাহ হওয়ার দাবি করছি, তাদের অবস্থাদৃষ্টে দুআ হচ্ছে- رَبَّنَا ثَبِّتْنَا عَلَى هٰذِهِ الرُّتْبَةِ الْمُكْرَهِ أَهْلُهَا [হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই পদে অবিচলতা দান করুন যার অধিকারীরা বাধ্য।]।

একজন লোক শুধু ১০০% নয় বরং ২০০% নিশ্চিত, অমুক স্থানে গেলে 'চাপ প্রয়োগে'র শিকার হয়ে তাকে কুফরিতে লিপ্ত হতে হবে। তবুও স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দে লোকটি সেখানে যাওয়ার পর 'চাপ প্রয়োগে'র শিকার হলে, উক্ত 'চাপ প্রয়োগ' ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথাই কি আমাদের বিবেক বলে?

এই 'চাপ প্রয়োগে'র দাবির দৃশ্যটি এরকম– একজন লোক স্বেচ্ছায় গলায় রশি পেঁচিয়ে গাছে ঝুলে পড়েছে। নিচ থেকে এক পথিক আফসোস করে বলল, হায়! লোকটি আত্মহত্যার মতো একটি জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে! পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে কথা বলা উচিত। পাপ হবে কেন? তার প্রাণ নিচ্ছে ঐ রশিটা, সে তো এখন অপারগ!

বাঁচাতে চাই, না বাঁচতে চাই?

দুই. তাদের কোনো আচরণ-উচ্চারণে কি বুঝা যায় যে, তারা إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ-এর অন্তর্ভুক্ত? অর্থ : 'তবে সে নয় যার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত।' নাকি তার বিপরীতে তাদের কথা ও কাজ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তারা وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থ : 'তবে যে ব্যক্তি কুফরির জন্য তার মনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।'

কুফর বাস্তবায়নে কার কত বেশি অর্জন, কে কত বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করে চলছে, বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের তালিকায় কে কত নম্বর স্থান অধিকার করেছে, কে বিশ্বের পরাশক্তিকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে, কোনো চাপের মুখে কাজ করছে না বলে কে কত বেশি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারছে, কোন সরকারের আমলে বিচারবিভাগ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে; এ সকল বিষয় যখন জনসম্মুখে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই বলা হচ্ছে এবং দম্ভভরে বুক ফুলিয়ে বলা হচ্ছে, তখন তাদের ব্যাপারে 'মুকরাহ' হওয়ার দাবি করে আমরা তাদেরকে বাঁচাতে চাই, নাকি নিজেরা বাঁচতে চাই? এটি কি صَرْفُ الْكَلَامِ إِلَى مَا لَا يَرْضَى بِهِ الْمُتَكَلِّمُ

[বক্তব্যের যে অর্থ বক্তা সমর্থন করে না, বক্তব্যকে সেই অর্থের দিকে ফেরানো] হয়ে যাচ্ছে না?

তারপরও তাদেরকে বাঁচাতে যদি বলি- তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে জাগতিক স্বার্থোদ্ধারে এমনটি করছে, তখন আমাদেরকে বলা হবে; হ্যাঁ! এসকল লোকদের ব্যাপারেই মহান আল্লাহ বলেছেন-

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে, তবে সে নয় যার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত। তবে যারা কুফরির জন্য নিজেদের মনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তা এ কারণে যে, তারা পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনকে বেশি ভালোবেসেছে এবং [এ জন্য যে,] আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। ওরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর ওরাই উদাসীন। এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। [সুরা নাহ্‌ল : ১০৬-১০৯] -অনুবাদক।)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ভঙ্গের কারণ সংশ্লিষ্ট পাঁচটি মূলনীতি, একটি জরুরি সংযুক্তি এবং কুফর-শিরক-নিফাক ও ইরতিদাদ বিষয়ক মৌলিক আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর, সামনে আমরা ঈমান ভঙ্গের বিশেষ দশটি কারণ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ভঙ্গের কারণ

ঈমান ভঙ্গের অনেক কারণ রয়েছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ দশটি কারণ নিম্নরূপ-

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা। কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে-

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾.

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের [গোনাহ] -যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন। [সুরা নিসা : ১১৬]

কেননা আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।

(সুনানুত তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِيْنَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هٰذِهِ الآيَةَ ﴿اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوْهُمْ؟ فَقَالَ : «بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الحَلَالَ وَأَحَلُّوْا لَهُمُ الحَرَامَ، فَاتَّبَعُوْهُمْ، فَذٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

হজরত আদি ইবনে হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত পড়তে শুনলেন- [অর্থ :] 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।' আদি বললেন, তারা তাদের ইবাদত করেনি। রাসুল বললেন, অবশ্যই করেছে। আলেম ও আবেদরা তাদের জন্য কিছু বৈধ বিষয় অবৈধ করেছে

এবং কিছু অবৈধ বিষয় বৈধ করেছে, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এটিই এদের পক্ষ থেকে ওদের ইবাদত করা।[১]

এ হাদিস দ্বারা প্রতীয়মন হয়, যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন ও বিধান প্রণয়ন করে, তাদের বিধান ও আইন মান্য করাও একটি ইবাদত। গায়রুল্লাহর যেকোনো ধরনের ইবাদতকারী মুশরিক। গায়রুল্লাহর প্রত্যেক ইবাদত বর্জন করা মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত। -অনুবাদক।)

২. যে ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে বিভিন্ন মাধ্যম নির্ধারণ করে- তাদেরকে ডাকে এবং নিজেদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য তাদের শরণাপন্ন হয়, উম্মতের ঐক্যমতে সে কাফের।

(মক্কার মুশরিকরা এই কুফরিতে নিমজ্জিত ছিল। তারা কিছু মাধ্যম নির্ধারণ করে নিয়েছিল এবং এই আশায় সেগুলোর উপাসনা করত যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যভাজন বানিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ভাষায় ইরশাদ করেছেন-

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾.

আমরা তাদের উপাসনা কেবল এ জন্য করি যে, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। [সুরা যুমার : ৩]

মুশরিকদের সম্পর্কে আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾.

তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। [সুরা ইউনুস : ১৮] -অনুবাদক।)

৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের বলে না বা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করে, উম্মতের ঐক্যমতে সে কাফের।

---

১. সুনানুত তিরমিজি (কিতাবুত তাফসির) ৮ : ২৪৮। হাদিস নং ৩০৯৪

(কোরআন পাকে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে-

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾.

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন- আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। [সুরা মুমতাহিনা : ৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». (صحيح مسلم برقم ١٣٩)

যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করল, তার জানমাল নষ্ট করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তার হিসাব-গ্রহণ আল্লাহর দায়িত্বে। [সহিহ মুসলিম]

বোঝা গেল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অন্য সকল উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। অন্যথায় কেউ জানমালের নিরাপত্তা পাবে না।

ঈমান ভঙ্গের উল্লিখিত কারণটি বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তর্দৃষ্টি মুছে দিয়েছেন, তাদের অনেকে সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও ঐক্যতার কথা বলে এবং এক ধর্মাবলম্বীদেরকে অপর ধর্মাবলম্বীদের নিকটবর্তী হওয়ার আহ্বান জানায়। তারা বলে- ধর্মের কারণে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে কখনো যুদ্ধ হতে পারে না। কোথাও ধর্মের নামে যুদ্ধ হয়ে

থাকলে তা হয়েছে ধর্ম পালন না করার কারণে, ধর্মের কারণে নয়। ধর্মে ধর্মে কোনো শত্রুতা নেই। এ ধরনের বিভিন্ন উক্তির কয়েকটি লিংক সামনে ১৬০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমান ভঙ্গের আলোচ্য কারণটিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা ও স্পষ্ট করাকে তারা সাম্প্রদায়িকতা, বাড়াবাড়ি, কঠোরতা এবং ধর্মে ধর্মে ও জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা বলে আখ্যায়িত করে। এই লোকগুলো কাজে-কর্মে আল্লাহর শরিয়তের উপর এ অভিযোগ আরোপ করে যে, শরিয়ত জাতিবর্গের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করছে এবং মানুষের মধ্যে কিতনা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। মুসলমান নামধারী যারা এ মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ধর্মের কথা বলে, তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দীনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার কারণে, তাদের আবু তালেবি চেতনার ভক্তরা এ ব্যাপারে নীরব থাকার নীতি অবলম্বন করে চলছে। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা হও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, হও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দানকারী, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের বা [তোমাদের] পিতা-মাতা ও আত্মীয়বর্গের বিপক্ষে। [যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে] সে ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয়ের [তোমাদের চেয়ে বেশি] নিকটতর। অতএব তোমরা ইনসাফ করার বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা জিহ্বা ঘুরাও অথবা এড়িয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবগত। [সুরা নিসা : ১৩৫] -অনুবাদক।)

৪. যে ব্যক্তি মনে করে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো দিকনির্দেশনা তাঁর দিকনির্দেশনার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ, অথবা অন্যের শাসনব্যবস্থা তাঁর শাসনব্যবস্থার তুলনায় উত্তম।

উদাহরণস্বরূপ ঐ সকল লোক, যারা তাগুতের শাসনব্যবস্থাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনব্যবস্থার উপর প্রাধান্য দেয়, তারা কাফের।[১]

(কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে-

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারা তার প্রতি ঈমান এনেছে? তারা তাগুতের কাছে নিজেদের মামলা নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে। আর শয়তান তাদেরকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। [সুরা নিসা : ৬০] ১৫৫ ও ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় 'তাগুতে'র সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ آسان ترجمۂ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন-

আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির উপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই। [آسان ترجمۂ قرآن-এর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ».

(صحيح مسلم برقم ٢٠٤٢)

১. 'শাসকের মুরতাদ হওয়ার অবস্থাসমূহ' শিরোনামে এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। -অনুবাদক।

নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠতর দিকনির্দেশনা হলো মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে]র দিকনির্দেশনা। [সহিহ মুসলিম] -অনুবাদক।)

৫. যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ করল, সে তদানুযায়ী আমল করলেও উম্মতের ঐকমত্যে কাফের। (যেমন- কুরবানিতে দেশের পশুসম্পদ নষ্ট হয় বলে মন্তব্য করার পর নিজে কুরবানি করল। -অনুবাদক।)

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

আর যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন। তা এ কারণে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা তারা অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। [সুরা মুহাম্মদ : ৮-৯]

(উদাহরণস্বরূপ- কেউ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার বিধানকেই অপছন্দ করল। যেমন- সুরা নিসার ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে- رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ হে আমাদের প্রতিপালক! কেনো আপনি আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলেন? দ্বিতীয় আরেকটা অপছন্দ আছে। তা যুদ্ধ করার বিধানে নয়। সেটা হলো যুদ্ধ করার ব্যাপারে মানুষের স্বভাবগত অপছন্দ। যেমন সুরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দ। একাধিক বর্ণনা মতে প্রথম অপছন্দকারীরা ছিলো মুনাফিক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অপছন্দটা ছগিরা গোনাহও নয়। কারণ তা কারো ইচ্ছাধীন নয়।

অবশ্য যারা জিহাদের বিধান স্বীকার করা সত্ত্বেও জিহাদ না করে অন্য কোনো আমল দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাদের অবস্থানটা 'অপছন্দ' কি-না, বিষয়টি চিন্তনীয়।

ঢাকা বাংলাবাজারের 'দারুল কিতাব' থেকে প্রকাশিত 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবের ১০১৩ নং পৃষ্ঠায় সুরা সাফ-এর ১০ থেকে ১৩ নং আয়াতগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'দ্বিতীয় জিনিস যাহা আমাদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে, উহা হইল জেহাদ। জেহাদের আসল যদিও কাফেরদের সহিত যুদ্ধ ও মোকাবিলা করা, তথাপি জেহাদের মূল লক্ষ্য হইল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁহার হুকুম-আহকাম পূর্ণভাবে চালু করা। আর ইহাই আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য।'

'ফাযায়েলে আমল' কিতাবের ৯৮১ থেকে ১০১৬ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলো মূলত 'পস্তী কা ওয়াহেদ এলাজ' নামক পৃথক একটি পুস্তিকা। উল্লিখিত বিষয়টি চিন্তনীয় হওয়ার বিশেষ কারণ হলো- আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁর হুকুম-আহকাম পূর্ণভাবে চালু করার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পদ্ধতি কোরআন পাকে নির্ধারণ করলেন, তার পরিবর্তে অন্য একটা পদ্ধতি মুসলমানদের 'পস্তী কা ওয়াহেদ এলাজ' [অধঃপতনের একক চিকিৎসা] কী করে হয়? বিষয়টি বিশেষভাবে এজন্যও চিন্তনীয় যে, নীতিটি নির্ধারিত হয়েছে নবিওয়ালা মেহনতের দাবিদার জামাতের একেবারে কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে[১] এবং যুক্ত রয়েছে জামাতের প্রধান মানহাজি কিতাবে।[২]

প্রসঙ্গত, তাবলিগ জামাতের চারটি পরিভাষা- ১. কালিমার দাওয়াত, ২. নবিওয়ালা কাজ, ৩. আল্লাহর রাস্তার মেহনত, ৪. নবির তরিকা-র পর্যালোচনা দেখুন পাকিস্তানের বরেণ্য লেখক

---

১. 'পস্তী কা ওয়াহেদ এলাজ' পুস্তিকাটির লেখক হলেন মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দলভি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি হজরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রাহিমাহুল্লাহর চাচাতো ভাই, ভগ্নিপতি ও তাঁর বিশিষ্ট আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাত পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্বে ও হজরতজি মুহাম্মদ ইলয়াস রাহিমাহুল্লাহর সাহচর্যে। তাবলিগ জামাতের 'ছয় নম্বরে'র লেখকও তিনি। তিনি হজরতজি মাওলানা এনামুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর পিতা ছিলেন।

২. 'পস্তী কা ওয়াহেদ এলাজ' পুস্তিকাটি প্রচলিত তাবলিগ জামাতের প্রধান কেন্দ্র তথা নিজামুদ্দিন থেকে প্রকাশিত তাবলিগি মানহাজের পরিচিতি ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

শায়খ যুবাইর আহমদ সিদ্দিকি দামাত বারাকাতুহুমের রচিত 'আদ-দীন আন-নাসিহাহ্' নামক বইয়ে। বইটির বাংলা অনুবাদের শিরোনামও এটিই। প্রাপ্তিস্থান : ঢাকাস্থ বাংলাবাজারের ইসলামি টাওয়ার। -অনুবাদক।)

৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের কোনো জিনিস বা আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ছওয়াব বা শাস্তি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করল, সে কাফের।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.

আর আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তবে অতি অবশ্যই তারা বলবে, আমরা খোশগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বিধানাবলি ও তাঁর রাসুলকে উপহাস করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছো। [সুরা তাওবা : ৬৫-৬৬]

(শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

তাদের উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, তারা কোনো কুফরি কাজ করার ইচ্ছা করেনি এবং একে তারা কুফরিও মনে করেনি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বুঝিয়ে দিলেন যে, দীন নিয়ে হাসি-তামাশা সর্বাবস্থায় কুফরি এবং তা দ্বারা ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়।[১] -অনুবাদক।)

৭. জাদুকর্ম। অতএব যে ব্যক্তি জাদু করে বা জাদুতে খুশি হয়, সে কাফের। (এ হুকুম ঐ জাদুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা জাদুকর জিনদের মাধ্যমে করে থাকে।[২] -অনুবাদক।)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

---

১. مجموعُ الفَتَاوَى খ. ৭ পৃ. ২৭৩।

২. الإعلامُ بتوضيحِ نواقضِ الإسلامِ পৃ. ৩৬-৩৭

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾.

শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে যা পাঠ করত, তারা তার অনুসরণ করেছে। সুলাইমান কুফরি করেননি। বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দেয়। বাবেলে হারুত মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি [কিছুই] অবতীর্ণ করা হয়নি। তারা কাউকে [জাদু] শেখাতেন না যতক্ষণ না বলতেন যে, আমরা তো পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফরি করো না। [সুরা বাকারা : ১০২]

৮. কাফেরদেরকে সমর্থন করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾.

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। [সুরা মায়িদা : ৫১]

(কাফেরদেরকে সমর্থন করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র হলো- সকল ধর্মকে একত্র করা, আকিদার ভিত্তিতে পার্থক্য করার হুকুম রহিত করা ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার বিরোধ দূর করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আন্তধর্মীয় সভা ও সম্মেলনে যোগদান করা। এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার হুকুম সামনে ১৬২ নং পৃষ্ঠায় আসছে।

উল্লেখ্য, تَوَلِّي তথা বন্ধুত্ব এবং 'কাফেরদেরকে সমর্থন করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা' ভাষা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে এমন সাহায্য করাই ঈমান ভঙ্গের কারণ, যা তাদেরকে সমর্থন করামূলক হয়। তাদেরকে যেকোনো সাহায্য করা ঈমান ভঙ্গের কারণ নয়। যেমন

হজরত হাতিব বিন আবি বালতাআ রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। -অনুবাদক।)

৯. যে ব্যক্তি মনে করবে- কিছু লোকদের জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা জরুরি নয় এবং তাদের জন্য নবির শরিয়ত থেকে বের হওয়ার সুযোগ আছে, যেভাবে হজরত খিজর আলাইহিস সালামের জন্য হজরত মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়ত থেকে বের হওয়া সুযোগ ছিল, সে কাফের।

(আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। [সুরা সাবা : ২৮]

আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি [প্রেরিত] আল্লাহর রাসুল। [সুরা আরাফ : ১৫৮] -অনুবাদক।)

১০. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখতা- দীন শিখবে না এবং তা অনুসারে আমল করবে না।

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾.

ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? আমি অবশ্যই [এই] অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। [সুরা সাজদা : ২২]

(আল্লাহর দীন থেকে যে বিমুখতা ঈমান ভঙ্গের কারণ, তা হলো- মূল ঈমানের ব্যাপারে বিমুখতা। পূর্বের 'বিমুখ থাকাজনিত কুফরি' শিরোনামের আলোচনা এবং সেখানে শায়খ মুহাম্মদ

হামেদ ফেকি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি দ্রষ্টব্য। পৃ. ১২৮। পক্ষান্তরে ঈমান আনয়নের পর শরিয়তের কোনো বিধান পালন করার ব্যাপারে বিমুখতা গুনাহ হলেও তার কারণে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় না। -অনুবাদক।)

উল্লিখিত কারণগুলো 'অপারগতা'র অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় ঈমান ভঙ্গের কারণ। কেউ তা রসিকতাবশত করছে, না আন্তরিকভাবে করছে, না ভয়ের শিকার হয়ে করছে- তা দেখার বিষয় নয়। (যেমন বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে নিয়ত বিবেচ্য বিষয় নয়। -অনুবাদক।) প্রতিটি কারণই চূড়ান্ত স্তরের ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক পরিমাণে সংঘটিত। অতএব মুসলমানের জন্য এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা ও মনে সেগুলোর সভয় গুরুত্ব লালন করা জরুরি।[১]

১. আবদুর রহমান বিন কাসিম রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ খ. ৮ পৃ. ৮৯-৯০। আরো দেখুন مُؤَلَّفَاتُ الإمامِ محمدِ بنِ عبدِ الوَهَّابِ খ. ৫ পৃ. ২১২-২১৪

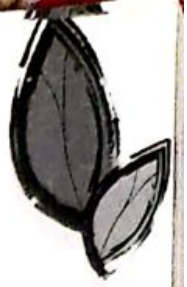

চতুর্থ কারণের ব্যাখ্যা

বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে ঈমান ভঙ্গের উল্লিখিত কারণগুলোর মধ্য থেকে দু'টি কারণ নিম্নে কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করা হচ্ছে। এর দ্বারা 'শাসন' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণ এবং এ বিষয়টির সঙ্গে ওয়ালা-বারা [শত্রুতা-মিত্রতা]র সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে চতুর্থ কারণ- 'যে ব্যক্তি মনে করে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো দিকনির্দেশনা তাঁর দিকনির্দেশনার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ, অথবা অন্যের শাসনব্যবস্থা তাঁর শাসনব্যবস্থার তুলনায় উত্তম। উদাহরণস্বরূপ ঐ সকল লোক যারা তাগুতের শাসনব্যবস্থাকে তাঁর শাসনব্যবস্থার উপর প্রাধান্য দেয়, তারা কাফের।'

জীবন-প্রবাহ থেকে আল্লাহর শরিয়তকে স'রিয়ে দেওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ মানব-রচিত আইনকানুন আমদানি করা, মুসলমানদের জীবনে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে প্রকাশিত হওয়া একটি আধুনিক ধর্মত্যাগ। কথা হলো- ইসলামি সমাজ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী আল্লাহর শরিয়তের ছায়ায় কাটিয়েছে। শরিয়ত মুসলমানদের শাসক ও শাসিত উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ছগিরা বা কবিরা কিছু গোনাহ মুসলমানদের জীবনে থাকলেও আল্লাহর শরিয়ত ও তাঁর আইনই ছিল জীবনব্যবস্থা ও কার্যকর বিধান। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও পৃথিবীতে ইসলামের বাণী ইত্যাদির প্রসারও ছিল ব্যাপক ও বর্ধমান।

ত্রুটি, পশ্চাদমুখিতা ও যুগের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা প্রভৃতি অভিযোগে ইসলামি শরিয়তকে অভিযুক্ত করার মতো কিছু ছিল না। এটা হয়েছে মুসলমানরা আল্লাহকে ভুলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে এর স্থলে সুযোগ দেওয়ার কারণে। তাই আল্লাহও তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন।

কোরআন পাক ও পবিত্র সুন্নাহ শাসন বিষয়ে অনেক সুস্পষ্ট বাণী উল্লেখ করেছে। শাসন বিষয়টি যে মুসলমানদের আকিদার অংশ এবং দীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, তা-ও স্পষ্ট করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾.

আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই কাফের। [সুরা মায়িদা : ৪৪]

আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾.

আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই জালেম। [সুরা মায়িদা : ৪৫]

আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾.

আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই ফাসেক। [সুরা মায়িদা : ৪৭]

আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۭ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾.

তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? [সুরা মায়িদা : ৫০]

আরও ইরশাদ করেছেন-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾.

অতএব নয়, আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে

বিচারক বানাবে। তারপর আপনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা পাবে না এবং [তা] মেনে নেবে মেনে নেওয়ার মতো। [সুরা নিসা : ৬৫]

আরও ইরশাদ করেছেন–

﴿اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ﴾.

নাকি তাদের জন্য রয়েছে এমন কতক শরিক, যারা তাদের জন্য এমন দীন প্রবর্তণ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [সুরা শুরা : ২১]

আরও ইরশাদ করেছেন–

﴿وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ. وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ. اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾.

আর তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং [তাঁদের] আনুগত্য করেছি। তারপরও তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা ঈমানদার নয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসুল তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখনই তাদের একটা দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি হক [ফায়সালা] তাদের পক্ষে হয়, তবে তারা অনুগত হয়ে তাঁর নিকট আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, নাকি তারা সন্দেহে রয়েছে, নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? [কোনোটাই নয়,] বরং ওরাই জালেম। ঈমানদারদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসুল তাদের মাঝে বিচার করেন, তখন তাদের কথা এই হয়

যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর ওরাই সফলকাম। [সুরা নুর : ৪৭-৫১]

আরও ইরশাদ করেছেন–

﴿وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا﴾.

আর যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার নিকট হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং ঈমানদারদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, সে যেদিকে ফিরে আমি তাকে সেদিকে ফেরাব এবং তাকে জাহান্নামে সেঁকব। আর [তা] কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! [সুরা নিসা : ১১৫]

তারপর আল্লাহ তাআলা ঐসকল লোকদের ধারণার অসারতা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যারা ঈমানদার হওয়ার দাবি করার পর তাগুতের আদালতে বিচার দায়ের করে। ইরশাদ করছেন–

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا﴾.

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে? তারা তাগুতের কাছে মামলা নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে। আর শয়তান তাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভ্রান্ত করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়– আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসুলের দিকে আসো, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, তারা আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [সুরা নিসা : ৬০-৬১]

তাগুতের সংজ্ঞা

(সামনে ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত তাগুতের সংজ্ঞা আসছে। এখানে পৃথক দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হচ্ছে। آسان ترجمۂ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র আলোচ্য ৬০ নং আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে–

তাগুতের আভিধানিক অর্থ ঘোর অবাধ্য। কিন্তু শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক বাতিলপন্থির জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য এমন শাসক, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানাবলি থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে বিচার করে; অথবা তাঁদের বিপরীত আইন দ্বারা বিচার করে। আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির উপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।[১]

'ঈমান সবার আগে' বইয়ে এসেছে–

'তাগুতে'র অর্থ আল্লাহর ঐ বিদ্রোহী বান্দা, যে আল্লাহর মোকাবেলায় নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের উপর তা কার্যকর করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগুত-ব্যক্তি বা দলের বানানো আইনকানুন হচ্ছে সত্য দীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগুতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রূপ আল্লাহর দীনের মোকাবেলায় বা তার সাথে তাগুতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা, সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগুত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফেকি।[২] -অনুবাদক।)

---

১. آسان ترجمۂ قرآن সুরা নিসা : ৬০। লেখক : মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ।

২. 'ঈমান সবার আগে' পৃ. ৬৭, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮ খ্রি. লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ।

শরিয়ত প্রত্যাখ্যানকারীর উপমা

যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি মুছে গেছে, ফলে সে শরিয়তের পরিবর্তে মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, একজন আলেম তার চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন- 'তার অবস্থা হলো মলের পোকার মতো, যা মেশক ও সুগন্ধময় গোলাবের সুঘ্রাণে কষ্ট পায় এবং টয়লেটের মল-মূত্রে বেঁচে থাকে।'[৩]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾.

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, ওরাই সবচেয়ে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা মুজাদালা : ২০]

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধাচরণ হলো- আল্লাহর শাসন ও শরিয়ত এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকা।

বর্তমানের মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ

বর্তমানে মুসলমানরা পৃথিবীতে যে লাঞ্ছনার জীবন পার করছে, তা আল্লাহর শরিয়ত বর্জনের স্বাভাবিক পরিণতি বৈ কিছু নয়। বর্তমানে তারা আদমশুমারিতে অনেক। কিন্তু তারা স্রোতের আবর্জনার মতো আবর্জনা। তুচ্ছতর জাতিগুলোও তাদের উপর আক্রমণ করার লালসা করছে এবং নিকৃষ্টতর লোকেরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের ব্যাপারে সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

«يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عليكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلى قَصْعَتِها».

فقال قائل : ومِنْ قِلَّةٍ نحن يومَئِذٍ؟ قال : «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، ولكِنَّكُمْ

---

৩. শায়খ মুহাম্মদ মুনির দিমাশকি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৬৭ হি.] সংকলিত الرَّسَائِلُ المُنِيرِيَّةُ খ. ১ পৃ. ১৩৯।

غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، ولَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ أَعْدَائِكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، ولَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوْبِكُمُ الوَهْنَ». فقال قائل : يا رسولَ اللهِ! وما الوَهْنُ؟ قال : «حُبُّ الدُّنْيَا وكَرَاهِيَةُ المَوْتِ». (سنن أبي داود، كتاب الملاحم ٤ : ٤٨٤، ٤٢٩٧، وقال في مشكاة المصابيح : رواه البيهقيُّ في دلائل النبوة. ثم قال الشيخ الألبانيُّ : وهو حديث صحيح. انظر مشكاة المصابيح ٣ : ١٤٧٥.)

'অচিরেই কাফের জাতিগুলো তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য একে অপরকে ডাকবে, যেভাবে আহারকারীরা একে অপরকে খাবারের পাত্রে আহ্বান করে।' একজন প্রশ্ন করলেন- তখন তা কি আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে হবে? উত্তরে তিনি বললেন- 'বরং [সংখ্যায়] তোমরা সেদিন হবে অনেক। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের আবর্জনার মতো আবর্জনা। অতি অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উপড়ে ফেলবেন এবং অতি অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা ঢেলে দিবেন।' একজন প্রশ্ন করলেন- দুর্বলতার উৎস কী হবে? তিনি বললেন- 'দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুর অপছন্দ।' [সুনানু আবি দাউদ]

(মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ তথা 'দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুর অপছন্দে'র বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদিসে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ ورَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ».

(أخرَجه أبو داود ٥ : ٣٣٢، رقم ٣٤٦٢. قال أحمد شاكر في تحقيق «مسند أحمد» ٤ : ٤١٤ : إسناده صحيح. دار الحديث؛ وحَسَّنَ الحديثَ الشيخُ شعيب الأَرْنَؤُوْط في تحقيق أبي داود ٥ : ٣٣٣. وأخرَجه أيضا البيهقيّ في السُّنَن الكبرى ٥ : ٣١٦، رقم ١٠٧٠٣، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد بالهند.)

যখন তোমরা পরস্পর ঈনা[১] বেচা-কেনাতে ব্যস্ত হবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন যা তুলে নিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে ফিরে আসবে। [সুনানু আবি দাউদ ও আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি] -অনুবাদক।)

আলেমদের ইউনিফর্মধারী কিছু লোকের দায়

মুসলমানদের জীবনকে গ্রাস করে নেওয়া এই বিচ্যুতির বিরাট অংশের জন্য আলেমদের ইউনিফর্মধারী কিছু লোকও দায়ী। তারা আল্লাহর শরিয়তের পরিবর্তে মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহকে লোকদের সামনে শোভনীয় করে তুলে ধরে। নিজেদের অসৎ কৃতকর্মের বোঝা তো তাদের পূর্ণভাবে বহন করতে হবেই। উপরন্তু কেয়ামত পর্যন্ত ঐ সকল লোকদের গোনাহের বোঝাও তাদের বহন করতে হবে, যাদেরকে তারা গোমরাহ করেছে এবং যারা তাদের ইচ্ছাকৃত অসৎকর্মের কারণে গোমরাহ হয়েছে। ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

(কথাটি লেখক কতটুকু বাস্তব বলেছেন তা বোঝার জন্য নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের কিছু উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. ডক্টর ওয়াহ্‌বা জুহাইলি প্রণীত آثَارُ الحَرْبِ فِي الفِقْهِ الإِسلامِيِّ কিতাবের[২] উদ্ধৃতিতে الوَلَاءُ والبَرَاءُ في الإسلامِ কিতাবে[৩] এসেছে- শাইখুল আজহার মুহাম্মদ মুস্তফা মারাঘি [১৮৮১-১৯৪৫ খ্রি.] আন্তর্জাতিক আন্তধর্মীয় এক কনফারেন্সে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেছেন-

'ইসলাম মুসলমানদের অন্তর থেকে অন্যান্য আসমানি ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষের শেকড় উপড়ে ফেলেছে,

১. ঈনা : এক প্রকার সুদভিত্তিক ব্যবসা।
২. পৃষ্ঠা ৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৫ হিজরি।
৩. পৃ. ৩৪৭। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৩ হিজরি।

মানব-পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব বিদ্যমান থাকার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সকল ধর্মের সহাবস্থানের বিরোধিতা করেনি।' [নাউজুবিল্লাহ!]

২. العَلَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ فِي الإسلامِ কিতাবের[১] উদ্ধৃতিতে الوَلَاءُ والبَرَاءُ فِي الإسلامِ কিতাবে[২] শীর্ষস্থানীয় মিশরীয় গবেষক ও আলেম লেখক মুহাম্মদ আবু জাহ্‌রার [১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.] উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন–

'ধর্ম যদি ভিন্ন হয়, তাহলে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের জন্য হিকমত ও উপদেশের মাধ্যমে নিজ নিজ ধর্মের দিকে দাওয়াত দেওয়ার অধিকার আছে। তবে গোঁড়ামি করা যাবে না, কারণ তা বাস্তবসম্মত কথা শোনার শ্রবণশক্তি লোপ করে দেয়। দলিল-প্রমাণ ব্যতীত জরবদস্তি করা ও উস্কানি দেওয়াও যাবে না।' [নাউজুবিল্লাহ!]

৩. উল্লিখিত آثَارُ الحَرْبِ কিতাবের[৩] উদ্ধৃতিতে الوَلَاءُ والبَرَاءُ فِي الإسلامِ কিতাবে[৪] সিরিয়ার ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ কিংবদন্তি আলেম ডক্টর ওয়াহ্‌বা জুহাইলির [১৯৩২-২০১৫ খ্রি.] উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন–

'ইসলামের লক্ষ্য এই নয় যে, সে নিজকে মানুষের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেবে যে, সেটাই একমাত্র আন্তর্জাতিক ধর্ম থাকবে।[৫]

---

১. পৃ. ৪২। প্রকাশক : আদ্‌দারুল কাওমিয়্যা, মুদ্রণ : ১৩৮৪ হিজরি।

২. পৃ. ৩৪৭।

৩. পৃ. ৬৫।

৪. পৃ. ৩৪৭।

৫. উক্তিটির অসারতা বোঝার জন্য সুরা বাকারা-র ১৯৩ নং আয়াতটি দেখা যথেষ্ট হবে– وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ [তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, ফেতনা না থাকা এবং আনুগত্য আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।] আয়াতের فِتْنَة শব্দের মিসদাক বা প্রতিপাদ্য হলো شِرْكٌ [কোনো ধরনের শিরক]। তাফসিরের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক।

কারণ, এসব কিছু ব্যর্থ প্রয়াস, অস্তিত্বের ধারার সাথে সাংঘর্ষিক ও আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একগুঁয়েমিপূর্ণ আচরণ।[৬] [নাউজুবিল্লাহ!]

এ তালিকায় এমন অনেক ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যাদের কারো কারো প্রসঙ্গ উঠাতে রীতিমত বুক কেঁপে উঠে। তাই উদাহরণস্বরূপ শুধু তিনটি লিংক দেওয়া হচ্ছে। যাদের ইচ্ছা হয় দেখে নিতে পারেন–

https://www.youtube.com/watch?v=ia5rbafPV_w
https://www.youtube.com/watch?v=tLCNMUxJCwM
https://www.youtube.com/watch?v=5bNoMLIwi3c

উদাহরণস্বরূপ বিবৃত লিংক তিনটির প্রথম দু'টি দেওয়া হয়েছে সুরা নিসা-র ১৩৫ নং আয়াতের উপর আমল করার জন্য, যা ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম লিংকের ৯ মিনিটের পরবর্তী কিছু বাক্যের হুবহু বাংলা অর্থ নিম্নরূপ–

'আমি মুসলমান এবং কট্টর মুসলমান। কট্টরের ব্যাখ্যা কী? কট্টরের ব্যাখ্যা হলো, যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই-ই উদ্দেশ্য? জি-না। কট্টরের ব্যাখ্যা হলো, সকল মানুষকে সমান জ্ঞানকারী মুসলমান। সকলকে আদর ও সম্মানকারী মুসলমান। যত বড় আছেন, চাই শ্রী কৃষ্ণজী[৭] হোক বা শ্রী রাম চন্দ্রজী[৮] হোক, যদি কোনো মুসলমান তাদেরকে অনাদর করে অথবা তাদেরকে সম্মান না করে, তাহলে সে পাপী, মহাপাপী। মুসলমানের কর্তব্যের মধ্যে, মুসলমানের জন্য আবশ্যক, তাদেরকে ইজ্জত করবে, তাদেরকে সম্মান করবে, তাদেরকে মহব্বত করবে। টিচ [শিক্ষা] দেখুন, তালিমাত... আমরা উর্দুতে তালিমাত [শিক্ষা] বলি। তো তাদের শিক্ষা দেখুন। আপনি শ্রী রাম চন্দ্রজীর শিক্ষা দেখুন এবং হজরত

---

৬. আল্লাহর হুকুম দু'ধরনের– এক. তাকভিনি হুকুম বা প্রাকৃতিক বিধান। দুই. শরিয়তের বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত শিরক বিদ্যমান থাকা হলো প্রাকৃতিক বিধান। পক্ষান্তরে সব ধরনের শিরক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত শিরকওয়ালাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলো শরিয়তের বিধান। –অনুবাদক।

৭. হিন্দুদের ভগবান।

৮. হিন্দুদের ভগবান।

মুহাম্মদ সাহেবের[১] শিক্ষা দেখুন, যদি আপনি পার্থক্য পেয়ে যান... পাবেন না... তালাশ করতে থাকুন, পাবেন না।' [নাউজুবিল্লাহ]

কথাগুলোর কোনো অংশ সম্পর্কে কারো সন্দেহ হলে লিংকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। ১৭০-১৭১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দেওবন্দের আকাবিরগণের নীতিমালাও দেখুন।

১৯২৮-২৯ এবং ১৯৩৫-৪৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের শাইখুল আজহার মুহাম্মদ মুস্তফা মারাঘি থেকে শুরু করে তৃতীয় লিংকের আলোচ্য ব্যক্তি তথা বর্তমান শায়খুল আজহার ডক্টর আহমদ তাইয়েব পর্যন্ত সকলের উক্তিগুলো আল্লাহর হুকুমের সাথে কি পরিমাণ সাংঘর্ষিক, তা বোঝার জন্য সম্ভবত শুধু এ একটি আয়াতে চিন্তা করাই যথেষ্ট হবে–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾.

হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও এবং ওরা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন। [সুরা তাওবা : ১২৩]

নিম্নের হাদিসটিতেও চিন্তা করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

আমাকে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর রাসুল, আর সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে। যখন

১. এভাবেই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ব্যতীত।

তারা তা করবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তারা নিজেদের জান-মাল হেফাজত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৫]

আন্তধর্মীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করার হুকুম

সৌদিআরবের জামিয়াতুল ইমামের সহযোগী অধ্যাপক শায়খ আবদুল আজিজ রাজিহি হাফিজাহুল্লাহকে আন্তধর্মীয় বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির হুকুম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন–

যে ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মের একটিকে অপরটির কাছাকাছি করার আহ্বান জানায়, সে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সে মুসলমানদেরকে ইহুদি ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্মের নিকটবর্তী হওয়ার বা তাদের মতো হওয়ার অথবা তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার আহ্বান জানায় বা তাদের হকের উপর থাকার কথা বলে। এ লোক তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেনি। এটি ধর্মত্যাগ। এ ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গকারী একটি কাজ করেছে।[২] –অনুবাদক।)

আল্লাহ তাআলা পূর্বসূরি আলেমদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের আচরণ করুন, যারা ছিলেন ইসলামের সীমান্তসমূহের সুরক্ষা দানকারী। তাঁদের যে যেদিকে ছিলেন, সেদিক থেকে ইসলামের উপর কোনো আক্রমণ আসতে পারেনি।

ধরুন মহান ইমাম হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তাঁর রচিত কোরআন পাকের তাফসিরে সুরা মায়িদার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই দুর্যোগের বিবরণ দিয়ে গেছেন, যা তাতারিদের যুগে মুসলিম উম্মাহর উপর নেমে এসেছিল। আয়াতটি নিম্নরূপ–

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?

২. 'সাহাব' ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।

ইয়াসাক সংবিধান

তিনি লিখেছেন- সকল প্রকার কল্যাণ বিশিষ্ট এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন বিধান থেকে যে ব্যক্তি সরে যায় এবং শরিয়তের কোনো দলিল ছাড়াই মানুষ যেসকল চিন্তা, খেয়াল ও পরিভাষা আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তার নিন্দা করেছেন। যেভাবে জাহিলি যুগের লোকেরা তাদের রায় ও খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে রচিত গোমরাহি ও অজ্ঞতাপূর্ণ আইনকানুন দ্বারা শাসন করত এবং যেভাবে তাতারিরা তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান [১১৬৫-১২২৭ খ্রি.] থেকে গ্রহণ করা রাজ্য পরিচালনার নীতিমালা দ্বারা শাসন করে।

চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসাক' নামক একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছে। তা তৈরি করেছে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের বিধানাবলি থেকে চয়ন করে। তাতে তার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত অনেক বিধানও ছিল। সংবিধানটি তার বংশধরদের মধ্যে অনুসরণীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে। তারা একে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহের উপর প্রাধান্য দেয়। তাদের মধ্য থেকে যারা এ কাজ করে, তারা কাফের। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শাসনের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত এবং ছোট-বড় যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার না করা অবধি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ফরজ।[১]

(ইয়াসাক নামক সংবিধানটি যে সকল বৈশিষ্ট্যের ধারক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমন প্রত্যেক সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসনকারীদের ক্ষেত্রে ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহর এ ফাতওয়া প্রযোজ্য। এ ফাতওয়ার সঙ্গে কোনো আলেম দ্বিমত পোষণ করেননি। -অনুবাদক।)

১. তাফসিরে ইবনে কাসির খ. ৩ পৃ. ১২৩

শাসকের মুরতাদ হওয়ার অবস্থাসমূহ

সৌদি আরবের নিজ সময়ের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ[২] ঐ সকল অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলো কোনো শাসকের মধ্যে পাওয়া গেলে শাসক মুরতাদ হয়ে যায়। অবস্থাগুলো হলো–

১. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনাকারী যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান সত্য হওয়াকে অস্বীকার করে। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণিত রয়েছে তার অর্থ এটাই। ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহ [২২৪-৩১০ হি.] এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

(উপরের কথাটি হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু-র যে উক্তির অর্থ, তা ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসিরের কিতাবে সুরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের অধীনে উল্লেখ করেছেন।[৩] কিতাবের বিবরণ নিম্নরূপ–

আমাকে মুসান্না বলেছেন, তিনি বলেন- আমাকে আবদুল্লাহ বিন সালিহ বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে মুআবিয়া বিন সালিহ, আলি বিন আবু তালহা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা

---

২. শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আ-লুশ শায়খ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সৌদি আরবের নিজ সময়ের গ্র্যান্ড মুফতি। জন্ম ১৩১১ হিজরি। জ্ঞান ও গুণের আধার এক পরিবারে প্রতিপালিত হন। ১১ বছর বয়সে কোরআন পাক হিফজ করেন। ১৪ বছর বয়সে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশাবাদি হন। শায়খ সাদ বিন আতিক রাহিমাহুল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৮৯ হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বাস্‌সাম [আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ১৩৪৬-১৪২৩ হি.] রচিত عُلَمَاءُ نَجْد خِلَالَ ثمانيةِ قُـرُونٍ কিতাবে ১ : ৮৮ তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।

৩. কিতাবটির মূল নাম جامِعُ البَيَانِ فِي تأويـلِ القُـرْآنِ তবে তা সাধারণের মধ্যে 'তাফসিরে তাবারি' নামে প্রসিদ্ধ।

করেছেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বলেছেন- [অর্থ :] যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করেনি, ওরাই কাফের। [সুরা মায়িদা : ৪৪]

-'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল, সে কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল, তবে তা অনুসারে বিচার করল না, সে জালেম ও ফাসেক।' ...।

[ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহ বলেন-] অনুরূপ কথা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অস্বীকারকরতঃ সে অনুসারে বিচার করে না। এমন লোক আল্লাহকে অস্বীকারকারী, যেমনটি ইবনে আব্বাস বলেছেন। কেননা আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাজিল করেছেন- এ কথা জানার পর আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করার উপমা হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবি জানার পর তাঁর নবুয়তকে প্রত্যাখ্যান করা। -অনুবাদক।)

আল্লাহ যে শরয়ি বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করা কুফরি হওয়া বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ, তাঁদের সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে-

যে ব্যক্তি শরিয়তের কোনো মূলনীতি বা ঐকমত্য সমর্থিত কোনো শাখা বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যা নিয়ে আগমন করা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তার কোনো একটি হরফও অস্বীকার করে, সে এমন কুফরির কাফের, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।[১]

২. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনাকারী যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান উপযুক্ত হওয়াকে অস্বীকার না করে, কিন্তু মনে করে- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যের বিধান রাসুলের বিধানের তুলনায় উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ এবং সময়ের বিবর্তন ও অবস্থার

---

১. تحكيمُ القوانِينِ الوَضْعِيَّةِ পৃ. ৫

পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট নতুন নতুন পরিস্থিতি ও মানুষের প্রয়োজনকে অধিক শামিল করে, তাহলে তার মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সে মাখলুকের বিধিবিধানকে -যা চিন্তার আবর্জনা ও মস্তিষ্কের ময়লা- প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ খালেকের বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। অথচ প্রত্যেক অবস্থার জন্য -তা যা-ই হোক- আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহে বিধান রয়েছে। তা 'নস' হিসেবে হোক বা 'জাহের' হিসেবে বা গবেষণা নির্ভর বা অন্য কোনো রূপে।

৩. শাসক যদি গায়রুল্লাহর বিধানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের তুলনায় উত্তম মনে না করে, কিন্তু তার সমপর্যায়ের মনে করে, সে-ও উল্লিখিত দু' শ্রেণির মতো মুরতাদ। কারণ সে মাখলুককে খালেকের সমকক্ষ স্থির করেছে।

৪. যে শাসক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করা জায়েজ মনে করে, সে-ও পূর্ববর্তীদের মতো।

৫. শরিয়তের সঙ্গে সবচেয়ে বড় হঠকারিতা, শরিয়তের বিধিবিধানের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাধিক প্রতিযোগিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের স্পষ্টতর বিরোধিতা হলো ঐসব আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেগুলোর ভিত্তি ও উৎস ফরাসি, আমেরিকান, ব্রিটিশ প্রভৃতি মানবরচিত আইন। এর চেয়ে বড় কুফরি আর কী আছে?! 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল' এ সাক্ষ্যদানের বড় বিরোধিতা আর কী হতে পারে?![২]

৬. বিভিন্ন কবিলা ও গোত্র-প্রধানরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঘটনাবলি ও নিজেদের আদত-অভ্যাসের ভিত্তিতে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। এসব নীতি তারা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে সেগুলো দ্বারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করে। এর দ্বারাও

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

শাসক ও বিচারক মুরতাদ হয়ে যায়। ('একটি জরুরি সংযুক্তি' শিরোনামের অধীনস্ত 'সপ্তম দলিল'টি এখানে পুনরায় দেখা উপযোগী হবে। ১২৩-১২৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক।)

হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুমা যে কুফরিকে 'ছোট কুফরি' বলেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, 'তা ঐ কুফরি নয় যা তোমরা উদ্দেশ্য নিচ্ছ', তার উদাহরণ হলো- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানই 'সত্য' হওয়ার বিশ্বাস থাকা এবং নিজের ভুল করা ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি থাকার পরও, কোনো মকদ্দমায় খাহেশ ও কুপ্রবৃত্তিবশত আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার করা।

অবশ্য এ কুফরির কারণে শাসক ও বিচারক যদিও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না, তবুও তা ব্যভিচার, মদপান, চুরি প্রভৃতির মতো সর্বোচ্চ স্তরের গোনাহ। কারণ যে গোনাহগারকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কালামে 'কাফের' বলেছেন [সুরা মায়িদা, আয়াত : ৪৪], নিঃসন্দেহে সে ঐ গোনাহগারের তুলনায় জঘন্যতর, যার ব্যাপারে আল্লাহ এ শব্দ ব্যবহার করেন নি।[১]

শাসন ও বিচারের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনাটি কিছুটা বিশদভাবে করার কারণ হলো, বিষয়টির আহাম্মিয়্যাত ও গুরুত্ব। কারণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে সমর্থন করা, তার নিজের পক্ষ থেকে প্রণীত আইন এবং কোরআন-সুন্নাহ বহির্ভুত তার বৈধ সাব্যস্তকরণ ও অবৈধ সাব্যস্তকরণকে সম্মতি দেওয়া, প্রভৃতি বিষয়গুলো এ সাক্ষ্যদানের বিরোধী- 'আল্লাহই হলেন এমন মাবুদ, যিনি মানুষের ইবাদত লাভের একমাত্র উপযুক্ত'; অতএব মানুষ আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে, সম্মান করবে, তাঁর আনুগত্য করবে ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবে। উল্লিখিত শাসক ও বিচারককে সম্মতি দেওয়া ও সমর্থন করা এ সাক্ষ্যদানেরও বিরোধী যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল; অতএব আদেশ-নিষেধ সকল ক্ষেত্রে তিনিই মানিত ও মাননীয় সত্তা।

আসলে মানুষ যদি এ বিষয়টি বুঝত, তাহলে কোনো খোদাদ্রোহী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার, আইন প্রণয়ন করার, কুফর প্রতিষ্ঠা করার এবং আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন বিধানকে অপসারিত করার সুযোগ পেত না।

তাগুতের সংজ্ঞা

(১৫৫ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের দু'টি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে।) আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তাগুতের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

তাগুত প্রত্যেক ঐ উপাস্য, অনুসৃত ও মান্যবর সত্তা, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে। অতএব প্রত্যেক জাতির তাগুত হলো ঐ ব্যক্তি, যার নিকট লোকেরা কোরআন ও সুন্নাহর পরিবর্তে বিচারের জন্য গমন করে। অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করে। অথবা আল্লাহর সঠিক নির্দেশনা গ্রহণ না করে যার অনুসরণ করে। অথবা প্রত্যেক এমন ক্ষেত্রে যাকে মান্য করে, যা সম্বন্ধে তারা জানেনা যে, এটা আল্লাহর আনুগত্য।[২]

('অথবা প্রত্যেক এমন ক্ষেত্রে যাকে মান্য করে, যা সম্বন্ধে তারা জানেনা যে, এটা আল্লাহর আনুগত্য'। সংজ্ঞার এ অংশটি কয়েকবার খেয়াল করে পাঠ করুন। তারপর ভেবে দেখুন, আমাদের বিভিন্ন দীনী মুরুব্বিদের আনুগত্য করার সময় আমরা এ নীতিটি লক্ষ্য রাখি কি-

---

২. এ অনুবাদের মূল আরবি ইবারত নিম্নরূপ–

الطَّاغُوْتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعٍ أَوْ مُطَاعٍ.
فَطَاغُوْتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُوْنَ إِلَيْهِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، أَوْ يَعْبُدُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، أَوْ يَتَّبِعُوْنَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيْرَةٍ مِنَ اللهِ، أَوْ يُطِيْعُوْنَهُ فِيْمَا لَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلّٰهِ.

আবদুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ রচিত فَتْحُ المَجِيْدِ পৃ. ১৬ দ্রষ্টব্য, সপ্তম সংস্করণ ১৩৭৭ হি.। আনসারুস সুন্নাহ মুদ্রণালয়।

না। কিতাব ও রিজালের অনুসরণের ব্যাপারে কমপক্ষে আমাদের মাদারে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দের নীতিমালার ভিত্তিতে রিজালের যেসকল আনুগত্য সম্বন্ধে আমরা জানি না, তা আল্লাহর আনুগত্য কি-না, সে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে আমাদের মান্য করা হয়ে যায় কি-না, চিন্তা করা দরকার। ['দেওবন্দের নীতিমালা'র বিবরণ একটু পরই আসছে।] আমরা আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর সংজ্ঞা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে শুধু চিন্তা করার আহ্বান জানানো আমাদের উদ্দেশ্য, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

উল্লেখ্য, তাগুতের বিভিন্ন সংজ্ঞায় একটি দিক দৃশ্যমান হয়। তাহলো- ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর সংজ্ঞা অনুসারে এমন অনেকে তাগুত সাব্যস্ত হয়, যারা পরবর্তী অনেকের সংজ্ঞা অনুসারে তাগুত সাব্যস্ত হয় না।

সচেতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার আবশ্যকতা

প্রসঙ্গত, রহমানের বান্দা হতে হলে একজন মুসলমানের কেমন সচেতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, তা বোঝার জন্য শুধু একটি আয়াতে চিন্তা করুন। আল্লাহ তাআলা সুরা ফুরকানের ৭৩ নং আয়াতে রহমানের বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন-

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾.

এবং যখন তাদের উপদেশ দেওয়া হয় তাদের রবের আয়াতসমূহ দ্বারা, তখন তারা শ্রবণশক্তিহীন ও অন্ধরূপে তার উপর পতিত হয় না।

অর্থাৎ রহমানের বান্দারা কোরআনের আয়াতসমূহের উপর পতিত হয়। তবে মুনাফিকদের মতো শ্রবণশক্তিহীন ও অন্ধরূপে নয়। তাঁরা বরং এ অবস্থায় পতিত হয় যে, চোখ-কান খোলা রাখে এবং বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে فِي ظِلَالِ القُرْآنِ কিতাবের নিম্নের উক্তিটি লক্ষ্যণীয়-

রহমানের বান্দাগণ সচেতনভাবে ও দূরদর্শীতার সাথে উপলব্ধি করেন তাদের বিশ্বাসের যথার্থতা ও আল্লাহর আয়াতসমূহের সত্যতা। ফলে তাঁদের ঈমান হয় সচেতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁদের ঈমানে

থাকে না অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামি। তাঁরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি উদ্যমী হন, তখন তা হয় অন্তর্দৃষ্টির সাথে উপলব্ধিকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যম।[১]

কিতাব ও রিজালের অনুসরণের নীতিমালা

১৪০০ হিজরির জুমাদাল উখরা মোতাবেক ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তখন বিভিন্ন আয়োজনের একটি ছিল দারুল উলুমের মাসিক আরবি সাময়িকী الدَّاعِيْ-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। الدَّاعِيْ-এর উক্ত সংখ্যার ৮০ নং পৃষ্ঠায় কিতাব ও রিজালের অনুসরণের ব্যাপারে দারুল উলুমের আকাবিরগণের নীতি উল্লেখ করা হয়েছে যার বাংলা অর্থ নিম্নরূপ–

'দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের এই জামাত কোরআন-সুন্নাহ হতে আলোগ্রহণ ব্যতীত পূর্বসূরি আলেমদের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করেননি। তেমনিভাবে তাঁরা পূর্বসূরি আলেমদের ইলমি ঐতিহ্য, রুচি ও নির্দেশনা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে কোরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের মত-অভিমতের উপর একগুঁয়ে হননি। বরং

---

১. **তালিবানে ইলমের জন্য :** الخُرُور-لم يَخِرُّوا عليها صُمًّا وعُمْيَانًا-এর মধ্যে [পতিত হওয়া]-এর نَفْي করা হয়নি। বরং صَمَم [শ্রবণশক্তিহীনতা] ও عَمًى [অন্ধত্ব]-এর نَفْي করা হয়েছে। শায়খ আস-সামিন আল-হালাবি রহ. [মৃ. ৭৫৬ হি.] তাঁর তাফসিরের কিতাব الدُّرُّ المَصُوْنُ في علم الكتاب المَكنون এ লিখেছেন–

قوله : ﴿لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا﴾ النفيُ مُتَسَلِّطٌ على القيدِ، وهو الصَّمَمُ والعَمَى، أي : إنهم يَخِرُّون عليها، لكنْ لا على هاتين الصفتين، وفيه تعريضٌ بالمنافقين.

আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারি (৪৬৭-৫৩৮ হি.) 'আলকাশশাফে' লিখেছেন–

﴿لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا﴾ ليس بنفيٍ للخرور، وإنما هو إثبات له، ونفيٌ للصَّمَم والعَمَى، كما تقول : «لا يلقاني زيد مسلِّما»، هو نفيٌ للسلام لا للقاء.

দেওবন্দের আকাবিরদের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে, কোরআন-সুন্নাহের আলোকে সালফে সালেহিনের অনুসরণ করা এবং সালফে সালেহিনের মত-অভিমত ও বংশপরম্পরায় তাঁদের থেকে প্রাপ্ত ইলমিরুচির আলো গ্রহণ করে কোরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য বোঝা। কিতাব ও রিজালের এই সমন্বয়ের ফলে দেওবন্দের আলেমসমাজ চিন্তা ও কর্মে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি।'[১][২]

এই নীতিকে অমান্য করে কেউ দারুল উলুম দেওবন্দের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কারো আনুগত্য করলেও আমরা তার দেওবন্দি হওয়ার দাবিকে অসত্য ও অবাস্তব মনে করি। এবং দেওবন্দের নীতির আলোকে তাকে আকাবিরের অনুসরণকারী নয়, বরং আকাবিরপূজারী জ্ঞান করি। আমরা তো বড় বড় ইলমি মারকাজ এমনকি খোদ দেওবন্দকেও দলিলের আলোকে আহলে ইলম কর্তৃক যাচাই করা, দেওবন্দের আকাবিরগণের নীতির দাবি মনে করি। অন্যথায় চিন্তা ও কর্মে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমূহ আশঙ্কাবোধ করি। আকাবির রাহিমাহুমুল্লাহের কথা ও কাজের দলিল তালাশ করা এবং সেই দলিলের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করাকে যারা গোমরাহি বলেন, আমরা তাদেরকে গোমরাহ মনে করি। মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা.-এর ভাষায়- 'এখানে কলমে প্রবল স্রোত ও প্রবাহ ছিলো। আরো অনেক কিছু লেখা যেতো। কিন্তু কলম ও কলব উভয়কে সংযমে

---

১. এ অনুবাদের মূল আরবি ইবারত নিম্নরূপ-

فَلَمْ تَجْعَلْ هـذِهِ الجَمَاعَـةُ كُلَّ اعْتِمَادِهَـا عَلَى الـسَّلَفِ وَالشَّخْـصِيَّاتِ دُوْنَ الاسْتِنَارَةِ بِالكتابِ والسُّنَّةِ، وَلَمْ تَسْتَبِدَّ بِرَأْيِهَا فِي فَهْمِ الكتابِ والسُّنَّةِ مُـسْتَغْنِيَةً عَنْ مَآثِرِ السَّلَفِ العِلْمِيَّةِ وَمَذَاقِهِمْ وَهَدْيِهِمْ، بَلْ صَارَ شِـعَارُهَا اتِّبَـاعَ الـسَّلَفِ الصَّالِحِ فِي ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ وفَهْمَ مُرَادَاتِ الكتابِ والـسُّنَّةِ مَـعَ الاسـتِنَارَةِ بِآرَاءِ السَّلَفِ الصالح ومَذَاقِهِمِ العِلْمِيِّ المُتَوَارَثِ، فَلَمْ يَضِلُّوْا عَمَلًا وفِكْرًا.

২. এখানে কোনো এক সুযোগে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' বইয়ের 'বোধ ও চেতনার পরিচর্যা' শিরোনামের লেখাটি পাঠ করা খুবই উপকারী হবে। বইটির প্রথম প্রকাশের ৪৯৯ থেকে ৫০৮ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রেখেছি। আল্লাহর শোকর, শেষ পর্যন্ত লেখার ইচ্ছের উপর না লেখার শক্তি জয়ী হয়েছে। নইলে হয়ত আপনজনেরাও সমালোচনা শুরু করতো।'[৩]

সাধারণ মুসলমানদের করণীয়

সাধারণ মুসলমানদের কেউ বলতে পারেন, এভাবে হক জানা তো বিদগ্ধ আলেমদের কাজ। আমরা সাধারণ লোক। এভাবে শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমরা কী করব? হ্যাঁ, আপনাদের উপযোগী একটি পরামর্শ হলো, আপনারা 'নবী রাসুলগণের উত্তরসূরি' বইয়ের 'সাধারণ মুসলমানদের করণীয়' অধ্যায়টি পাঠ করে নিজেদের করণীয় জেনে নিবেন। লেখক : মাওলানা আবু আবদুর রহমান সাঈদ ইসলামাবাদী। বইটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণে আলোচ্য অধ্যায়টি ১৪১ নং পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে ১৬২ নং পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান : ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা। -অনুবাদক।)

অষ্টম কারণের ব্যাখ্যা

১৪০-১৫০ নং পৃষ্ঠায় ঈমান ভঙ্গের যে ১০টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ গুরুত্বের কারণে সেগুলোর মধ্য থেকে চতুর্থ কারণটি এ পর্যন্ত কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে অষ্টম কারণটি সম্পর্কে তুলনামূলক সংক্ষিপ্তাকারে কিছু জরুরি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। অষ্টম কারণটি ছিল- 'মুশরিকদেরকে সমর্থন করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা।'

ঈমান ভঙ্গের এ কারণটি ধীরতা ও ধ্যানের সাথে চিন্তা করা জরুরি। এটি ঈমান ভঙ্গের কারণ হওয়ার একটি দলিল হলো, কোরআন পাকের এ আয়াত-

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

---

৩. 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' পৃ. ১৪

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। [সুরা মায়িদা : ৫১]

বর্তমান পৃথিবীতে ঈমান ভঙ্গের যেসকল কারণের শিকার অনেকেই হচ্ছে, এটি সেগুলোর অন্যতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলামি নাম ধারণ করছে এবং আদমশুমারিতে মুসলমান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মুসলমান নামধারী অসংখ্য লোক বর্তমানে কাফেরদেরকে সমর্থন করার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, কাফেরকে 'হে কাফের!' বলে সম্বোধন করতে তাদের লজ্জা হয়। (উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমের উক্তি একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে এ ভাষায়– 'হিন্দু কাফের নেহি।' –অনুবাদক।)

বরং অবস্থা তো এই যে, আল্লাহর শত্রুদের দিকে তাকানো হচ্ছে মুগ্ধতা, বড়ত্ব, শ্রদ্ধা ও মহিমার সাথে। শত্রুরা হয়ে পড়েছে দুর্বল ঈমানদারদের মডেল ও আদর্শ। ওরা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, এরাও তাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর শত্রুদেরকে দেখলে এদের চোখে এমন ধাঁধাঁ লাগে যে, (অবস্থার ভাষায় এরা বলে উঠে–

﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾.

আহা! আমাদেরও যদি অনুরূপ থাকত, যা দেওয়া হয়েছে কারুনকে। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। [সুরা কাসাস : ৭৯] –অনুবাদক।)

কাফেরদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার ঈমান ভঙ্গের আলোচ্য কারণটি বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেছে। প্রথমে হয়েছে মনের টান। তারপর তাদের খোদাদ্রোহী মতবাদসমূহ গ্রহণ করা। এরপর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দেওয়া। তারপর মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো তাদেরকে অবগত করা। এরপর জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করা। এ গ্রন্থের (الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ فِي الإسلام /ইসলামে শত্রুতা ও মিত্রতা) 'মিত্রতার বিভিন্ন রূপ' শিরোনামের পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

বস্তুত যেসকল ভাগ্যবান লোক তাওহিদের আকিদার তাৎপর্য বোঝবে এবং এ আকিদা ভঙ্গকারী কারণগুলো জানবে, সঠিক শরয়ি মানদণ্ড অনুসারে 'শত্রুতা-মিত্রতার আকিদা' বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা তাদের জন্য অতি সহজ হবে। মানুষের খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তি কোনো জিনিস সঠিক হওয়ার যাচাইয়ের মানদণ্ড নয়। মুসলমানের মিত্রতা তো হবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসুলের সাথে, তাঁর ধর্মের সাথে এবং সকল ঈমানদারদের সাথে। পক্ষান্তরে শত্রুতা হবে প্রত্যেক এমন অনুসৃত বা কাঙ্ক্ষিত বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীর সাথে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে।

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা

(ঈমান ভঙ্গের উল্লিখিত কারণগুলো পাঠকের সামনে আসার পর জরুরি মনে হচ্ছে, তাকফির তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার প্রতিবন্ধকতাগুলো অবগত হওয়া। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য মুফতি তারেকুজ্জামান সাহেবের 'তাকফীরের মূলনীতি' বইটি পাঠ করা উপযোগী হবে। প্রাপ্তিস্থান ঢাকার বাংলাবাজারের ইসলামি টাওয়ার। বিষয়টির গুরুত্ব বইটির প্রকাশকের ভাষায় নিম্নরূপ–

'এক শ্রেণীর লোক স্পষ্টত কুফরীর মাঝে নিমজ্জিত ব্যক্তিকেও মুমিন মনে করে বা তাকে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকে– এরা মূলত মুরজিয়া। আরেক শ্রেণীর লোক কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই ব্যাপকভাবে তাকফীর করতে থাকে, কেউ তাদের মতের বিরোধী হলেই তাকে তারা কাফেরদের কাতারে গণ্য করে– এরা হলো খারেজী। এ উভয় শ্রেণীই রয়েছে চরম ভ্রষ্টতায়।

মধ্যমপন্থা তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মত হলো, তাকফীরের উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাকফীর করা এবং যে ব্যক্তিকে তাকফীর করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাকে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকা। কেননা কাফের হওয়ার জন্য কুফরী কাজ

প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে কাফের হওয়ার প্রতিবন্ধক কোনো কারণ না থাকাও শর্ত।'

পক্ষান্তরে আরবি ভাষা অবগত পাঠকগণের জন্য শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِينِيَّةُ কিতাবটি অধ্যয়ন করা অধিক উপযোগী হবে। -অনুবাদক।)

সমাপ্ত

৮৪ নং পৃষ্ঠার টীকা

বর্তমানে কোন্ কোন্ দেশ দারুল হরব?

একজন আলেম বলেছেন– ফিকহের মাসআলা হলো, একজন মুসলমান একান্ত বাধ্য না হলে দারুল হরবে সফর করার অনুমতি রাখে না। প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর সেখানে অবস্থান করার অনুমতি রাখে না। স্থায়ী বসবাসের তো প্রশ্নই আসে না। এসব বিষয়ে মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাঁদের কারো দ্বিমত নেই।

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সংজ্ঞার মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। দারুল হরবের এমন সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে, পৃথিবীতে কোনো দারুল হরব নেই। কিন্তু যে সকল দাঈ সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য মাঠে রয়েছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, যে পৃথিবীতে কুফরির আধিপত্য চলছে, যে পৃথিবীতে কুফরিশক্তির ভয়কে ওজর বানিয়ে আমরা শরিয়তের শত শত মাসআলা থেকে অব্যহতি পেয়ে যাচ্ছি, সে পৃথিবীতে দারুল হরবের অস্তিত্ব নেই, তা হতে পারে না।

যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা দীনের বিধানগুলো যথাযথ পালন করতে পারছি না, যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা জিহাদের পরিবর্তে নির্বাচন করে, দাওয়াত ও তাবলিগে গিয়ে, খানকায়ে অবস্থান করে জিহাদের পিপাসা মিটানোর চেষ্টা করছি, যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে পারছি না, যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে পারছি না, তাঁদেরকে আশ্রয় দিতে পারছি না, যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা অস্ত্র তৈরি, অস্ত্র সংরক্ষণ ও অস্ত্র প্রদর্শন করতে পারছি না, যে সকল রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে আমরা আমাদের বালেগ সন্তানদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারছি না, সে দেশগুলো কেনো দারুল হরব নয়?

এমনকি যে দেশগুলো এ মুহূর্তে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে চলেছে, ইসলামের নামে যত অগ্রযাত্রা পৃথিবীব্যাপী চলছে তার প্রত্যেকটির মুখে বাধা দিয়ে চলেছে, যে দেশগুলো আল্লাহর পথের মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে চলেছে, যে দেশগুলো এ মুহূর্তে আল্লাহর পথের জিহাদকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে চলেছে, সে দেশগুলোও কেনো দারুল হরব নয়?

৮৪ নং পৃষ্ঠার টীকা

হিজরত করে কোথায় যাব?

জনৈক আলেমের ভাষায় এ প্রশ্নের প্রথম ও সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাসের মুহাজিরগণের প্রথম কাফেলা ও দ্বিতীয় কাফেলা যখন হিজরতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের জন্য মখমলে ঢাকা দারুল ইসলাম কোথায় কোথায় প্রস্তুত ছিল?

প্রশ্নটির দ্বিতীয় ও কঠিন উত্তর হচ্ছে, কুফরি শক্তির প্রচারণার আবহে লালিত পালিত হয়ে আমরা পৃথিবীর যে ভূখণ্ডগুলোকে সন্ত্রাসের আখড়া বলে জেনে আসছি, জঙ্গি আস্তানা বলে জেনে আসছি, সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার বলে শুনে আসছি– আসলে সেগুলো কী? আমরা কি কখনো খবর নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি যে, দারুল ইসলামের যে সংজ্ঞা ফিকহের কিতাবাদিতে রয়েছে, তা সেসব ভূখণ্ডের মাঝে প্রযোজ্য হয় কি না?

আমরা তা করিনি। উপরন্তু কুফর-শাসিত পৃথিবীতে যখন দারুল ইসলামের কিতাবি সংজ্ঞা প্রয়োগ করতে পারিনি, তখন বলে বসেছি, পুরাতন কিতাব-পত্রের সংজ্ঞা এখন আর প্রযোজ্য হবে না। যে দিন থেকে ইসলামি সমস্যাগুলো সমাধানের এ পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, সে দিন থেকে শরিয়তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কেটে কেটে মডারেট ইসলাম বা ইসলামের আধুনিকায়নের মহোৎসব শুরু হয়েছে। (উক্ত আলেমের বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে।)

উল্লিখিত প্রথম উক্তির সঙ্গে যুক্ত একটি কথা হলো, হিজরত করার জন্য দারুল ইসলাম হওয়া জরুরি নয়। উদাহরণ হিসেবে التفسيرُ المُيَسَّرُ কিতাবে সুরা আনফালের ৭২ নং আয়াতের هَاجَرُوْا [হিজরত করেছে]-এর তাফসির দেখুন। তাতে লেখা হয়েছে– 'দারুল ইসলামে অথবা এমন স্থানে হিজরত করেছে যেখানে তারা নিজেদের রবের ইবাদত করতে সক্ষম।' ৭৪ নং আয়াতের তাফসিরেও অনুরূপ বক্তব্য এসেছে।

CamScanner

কালিমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রহ.

(১৩২৩-১৪১৭ হি.)

অনুবাদ

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

CamScanner

প্রথম অংশ : তাওহিদে ইলাহি

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

[আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই]

তাওহিদের গুরুত্ব

(কবিতার অনুবাদ)

কালিমা 'লা-ইলাহা'ই আত্মা ও দেহ ইসলামের
এ কালিমার অন্তরালেই রয়েছেন স্রষ্টা মোদের
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো মোদের গুপ্তধন
এর উপরই দাঁড়িয়ে আছে মোদের সকল চিন্তা-চেতন
এ কালিমার শব্দেরা যবে মুখ হতে হৃদয়ে পৌঁছে যায়
মোদের শুষ্ক জীবন তখন নতুন করে শক্তি পায়।

আল্লাহ তাআলাকে এক-অদ্বিতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার নাম হলো তাওহিদ বা একত্ববাদ। এ তাওহিদ ও একত্ববাদ ইসলামের মূলভিত্তি, ঈমানের প্রাণ এবং নিজ নিজ উম্মতের জন্য প্রত্যেক নবির প্রথম পয়গাম।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি অবশ্যই এ ওহি পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো। [সুরা আম্বিয়া : ২৫]

এ তাওহিদ গ্রহণ করা ও না করা এবং তার দাবি অনুসারে জীবন পরিচালনা করা ও না করার উপরই নির্ভর করে মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও মুক্তি-ধ্বংস।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত রয়েছে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণের সামনে ইরশাদ করেন- ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ দু'টি জিনিস এমন যা [অপর দু'টি জিনিসকে] অপরিহার্য করে দেয়।

জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন- يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ হে আল্লাহর রাসুল! অপরিহার্যকারী জিনিস দু'টি কী?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

«مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ؛ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ মুসলিম]

অন্য এক হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا؛ وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। আর আল্লাহর উপর মানুষের অধিকার এই যে, তিনি এমন কাউকে শাস্তি দেবেন না, যে তাঁর সাথে কোনো বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

«مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

যে কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, তারপর সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল [অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাওহিদের উপর অবিচল থাকল], সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]

অন্য এক হাদিসে আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন-

যাও, এমন যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়, فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। [সহিহ মুসলিম]

অনুরূপভাবে হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে জানে[১]- আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত লাভের উপযুক্ত কেউ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ মুসলিম]

হজরত মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন–

«مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ "لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"».

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য জান্নাতের চাবি। [মুসনাদে আহমদ]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম– مَا نَجَاةُ هٰذَا الْأَمْرِ؟ আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উপায় কী?

---

১. 'জানা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুখে যা বলছে অন্তরে তা জানে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন– কালিমা উপকারী হওয়ার জন্য তা মুখে যেমন বলতে হয়, অন্তরেও উচ্চারণ করতে হয়। অন্তরের উচ্চারণ হলো- তা জানা; তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া; তাতে কোন্ জিনিসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কোন্ জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তা যথাযথ বোঝা; যে 'ইবাদত' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ-ই পাওয়ার উপযুক্ত নয় বলা হয়েছে এবং তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত– তার হাকিকত জানা; এবং কালিমার এ হাকিকত মনের জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবস্থায় পরিণত হওয়া। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ' বইয়ের ৬৯ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। –অনুবাদক।

তিনি বললেন-

«مَنْ قَبِلَ مِنِّيْ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّيْ، فَرَدَّهَا، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ».

আমি আমার চাচার নিকট [তার অন্তিম মুহূর্তে] যে কালিমা পেশ করেছি তারপর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে সেই কালিমা গ্রহণ করল, সেটিই তার জন্য মুক্তির উপায়। [মুসনাদে আহমদ]

কিন্তু এসব হাদিসের অর্থ এ নয় যে, শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মৌখিক উচ্চারণ ও তাওহিদের স্বীকৃতি দ্বারাই আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপযুক্ত ও জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেছি। বরং এসব হাদিসের অর্থ শুধু এতটুকু যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রধান ও প্রথম শর্ত তাওহিদ। তাওহিদ ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ নিশ্চিতভাবে অসম্ভব। অতএব যে ব্যক্তি তাওহিদের এ দাওয়াত কবুল করে নিল, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রধান শর্ত পূরণ করে নিল। শিরকের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাতের দরজা –যা নিশ্চিতভাবে বন্ধ ছিল– তাওহিদ গ্রহণ করার কারণে তা এখন খুলে গেছে।

তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলাকে এক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করার পাশাপাশি অন্যান্য শর্ত তথা রাসুলের উপর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সালাত-সিয়ামসহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করার আবশ্যকতা আপন আপন জায়গায় অবশ্যই রয়েছে। কোরআন ও হাদিসে নিজ নিজ স্থানে এসব শর্ত ও বিধানও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বিষয়টি এভাবেও বলা যায় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মেনে নেওয়া এবং তাওহিদকে গ্রহণ করে নেওয়া মূলত পূর্ণ ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ার একটি শিরোনাম। এ হিসেবে উপরোক্ত হাদিসসমূহের অর্থ হল- যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মেনে নিল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ পুরো দীন গ্রহণ করে নিল, যার উৎস ও ভিত্তি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

২. এ মলাটের প্রথম পুস্তিকায় [পৃ. ৬৮-৭৬] 'যারা মনে করে কালিমার শুধু মৌখিক উচ্চারণ যথেষ্ট, তাদের খণ্ডন ও সঠিক মাজহাবের বিবরণ' শিরোনামে একটি

মোট কথা উপরিউক্ত হাদিসসমূহে [এবং সেগুলো ছাড়াও কোরআন-হাদিসের অন্যান্য আরও অনেক বর্ণনায়] একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের পরকালীন মুক্তি তাওহিদ বা একত্ববাদের উপর নির্ভরশীল। তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বার্তা গ্রহণ করা এবং একে জীবন পরিচালনা করার মূলনীতি বানিয়ে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল।

তাওহিদের তাৎপর্য ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মার্থ

তাওহিদের তাৎপর্য ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম বুঝতে হলে মনে সর্বপ্রথম একথা গেঁথে নিতে হবে যে- সত্তা, পৃথিবী সৃষ্টি ও পৃথিবী পরিচালনা- এই তিনটি ক্ষেত্রে আরবের ঐসকল মুশরিকরাও আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় মানত, যাদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাওহিদের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। অর্থাৎ তারা এ বিশ্বাসই লালন করত যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই আসমান, জমিন ও এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন। পবিত্র কোরআনে তাদের এ বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন- সুরা ইউনুস ৪র্থ রুকু, সুরা মুমিনুন ৫ম রুকু ও সুরা আনকাবুত ৬ষ্ঠ রুকু।

আরবের মুশরিকদের শিরক এবং তাদের কাছে তাওহিদের দাওয়াতের দাবি

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যেহেতু 'ইবাদতের'[১] ক্ষেত্রে -যা শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া আবশ্যক- নিজেদের দেব-দেবী ও কাল্পনিক উপাস্যদেরকেও আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করত এবং প্রয়োজন

আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। তাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রয়েছে। -অনুবাদক।

১. ১৮৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী মনে করে নিজেদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ও সমস্যায় তাদেরকে ডাকত, তাদের কাছে 'সাহায্যপ্রার্থনা'[২] করত, তাই তাদেরকে 'মুশরিক' সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মোট কথা মূর্খ আরবদের ইতিহাস ও পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা জানা যায়, এ দু ধরনের শিরকই [ইবাদতের শিরক ও সাহায্যপ্রার্থনার শিরক] তাদের বড় শিরক ছিল। অতএব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যে বার্তা পেশ করেছিলেন, তার প্রাথমিক দাবি এটাই ছিল যে- সত্তা, পৃথিবী সৃষ্টি ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে তোমরা যেমন আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে কর, ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনার সম্পর্কও তেমনি শুধু তাঁর সাথেই রাখো। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো পূজা করো না। প্রয়োজনপূরণে ও সমস্যার সমাধানে তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না। এটাই নবিজির তাওহিদি বার্তার প্রাথমিক দাবি ছিল। এবং একেই তিনি ইসলামের উৎস ও মূলভিত্তি হিসাবে উপস্থাপন করতেন। সুরা ইউনুসের শেষ রুকুতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

আপনি বলে দিন, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্বন্ধে সন্দেহে থাক, তবে [শোনো]- আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমি তাদের উপাসনা করি না, বরং আমি আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে,

২. ১৮৮ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

আমি যেন ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। এবং এই [আদেশও করা হয়েছে] যে, আপনি একনিষ্ঠ হয়ে আপন সত্তাকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আর আপনি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। তবে আপনি যদি [এরূপ] করেন, তাহলে আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। যদি আল্লাহ তোমার উপর কোনো কষ্ট আপতিত করেন, তবে তার অপসারণকারী তিনি ছাড়া আর কেউই নেই, আর যদি তিনি তোমার ব্যাপারে কোনো কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা ইউনুস : ১০৪-১০৭]

এভাবে আরও অনেক আয়াতে ইবাদতের তাওহিদ ও সাহায্যপ্রার্থনার তাওহিদকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে।

* * *

১৮৫ নং পৃষ্ঠার টীকা

ইবাদতের সংজ্ঞা : 'ইবাদত' দ্বারা এখানে অক্ষমতা, অসহায়ত্ব, দাসত্ব, নিচুতা ও হীনতা প্রকাশক মানুষের এমন সব বিশেষ কর্ম উদ্দেশ্য, যা কোনো সত্তাকে পূজনীয়, উপাস্য ও কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী মনে করে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন সালাত, সিয়াম, হজ, সাদাকা, সিজদা, তাওয়াফ, দুআ ও মান্নত-কুরবানি ইত্যাদি। কেউ এধরণের কোনো কাজ গায়রুল্লাহর জন্য করলে পবিত্র কোরআনের আলোকে সে নিশ্চিতভাবে মুশরিক। পৃথিবীর অধিকাংশ মুশরিক সম্প্রদায়ের শিরক এটাই। এ ধরণের শিরককে 'শিরক ফিল্ উলুহিয়্যাত' বলা হয়। নবি-রাসুলগণ অধিকাংশ সময় এই শিরকের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছেন।

(এক হাদিসে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত গায়রুল্লাহর আইন ও সংবিধান মান্য করাকেও ইবাদত বলা হয়েছে–

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِيْنَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هٰذِهِ الآيَةَ ﴿اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوْهُمْ؟ فَقَالَ : «بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الحَلَالَ وَأَحَلُّوْا لَهُمُ الحَرَامَ، فَاتَّبَعُوْهُمْ، فَذٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

হজরত আদি ইবনে হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনলেন– [অর্থ :] 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে', আদি বললেন, তারা তাদের ইবাদত করেনি। রাসুল বললেন, অবশ্যই করেছে। আলেম ও আবেদরা তাদের জন্য কিছু বৈধ বিষয় অবৈধ করেছে এবং কিছু অবৈধ বিষয় বৈধ করেছে, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এটিই এদের পক্ষ থেকে ওদের ইবাদত করা। [তিরমিজি শরিফ]

এ হাদিসের বিষয়ই হলো- যারা আল্লাহর বৈধকৃত বস্তুকে অবৈধ সাব্যস্ত করে এবং তাঁর অবৈধকৃত বস্তুকে বৈধ সাব্যস্ত করে, মোট কথা যারা আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে, তাদের আইন মান্য করাও একটি ইবাদত। গায়রুল্লাহর যেকোনো ধরনের ইবাদতকারী মুশরিক। গায়রুল্লাহর প্রত্যেক ইবাদত বর্জন করা মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত। -অনুবাদক।)

১৮৬ নং পৃষ্ঠার টীকা

সাহায্যপ্রার্থনার সংজ্ঞা : আল্লাহ তাআলা উপায়-উপকরণের এ জগতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেসব ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, যেমন– আগুনের মধ্যে তাপ ও উষ্ণতা, পানির মধ্যে ঠাণ্ডা ও পিপাসা নিবারণের বৈশিষ্ট্য; অথবা যেমন- তরবারির মধ্যে কাটার যোগ্যতা; সেসব বস্তুকে এসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কস্মিনকালেও তাওহিদের পরিপন্থী নয়। বরং এ ব্যবহারই আল্লাহর অভিপ্রায়। ইরশাদ হয়েছে–

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا﴾.

তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব। [সুরা বাকারা : ২৯]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা উপায়-উপকরণের এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যেসব শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন, যেমন শক্তিশালী ব্যক্তিকে দুর্বলদের সাহায্য করার যোগ্য বানিয়েছেন; রাজা ও ক্ষমতাসীন লোকদেরকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এমন শক্তি দান করেছেন যার দ্বারা তারা জালেম থেকে মাজলুমের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে পারে; চিকিৎসকদেরকে রোগীদের চিকিৎসা করার যোগ্যতা দিয়েছেন; অথবা যেমন প্রত্যেককে অপরের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করার যোগ্যতা দান করেছেন- তো উপায়-উপকরণ ও কার্যাদির ধারার অধীনে পৃথিবীর প্রচলিত প্রথানুযায়ী এসব ব্যক্তি থেকে এসব ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করা আদৌ শিরক নয়। বরং তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা রাখারও পরিপন্থী নয়।

মোট কথা গায়রুল্লাহ থেকে এমন 'সাহায্য প্রার্থনা' করাই শিরক, যে প্রার্থনা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত উপায়-উপকরণ ও কার্যাদির এ নিয়মের উর্ধ্বে, কোনো সত্তাকে কল্যাণ ও অকল্যাণের অধিকারী এবং নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতাবলে কার্য সম্পাদনকারী মনে করা হয়। যেমন- দেব-দেবীর পূজারীরা নিজেদের দেব-দেবী থেকে, অনেক মূর্খ ও আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট আত্মাসমূহ, ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানব থেকে সাহায্য চায়। এবং অনেক নামধারী মুসলমান বাস্তব বা কাল্পনিক ওলি ও শহিদদের নিকট এবং তাঁদের মাজারে নিজেদের উদ্দেশ্যসমূহ ভিক্ষা চায়। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তাদের নিকট দুআ করে। এবং শিরকপূর্ণ এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁদের মন রক্ষার্থে তাদের নামে মান্নত ও কুরবানি ইত্যাদি ইবাদত করে। তো যে ব্যক্তি কোনো মাখলুকের সাথে এ ধরনের আচরণ করে এবং এ জাতীয় বিষয়ে তাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করে, সে নিঃসন্দেহে মুশরিক।

হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ (১১১৪-১১৭৬হি.) স্বীয় অতুলনীয় গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় শিরক ও তাওহিদের আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে 'সাহায্যপ্রার্থনা'র এ দু প্রকারের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে যা কিছু উল্লেখ করলাম, তা তারই সারসংক্ষেপ।

[টীকা সমাপ্ত হয়েছে]

১৮৭ নং পৃষ্ঠার *** এর পর

ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনা একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য

এ 'ইবাদত' ও 'সাহায্যপ্রার্থনা'র মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক অবিচ্ছিন্নতার সম্পর্কও রয়েছে। অর্থাৎ ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনা একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। মুশরিকরা দেব-দেবীদের অর্চনা-উপাসনা সাধারণত এই ভুল ধারনার ভিত্তিতেই করে যে, তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশত এদেরকে কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী, প্রয়োজন পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী মনে করে।

মোট কথা কল্যাণ ও অকল্যাণের বিশ্বাসই বাতিল উপাস্যদের উপাসনার কারণ হয়ে থাকে।[১]

তাই তাওহিদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন বারবার এই সত্যকে সুস্পষ্ট করেছে যে, মুশরিক সম্প্রদায় যে সকল কাল্পনিক উপাস্যদের উপাসনা করে, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায় কিছুই নেই।

---

১. এটাই ঐ সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যার ব্যাপারে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় বিশেষ ফারুকি দীপ্তি ও প্রভাবের সাথে সতর্ক করেছেন। পবিত্র হজ পালন কালে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার পূর্বে তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিয়ে নিজের এই ইয়াকিন ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন–

وَأَيْمُ اللهِ، إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ.

আল্লাহর শপথ, তুই একটি নিষ্প্রাণ পাথর মাত্র। না আমাদের উপকার করতে পারিস্, আর না ক্ষতি করতে পারিস্। [সহিহ বুখারি]

এ বাক্যে তিনি এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাঝে এবং নিজেদের দেব-দেবীদের সাথে মূর্তি-পূজারীদের আচরণের মাঝে মৌলিক কী পার্থক্য। (তা হলো, তারা সেগুলোকে সম্মান করে কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী, প্রয়োজন পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী ইত্যাদি বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে আমাদের এমন কোনো বিশ্বাস নেই। আমরা তো একে চুম্বন করি শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে। –অনুবাদক।)

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾.

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপাস্য] মনে কর, তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ [কোনো বস্তুরও] মালিক নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশীদারত্বও নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর [আল্লাহর] সাহায্যকারীও নয়। [সুরা সাবা : ২২]

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾.

আপনি বলুন, তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে [উপাস্য] মনে কর, তাদেরকে ডাকো, তাহলে [দেখবে]- তারা তোমাদের থেকে ক্ষতি দূর করার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। [সুরা বনি ইসরাইল : ৫৬]

এসব আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে দৃশ্যত যদিও মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে শুধু 'সাহায্যপ্রার্থনার শিরক'কে খণ্ডন করা হয়েছে, কিন্তু উপাসনা যেহেতু সাধারণত কল্যাণ-অকল্যাণের বিশ্বাসের পথ ধরেই এবং সাহায্যপ্রার্থনার মাধ্যম অবলম্বন করেই অস্তিত্ব লাভ করে, তাই এসব আয়াত দ্বারা 'উপাসনার শিরক'ও খণ্ডন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে সব আয়াতে সরাসরি শুধু 'ইবাদতের শিরকে'র খণ্ডন রয়েছে, এই পারস্পরিক অবিচ্ছিন্নতার সম্পর্কের ভিত্তিতে সেসকল আয়াত দ্বারা 'সাহায্যপ্রার্থনার শিরকে'রও খণ্ডন হয়ে যায়।

মোট কথা উপাসনা ও সাহায্যপ্রার্থনার শিরকই ছিল আরবের মুশরিকদের বড় ও মূল শিরক, যারা ছিল পবিত্র কোরআনের তাওহিদি বার্তার প্রথম সম্বোধিত লোক। অতএব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে তাদেরকে যে তাওহিদের বার্তা দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে এর প্রাথমিক দাবি এটাই ছিল, তারা যেন উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না

করে। স্বয়ং আমাদের দ্বারাও প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে এরই স্বীকারোক্তি এভাবে নেয়া হয়–

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

হে আল্লাহ! আমরা শুধু আপনার ইবাদত করি, আপনারই ইবাদত করব এবং শুধু আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, আর আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করব। [সুরা ফাতিহা : ৪]

তাওহিদের প্রথম স্তর

সত্তা ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নেওয়ার পর, বাস্তব জীবনে এই ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনার তাওহিদ হলো তাওহিদের ঐ জরুরি ও প্রথম স্তর, যার উপর ঈমান আনয়ন ও তা গ্রহণ করা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি মুসলমানই হয় না। যে ব্যক্তি তাওহিদের এই স্তর থেকেও রিক্তহস্ত হলো এবং সত্তা ও গুণাবলির অথবা ইবাদত ও সাহায্যপ্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে রেখেছেন।

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। [সুরা মায়িদা : ৭২]

আর এটাই সেই মহা শিরক, আল্লাহ যা কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের [গুনাহ] –যার জন্য ইচ্ছা– ক্ষমা করবেন। [সুরা নিসা : ১১৬]

তাওহিদের পরবর্তী দাবি

কেউ যখন তাওহিদের এই প্রাথমিক দাবি পূরণ করে নেয় এবং এই স্তরে উন্নীত হয়ে যায়, তখন তার কাছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি থাকে, যা ব্যতীত তাওহিদ পরিপূর্ণ হয় না। যেমন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, আমাকে শুধু আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী চলতে হবে। তাঁরই অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশের বিপরীতে নিজের বাপ-দাদার রীতি-নীতি, সামাজিক চাল-চলন, রুসুম-রেওয়াজ, সমকালীন সরকারের আইন ও সংবিধান, দুনিয়াদারদের মত-অভিমত অথবা স্বয়ং নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদা বা অন্যান্য লোকদের পছন্দ ও সন্তুষ্টি ইত্যাদি কিছুই দেখব না। বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীতে এসব জিনিসকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে শুধু তাঁর নির্দেশই মান্য করব ও তাঁর সন্তুষ্টির পথেই চলব।

মোট কথা তাওহিদ পরিপূর্ণ করার জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে, ব্যক্তি তার পুরো জীবনে অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নেবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর অনুসরণ ও দাসত্বকে জীবনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করবে। নিম্নের আয়াতগুলোতে তাওহিদের এ স্তরেরই বর্ণনা রয়েছে–

﴿اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ﴾.

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে? [সুরা ফুরকান : ৪৩]

﴿قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ﴾.

আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সরল পথ। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন, সেই জ্ঞানের পরও, যা আপনার নিকট এসেছে, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার না থাকবে কোনো বন্ধু এবং না কোনো সাহায্যকারী। [সুরা বাকারা : ১২০]

﴿قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾.

আপনি বলে দিন, আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সরল পথ। আর আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন [মানব, ফেরেশতা, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি] সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করি। [সুরা আনআম : ৭১]

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমরা তারই অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং তিনি [আল্লাহ] ছাড়া [অন্য] বন্ধুদেরকে অনুসরণ করো না। বস্তুত তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর। [সুরা আরাফ : ৩]

ঈমানদারদের কাছে এসব আয়াতের দাবি এটাই যে, তারা নিজেদের জীবনকে শুধু আল্লাহর নির্দেশনার অধীন রাখবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধু তাঁর হুকুম অনুসারে চলবে। নিঃসন্দেহে অনেকের জন্য তাওহিদের এ দাবি ভারি ও কঠিন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাদের কাছে এটাও চায় এবং এছাড়া তাদের ঈমান ও ইসলাম পূর্ণাঙ্গ নয়।

কবি বলেন- [অর্থ :]

আমি আমাকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গেলে শিউরে উঠি
কারণ, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কঠিন দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত।

অনুরূপভাবে ঈমান ও ইসলাম পূর্ণাঙ্গকরণের জন্যে ঈমানদারদের কাছে তাওহিদের একটি দাবি এটাও যে, শুধু আল্লাহর শক্তিমান ও চিরস্থায়ী সত্তার উপর তারা ভরসা ও তাওয়াক্কুল করবে। একমাত্র তাঁকে নিজেদের সংরক্ষণকারী, সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়স্থল মনে করবে। তাঁর কাছেই কল্যাণ ও মঙ্গলের আশা রাখবে। শুধু তাঁর রাগ ও ক্রোধকে ভয় করবে।[১] শুধু তাঁর সাহায্য-সহায়তার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বৃহত্তর কোনো পরাশক্তিকেও তোয়াক্কা করবে না।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, গায়রুল্লাহর শুধু এমন ভয়ই তাওহিদের পরিপন্থী, যা আল্লাহর পরিপূর্ণ শক্তি ও তাঁর فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ [তিনি যা চান, তা-ই করেন] মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিংবা আল্লাহর উপর আস্থা কম হওয়ার কারণে হয়,

﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾.

আর তারা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না। [সুরা আহযাব : ৩৯]

কবি বলেন– [অর্থ :]

একত্ববাদী ব্যক্তি পার্থিব সম্পদকে পদতলেই স্থান দেয়
এবং আপন শিরের উপর ধরে রাখে করাত
আশাও করেনা কারো কাছে এবং ভয়ও করে না কাউকে।

মোট কথা এ সকল কিছু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে যার মধ্যে যে পরিমাণ অপূর্ণতা থাকবে, বুঝতে হবে, তার তাওহিদ সে পরিমাণ অপূর্ণ এবং সে সে অনুপাতে শিরকে জড়িত। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব কিছু যতটুকু পরিপূর্ণ থাকবে, তার তাওহিদও ততটুকু পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে।

মূর্তি ও উপাস্যের আধুনিক সংস্করণ

এখানে একথাও বলে দেওয়া সঙ্গত যে, বস্তুপূজারী ও আল্লাহবিস্মৃত ইউরোপে নেতাপূজা, জাতিপূজা ও মাতৃভূমিপূজা জাতীয় যেসব গোমরাহি জন্মলাভ করেছে এবং যেভাবে সেগুলোর প্রকাশ ঘটছে, সেগুলোও শিরকেরই বংশধর। ইসলাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আঘাতের মাধ্যমে এসব নতুন 'উপাস্য'দেরকেও নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

যেমন- নিজেদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত ও বল্গাহীন অনুসরণ, তাদের ভাস্কর্য তৈরি, তাদের ছবি ও ভাস্কর্যের সামনে সম্মান ও ভক্তির প্রকাশ, সংবর্ধনা জ্ঞাপন, শির অবনত করা, সেসব প্রতিকৃতির গলায় হার ও মালা পরানো, আল্লাহর বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে জাতীয় ও সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে

যেমন সাধারণতভাবে দুর্বল ঈমানদারদের অবস্থা। অন্যথায় কোনো ভয়ংকর সৃষ্টজীব যেমন হিংস্র জন্তু বা সাপকে অথবা কোনো নির্দয় ও জালেম ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে ভয় করা, তাওহিদের সর্বোচ্চ স্তরেরও পরিপন্থী নয়। কারণ, এই ভয় নিরেট স্বভাবজাত, যে স্বভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহবিস্মৃত নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা- মোট কথা নেতাপূজা ও মাতব্বরপূজার এ সকল ধরনও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাওহিদি বার্তার সুনিশ্চিত পরিপন্থী। ইসলামে এসবের জন্য কোনো ছাড় নেই।

তেমনিভাবে ইউরোপ বর্তমানে জাতি ও মাতৃভূমিকে 'উপাস্যে'র যে মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, যেভাবে সেগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার গান গাইছে, নিজেদের জাতি ও মাতৃভূমির সম্মানবৃদ্ধিকে জাতি ও মাতৃভূমির সেসব তারকারা যেভাবে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে এবং হক-বাতিল ও পুণ্য-অপুণ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জাতি ও মাতৃভূমির প্রতি হৃদ্যতাপোষণকে যেভাবে স্বতন্ত্র একটি 'ধর্ম' বানিয়ে নিয়েছে, [মুসলমানদের মধ্যেও এ সব বিভ্রান্তি অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করছে] এগুলোও ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের এক প্রকার। বরং বাস্তব হলো- নেতা, জাতি, মাতৃভূমি প্রভৃতি ইউরোপের তৈরি এসব নতুন মূর্তি ও প্রতিমা এই দৃষ্টিকোণে পাথরের প্রাচীন মূর্তি ও প্রতিমা থেকেও অধিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী।

কবি ইকবাল [১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.] সত্য বলেছেন- [অর্থ :]

বর্তমানে শরাব, পেয়ালা ও পানকারী সব কিছুর মধ্যে অভিনবত্ব বিদ্যমান
শরাব পরিবেশনকারীও শুরু করেছে অনুগ্রহ ও কৃপার ভিন্ন রীতি-নীতি
মুসলমানরাও নির্মাণ করেছে নিজেদের ভিন্ন হেরেম
আর সভ্যতা-সংস্কৃতির আজরও তৈরি করেছে নতুন প্রতিমা
এসব নতুন খোদাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'মাতৃভূমি',
একে সজ্জিত করে যে পোষাক, তা ইসলাম ধর্মের কাফন।

এ সম্পর্কে আল্লামা ইকবালই অন্যত্র বলেছেন- [অর্থ :]

এখন মানুষের চিন্তা, মূর্তি নির্মাণ ও তার পূজাপাট
প্রতিমুহূর্তে অভিনবত্বের সন্ধানে থাকে মানুষ
পুনরায় নিজেদেরকে আজরের ছাঁচে গড়ে তোলে
তৈরি করে নতুন খোদা

যা বিপদের দিনে উদ্ধার হয় রক্তপ্রবাহের বিনিময়ে।
এর নামই রং, বংশ ও আঞ্চলিকতা
এই অনাকাঙ্ক্ষিত মূর্তির সামনে মানুষকে হত্যা করা হয় ছাগলের ন্যায়
হে খলিলুল্লাহর পূর্ণ করা পাত্র হতে পানকারী!
তোমার রক্ত খলিলের শরাবের বরকতেই তপ্ত।
অতএব, হে সত্যের পোশাক পরিধানকারী!
এ বাতিলের মাথায় তাওহিদের তরবারি দিয়ে আঘাত করো।

তাওহিদের উচ্চতর স্তর

এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে তাওহিদের উচ্চতর স্তর এই যে, আমরা শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক রাখব। তাঁকেই নিজেদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ, উদ্দিষ্ট ও কাম্য বানাব। এরপর তাঁর প্রেম ও ভালবাসায় এমনভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাব যে, যা কিছু করব, শুধু তাঁর জন্যই করব। তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর চাহিদা আমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে।[১]

তারপর শুধু নামাজ বা রোজাই নয়, আমাদের যাবতীয় কর্ম তথা পানাহার, নিদ্রা-অনিদ্রা, হাসি-কান্না, কারো দ্বারা আনন্দলাভ; আরও ব্যাপক শব্দে– আমাদের জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্য এবং শুধু

---

১. ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১০৩৪ হি.] তাওহিদের এই স্তর সম্পর্কেই নিজের এক চিঠিতে লিখেন– 'আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখার নাম তাওহিদ। অন্তর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আবদ্ধ হয়, যদিও তা সামান্যই হয়, তখন ব্যক্তি আর একত্ববাদীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। (১ম খণ্ড, চিঠি নং ১২)
হজরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহ [৪৭০-৫৬১ হি.] 'ফুতুহুল গায়ব' গ্রন্থে লিখেন– শুধু মূর্তিপূজাই শিরক নয়। বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজের প্রতিপালকের সঙ্গে পার্থিব বা পরকালীন কোনো জিনিস গ্রহণ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি যদি তোমার মন ধাবিত হয়, তাহলে তুমি যেন আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলে। (ফুতুহুল গায়ব, ৮ম প্রবন্ধ)

তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হবে। যেন مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ[২] আমাদের অবস্থা হয় এবং আর আমাদের মনের আহ্বান হয়- [কবিতাংশের অর্থ :]

সর্বদা তোমারই গলিতে জীবিত থাকতে চাই

মাটি হয়ে জীবিত থাকতে চাই তোমার পদতলে

উভয় জাহানের মধ্যে তুমি আমার একমাত্র উদ্দিষ্ট ও কাম্য

আমার জীবন-মরণ তোমারই জন্য।

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের নিদর্শন ও ফলাফল

আল্লাহর কোনো বান্দা যখন তাওহিদের এই উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে যায়, তখন তাঁর সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে থাকে। এমনকি দৃশ্যত সে নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজ করলেও তা নিজের প্রয়োজনবোধে ও প্রবৃত্তির চাহিদাবশত করে না। বরং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের নিয়তে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে। ছোট-বড় সব কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা আল্লাহর ঐ বান্দার জন্য এমন স্বাভাবিক হয়ে যায়, যেমন সাধারণ মানুষ প্রত্যেক কাজ নিজেদের প্রয়োজন ও মনের চাহিদাবশত করে।[৩]

---

২. অর্থ : আমার জীবন-মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

৩. ইমামে রব্বানি হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রাহিমাহুল্লাহ নিজের এক চিঠিতে আল্লাহর সেসব ওলিদের সম্পর্কে লিখেন- আল্লাহর ওলিগণ যা কিছু করেন আল্লাহর জন্যই করেন। নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় করেন না। কারণ, তাঁদের অন্তর আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হয়ে গেছে। তাঁদের ইখলাস ও নিয়ত নতুনকরে বিশুদ্ধ করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কেননা তাঁদের নিয়ত ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লার মাধ্যমে সংশোধনপ্রাপ্ত। যেমন এক ব্যক্তি নিজের নফসের শিকারে আবদ্ধ, যা কিছু করে নফসের জন্যই করে, নিয়ত করুক বা না-ই করুক। যখন এ বন্ধন দূর হয়ে যায়, তখন আল্লাহর বন্ধন সেখানে স্থান করে নেয়। ফলে সে যা-ই করে, তা অমনিতেই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

এটি তাওহিদ ও ইখলাসের সর্বোচ্চ স্তর। এটিই মাকামে ফানা বা বিলীন হওয়ার স্তর এবং এ মাকামে পৌঁছেই কারো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পূর্ণতা লাভ করে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে-

«مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ».

হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই ভালোবেসেছে যাকে ভালোবেসেছে, আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করেছে যার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেছে, আল্লাহর জন্যই দান করেছে যাকে কিছু দান করেছে এবং আল্লাহর জন্যই দান করা থেকে বিরত থেকেছে যাকে দান করা থেকে বিরত থেকেছে, মোট কথা যার অবস্থা এই যে, সে সব কিছু আল্লাহর জন্যই করে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে। [সুনানু আবি দাউদ ও সুনানুত তিরমিজি]

আল্লাহর যে সকল বান্দা এই সম্পর্কের কিছু অংশ অর্জন করেছেন, তাঁরা দু-জাহানের সবচেয়ে বড় সম্পদ পেয়ে গেছেন। তাঁরাই সে সকল 'মর্দে খোদা', আল্লাহর পথে যাদের কষ্ট ও শান্তি সম্পূর্ণ সমান। জীবন তাঁদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত হয় না। তাঁদের অন্তরের গহীন থেকে সর্বদা এ আওয়াজ বের হয়- [কবিতার অর্থ :]

তুমি যদি জীবন দাও, তাহলে তা তোমার করুণা
আর যদি মৃত্যু দাও, তাহলে তা তোমারই সিদ্ধান্ত
আমার হৃদয় তো ব্যস্ত তোমাকে নিয়েই
আর তুমি যা কিছুই কর সন্তুষ্ট চিত্তেই কর।

নিয়ত সাথে থাকুক বা না থাকুক। সম্ভাবনাময় স্থানেই নিয়তের প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় না।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

[১ম খণ্ড, চিঠি নং ৬৯]

বরং তাঁরা আল্লাহর দরবারে আশা ব্যক্ত করেন যে, তাঁদেরকে বারবার জীবন দেওয়া হোক, যেন তা বারবার আল্লাহর পথে উৎসর্গিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে এ আবেগ ও অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এ ভাষায়–

«وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلَ».

আমার মন চায়, আল্লাহর পথে আমাকে শহিদ করা হবে, তারপর জীবিত করা হবে, আবার শহিদ করা হবে এবং জীবিত করা হবে। তারপর শহিদ করা হবে। [সহিহ বুখারি]

কবি বলেন– [অর্থ :]

খোদার কাছে লক্ষ জীবন কামনা করি
যেন লক্ষ জীবন উৎসর্গ করতে পারি তোমার জন্য

ঈমানদারদের ইস্পাততুল্য দৃঢ়তা ও বিপ্লবী শক্তি

এরাই হন প্রকৃত আশেক। বিপদাপদ ও সমস্যা-সংকট তাঁদের পথ রোধ করতে পারে না। বরং তাঁরা কোনো আশঙ্কাকে মনেই স্থান দেন না। কবি বলেন [অর্থ :]

ভালোবাসা তরবারি ও খঞ্জরকে ভয় করে না
কেননা ভালোবাসা পানি, বাতাস ও মাটির তৈরি নয়
ভালোবাসাই এ পৃথিবীতে মিলন ও বিরহের কারণ
ভালোবাসাই মণিমুক্তা খচিত তরবারি ও জীবন-সুধা
ইশকের দৃষ্টিতে তাকালে শক্ত পাথরও হয়ে যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ
আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বান্দাকে বানিয়ে দেয় তাঁর প্রিয়পাত্র।

এই প্রেমিকদের আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি কে অনুমান করতে পারে? এই মর্দে-খোদা ও সহায়-সম্বলহীন দরবেশরা –যাঁদের কাছে আল্লাহর নাম

ও অন্তরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই[১]- যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সমকালীন জালেম ও স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, তখন বড় বড় ফেরআউন ও নমরুদদেরকে তাঁদের সামনে থরথর করে কাঁপতে দেখা যায়।

কবি বলেন- [অর্থ :]

খোদা প্রেমিক কোনো দরবেশ যদি হয় সম্রাটদের মুখোমুখি,
তখন তাঁর দেহে পরিহিত চটের জাঁকজমক ও আড়ম্বরের প্রভাবে
প্রকম্পিত হয় তাদের রাজসিংহাসন
দরবেশ উন্মাদ হয়ে শহরে প্রবেশ করে
মজলুমকে উদ্ধার করে জালেমের জুলুম-শোষণ থেকে।
তার আত্মা আহার অর্জন করে আত্মশুদ্ধি ও ঐশী আকর্ষণ হতে
এবং সম্রাটদের সম্মুখে তাঁর শ্লোগান হয়
আল্লাহ ভিন্ন সম্রাট নেই।

আল্লাহর এই বান্দারা যেহেতু নিজেদের সত্তাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেন এবং যা কিছু করেন শুধু আল্লাহর জন্য করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে করেন, তাই আল্লাহ তাআলা তাঁদের কাজ ও পদক্ষেপকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে নেন এবং তাঁদের লাজ রক্ষা করেন। নিম্নের হাদিসে কুদসিতে এ অবস্থাই ব্যক্ত করা হয়েছে-

«كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا».

আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে এবং তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে। [সহিহ বুখারি, মুসনাদে আহমদ]

---

১. ২০২ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

এ হাদিসের অর্থ হলো, কোনো কোনো বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের স্তর অতিক্রম করতে গিয়ে এ পর্যায়ে পৌঁছে যান যে, তাঁদের চোখ ও হাত তাঁদের থাকে না। বরং তা যেহেতু শুধু আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই তাঁদের এসব শক্তি যেন আল্লাহর হয়ে যায়। এই অর্থে নয় যে, নাউজুবিল্লাহ তাঁরা আল্লাহ হয়ে যান বা আল্লাহ তাঁদের অংশ হয়ে যান।

তাঁরাই আল্লাহর বিশেষ বান্দা যাঁদের সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে- তাঁরা যদি আল্লাহর উপর কোনো শপথ করে বসেন, আল্লাহ তাঁদের শপথ পূর্ণ করেন। «لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

হায়! আমরা যদি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র এই মাকামের হাকিকত ও প্রকৃত অবস্থা, এর শক্তি ও মহত্ত্ব এবং এর দাবি ও পুরস্কারের সঙ্গে সামান্য পরিচিতও হতাম!

* * *

২০১ নং পৃষ্ঠার টীকা

জিহাদের জন্য শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি যথেষ্ট কি-না?

'এই মর্দে খোদা ও সহায়-সম্বলহীন দরবেশরা যাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ও অন্তরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই...' উক্তি থেকে আমি অনুবাদকের আশংকা হচ্ছে, সাধারণ পাঠক তা থেকে জিহাদের জন্য রুহানি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনকেই যথেষ্ট মনে করবে এবং দৈহিক ও অস্ত্রের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। অথচ এমন ধারণা সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতসহ বহু আয়াত ও হাদিসের পরিপন্থি। যেমন সুনানুত তিরমিজির একটি হাদিস হলো (হাদিস নং ২৫১৭)- اِعْقِلْهَا وتَوَكَّلْ প্রথম উট বাঁধো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।

অতএব বাহ্যিক শক্তি গ্রহণ না করে সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলায়, নিরস্ত্র মুমিনদের শুধু জায়নামাজ ও তাসবিহ নিয়ে বের হওয়া প্রভৃতি পদ্ধতিগুলো, আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলের সিরাত ও সুন্নাহের বিরোধী হওয়ার বিষয়টি আমাদের উপলব্ধিতে আসা জরুরি। ৬২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হজরত ফুজাইল বিন ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহর উক্তিটি স্মরণ রাখলে, ইসলামের নাহি আনিল মুনকারের জন্য আমরা কুফরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করব না ইনশাআল্লাহ।

নিম্নে খানকাহি জীবনে অভ্যস্ত মশহুর বুযুর্গ মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা.-এর ধারাভাষ্যে হজরত নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। তাতে আশা করি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের সঠিক অবস্থান পরিস্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশের ১৭-১৯ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ধারাভাষ্যে আদিব হুযুর লিখেন- (আমরা তাঁর সকল বানান অপরিবর্তিত রেখেছি।)

সবচে' ইতিবাচক প্রশ্ন হলো, এই পতন থেকে মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের উপায় কী? পতনের কান্না যেমন তিনি (হজরত আলি মিয়াঁ নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ) কেঁদেছেন, তেমনি উত্তরণের পথ ও পন্থাও তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায়-

لا يَنهَضُ العالَمُ الإسلامِيُّ إلَّا برسالته التي وَكَّلَها إليه نبيُّه الأمين، ولا ينهض العالَمُ الإسلامِيُّ بهذه الرسالة التي هي الدعوة إلى الله ورسوله إلا بقوة الإيمان، لا بقوة المادّة.

ইসলামী বিশ্বের উত্থানের কোন পথ নেই, সেই দাওয়াত ও পয়গামকে ধারণ করা ছাড়া, যা তাদের নবী আল-আমীন তাদের কাছে সোপর্দ করে গিয়েছেন। আর বস্তুগত কোন শক্তি দ্বারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে শুধু ঈমানের শক্তি দ্বারা।

এটা তো চির সত্য কথা! ঈমানই ছিলো আমাদের অতীতের শক্তি, ঈমানই হচ্ছে আমাদের বর্তমানের শক্তি এবং ঈমানই হবে আমাদের ভবিষ্যতের শক্তি। ঈমান ছাড়া আমাদের কোন শক্তি নেই, মুক্তিও নেই। এ কথা তিনি বলেছেন, তাঁর আগেও সবাই বলেছেন, এমনকি তাঁর সমকালেরও সবাই বলেছেন। এটা নতুন কথা নয়। তাঁর স্বকীয়তা এই যে, আধুনিক ও প্রাচীন উভয় সমাজকে চমকিত করে একটি নির্মম সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়-

إذا أرادَ العالَمُ الإسلامِيُّ أن يَعُود إلى قِيَادة العالَم مِن جديد فعَلَيْهِ أن يأخذ الاستعداد التامَّ في العلوم والصِّنَاعة والتجارة وفي فَنِّ الحرب، وأن يستغنِيَ عَنِ الغَرْب في كلِّ مَرْفَقٍ مِن مَرَافِق الحياة وفي كلِّ حاجة من الحاجات.

ইসলামী বিশ্ব যদি নতুনকরে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ফিরে যেতে চায়, তাহলে তার অবশ্যকর্তব্য হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জীবনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-নির্ভরতা পরিহার করা।

এটা ছিলো একেবারে নতুন কথা যা তাঁর পর্যায়ের কোন আলিম আগে বলেননি, অন্তত এমন করে বলেননি। তিনি আরো বলেছেন–

ومِن واجِبِ رجال التعليم والتربِيَة ووُلَاةِ الأمر أن يُرَبُّوا الشَّبِيبَةَ العربية على الفُرُوسِيَّة والحياة العسكرِيَّة على مَبْدَأ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «أَلَا إِنَّ القُوَّة الرَّمْيُ!»، «أَلَا إِنّ القوة الرميُ!».

শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা[১] তাদের কর্তব্য হলো আরবযুবশক্তিকে অশ্বচালনা ও সৈনিকতার উপর গড়ে তোলা এবং তা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান নীতিনির্ধারণী বাণীর ভিত্তিতে, 'শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি, শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি।'

এটাও একেবারে নতুন কথা, বিশেষ করে এ যুগের 'খানকাহি জীবনে অভ্যস্ত' কোন বুযুর্গের কলমে। তিনি আরো বলেছেন–

إذا أرادَ العالَمُ الإسلاميُّ أن يستأنِف حياتَه ويتحرَّر مِن رِقِّ غيرِه، وإذا كان يَطمَح إلى القيادة فلا بُدَّ إذًا مِن وَضْعِ منهاجٍ تعليميّ جديد يَجمَع بين مُحْكَمَاتِ الكتاب والسنة وبين العلوم العَصْرِيَّة النافعة، ولا بُدَّ له من تدوين العلوم العصرية على أَسَاس رُوْح الإسلام، ويجب على العالَم الإسلاميّ أَوَّلًا

---

১. 'রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা'-এর পরিবর্তে 'মুসলমানদের দায়িত্বশীল যারা' তরজমা করা হলে وُلَاةُ الأَمْرِ أَيْ أَمْرِ المسلِمِينَ শব্দ থেকে যেমন দূরে চলে যাওয়া হত না, তদ্রূপ জাতিসংঘের স্বীকৃত রাষ্ট্রসমূহের বাইরে যেসকল মুজাহিদিন মুসলমানদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ফিকহের পারিভাষিক অর্থে বিভিন্ন দারুল ইসলামের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, তাঁরাও وُلَاةُ الأَمْرِ-এর প্রতিপাদ্য হয়ে হজরত আলি মিয়াঁ নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হতেন। –ফুআদ।

وقبل كلِّ شيء أن يُخَلِّصُوا شبابهم من النظام التعليميّ الغربيّ الذي قد استَوْلَى اليوم على العالم الإسلاميّ كُلِّه.

ইসলামী বিশ্ব যদি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায় এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, সর্বোপরি যদি বিশ্বনেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতে চায়, তাহলে অবশ্যকর্তব্য হবে এমন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা কোরআন-সুন্নাহর অপরিবর্তনীয় বিধান এবং কল্যাণপূর্ণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। মুসলিমবিশ্বকে অবশ্যই ইসলামের প্রাণ-প্রেরণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। মোটকথা, ইসলামী বিশ্বকে প্রথমে এবং সবকিছুর আগে পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, যা সমগ্র মুসলিমবিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, তা থেকে তাদের যুবকদের উদ্ধার করতে হবে।

শহীদ সৈয়দ কুতুব এ গ্রন্থের ভূমিকায় ঠিকই বলেছেন, পাঠক হয়ত আশা করেননি যে, একজন আলিম, যিনি ইসালামের রুহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের জোরালো প্রবক্তা, তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ট আলোচনা করবেন এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পাশাপাশি শিল্প, প্রযুক্তি ও সমরশক্তি অর্জনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করবেন। সেই সাথে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনেরও আহ্বান জানাবেন এবং আহ্বান জানাবেন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের। কিন্তু পরম পরিতোষের বিষয় যে, এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চিন্তা থেকে বাদ পড়েনি।

[টীকা সমাপ্ত হয়েছে]

২০২ নং পৃষ্ঠার *** এর পর

তাওহিদের এ স্তর [অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া বান্দার কাঙ্ক্ষিত, প্রেমাস্পদ, উদ্দিষ্ট ও কাম্য কেউ থাকবে না–] যদিও সকলের জন্য ব্যাপক নয় এবং ঈমান, ইসলাম ও পরকালীন মুক্তিও এর উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা শুধু পরিপূর্ণ ঈমানের স্তর[১], যেমন হজরত

১. হজরত ইমামে রব্বানি এক চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেন– একাধিক উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং গায়রুল্লাহর উপাস্য হওয়ার অস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে, উদ্দিষ্ট

আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদিসের فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ। [সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে] শব্দ থেকেও স্পষ্ট হয়, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা বয়স ও জীবন নিঃশেষ করে এবং পৃথিবীর যাবতীয় স্বাদ ও আরাম চিরতরে বিসর্জন দিয়েও যদি অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহলে অনেক সস্তায় পাওয়া গেল। আর যারা তা অর্জন করে না, তারা বড় বঞ্চিত।

তবে এ পথের সাধকদের বক্তব্য হলো, যদি সত্যিকার অন্বেষণ বিদ্যমান থাকে এবং সঠিক পন্থায় চেষ্টা ব্যয় করা হয়, তাহলে তা খুব বেশি কঠিনও নয় যে, আমরা এর আশা এবং এর জন্য চেষ্টাও করতে পারব না। বরং উচ্চাভিলাষীদের জন্য পথ উন্মুক্ত আছে। আর সত্যিকার অন্বেষণকারীদেরকে স্বয়ং আল্লাহর রহমত নিজের দিকে টেনেই নেয়। ঐ দয়াবান মহান সত্তা নিজের দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন–

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾.

আর যারা আমার জন্য সাধনা করবে, অতি অবশ্যই আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেব আমার পথসমূহ। [সুরা আনকাবুত : ৬৯]

আরো ইরশাদ করেছেন–

﴿اللّٰهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ﴾.

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য নির্বাচন করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে নিজের নিকট নিয়ে যান। [সুরা শুরা : ১৩]

মোট কথা যদি সঠিক অর্থে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন হয় এবং চেষ্টা ও সাধনা পর্যাপ্ত ও সঠিক পদ্ধতিতে হয়, তাহলে বঞ্চিত থাকার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর নিয়মের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, যিনি বলেছেন–

তোমার হৃদয়ে একমাত্র আমাকেই স্থান দাও
এবং আমি ভিন্ন সবকিছু পরিহার করো;

হওয়ারও অস্বীকৃতি বিদ্যমান থাকা পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত, যা বেলায়েতের (আল্লাহর নৈকট্য লাভের) সাথে সম্পৃক্ত। [৩য় খণ্ড, চিঠি নং ১৩]

কোনো এক প্রভাতে আমার দ্বারে পৌঁছে যেও
তাতেও যদি না হয় কার্যসিদ্ধি, তাহলে অভিযোগ করো।

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের স্তরে পৌঁছার প্রাথমিক সিলেবাস

আপনার জন্য এই কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছার সঠিকতম পন্থা তো সেটাই হবে, যা এ স্তর সম্পর্কে অবহিত কোনো পথপ্রদর্শক আপনার জন্য নির্ণয় করবেন। তবে আমাদের মতো প্রাথমিক লোকদের জন্য একটি সাধারণ চেষ্টা, যাতে ইনশাআল্লাহ কোনো আশঙ্কা ও সংশয় নেই এবং যা এ পথের সাধকদেরই বাতানো ও লিখিত, তা হলো 'আল্লাহ ব্যতীত আমার উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত কেউ নেই'– এ হাকিকত ও বাস্তবতা স্মরণ রেখে এই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমারই বেশি বেশি জিকির করা। অর্থাৎ মুখে ও মনে সমস্বরে বারবার ও ধারাবাহিক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার সুর টানবে। 'আল্লাহ ব্যতীত আমার উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত কেউ নেই'– এই মর্ম স্মরণ রেখে করা এই জিকিরের আধিক্যের দ্বারাই ইনশাআল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকবে। আর আল্লাহর ইচ্ছা হলে তা উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

* * *

টীকা : ইমামে রব্বানি হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রাহিমাহুল্লাহ নিজের এক চিঠিতে লিখেন– এ সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহর পথের পথিক আপন অবস্থানুযায়ী 'আল্লাহ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত কেউ নেই' মর্ম স্মরণ রেখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা বারবার আবৃত্তি করবে, যেন অন্য কারো উপাস্য হওয়ার নাম-গন্ধও মনে না থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত কেউ না থাকে। [তৃতীয় খণ্ড, চিঠি নং ১৩]

তিনি আরও লিখেন– সর্বদা নফি-ইসবাতের (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর) জিকির করবে। এ কালিমার ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি দ্বারা মানসপট থেকে যাবতীয় চাহিদা মুছে ফেলবে, যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দিষ্ট, কাঙ্ক্ষিত ও প্রেমাস্পদ মনে না থাকে।

(**একটি সতর্কীকরণ :** উল্লিখিত 'এ স্তর সম্পর্কে অবহিত কোনো পথপ্রদর্শক' শব্দের সূত্র ধরে বর্তমান যুগের বিবেচনায় সীমাহীন

আফসোসের সাথে সতর্ক করতে হচ্ছে যে, কারো এমন স্তরে উপনীত হওয়া সম্পর্কে কিছু লোক দাবি করলেই কেউ যেন তার অন্ধ অনুকরণ শুরু না করে দেয়। কারণ বর্তমানে এমন লোককেও 'পিরে কামেল' বলা হয়, নামাজে জিহাদের আয়াত শুনলে যাদের খুশু-খুজু নষ্ট হয়ে যায়। এটা ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ মুফতি পির সাহেবের ঘটনা। তার এক ছাত্র ইমামতি করতে গিয়ে জিহাদের আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন। তখন নামাজ শেষে সে এ অভিযোগ করেছে।

'কুতুবে আলম' ও 'পিরে কামেল' খ্যাত আরেকজনের কিছু উক্তি নিম্নরূপ–

'আমি মুসলমান এবং কট্টর মুসলমান। কট্টরের ব্যাখ্যা কী? কট্টরের ব্যাখ্যা হলো, যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই-ই উদ্দেশ্য? জি-না। কট্টরের ব্যাখ্যা হলো, সকল মানুষকে সমান জ্ঞানকারী মুসলমান। সকলকে আদর ও সম্মানকারী মুসলমান। যত বড় আছেন, চাই শ্রী কৃষ্ণজী[১] হোক বা শ্রী রাম চন্দ্রজী[২] হোক, যদি কোনো মুসলমান তাদেরকে অনাদর করে অথবা তাদেরকে সম্মান না করে, তাহলে সে পাপী, মহাপাপী। মুসলমানের কর্তব্যের মধ্যে, মুসলমানের জন্য আবশ্যক, তাদেরকে ইজ্জত করবে, তাদেরকে সম্মান করবে, তাদেরকে মহব্বত করবে। টিচ [শিক্ষা] দেখুন, তালিমাত... আমরা উর্দুতে তালিমাত [শিক্ষা] বলি। তো তাদের শিক্ষা দেখুন। আপনি শ্রী রাম চন্দ্রজীর শিক্ষা দেখুন এবং হজরত মুহাম্মদ সাহেবের[৩] শিক্ষা দেখুন, যদি আপনি পার্থক্য পেয়ে যান... পাবেন না... তালাশ করতে থাকুন, পাবেন না।' [নাউজুবিল্লাহ]

হাদিস ও সিরাতের কিতাবসমূহে বর্ণিত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের জিহাদি জীবনকে অস্বীকার করে 'শায়খুল আরব ওয়াল আজম ও আওলাদে রাসুল' খ্যাত আরেকজন পিরে কামেলের প্রসিদ্ধ একটি উক্তি হলো– ধর্মের কারণে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে কখনো যুদ্ধ হতে পারে না। কোথাও ধর্মের নামে যুদ্ধ হয়ে থাকলে তা হয়েছে ধর্ম পালন না করার কারণে, ধর্মের কারণে নয়। ধর্মে ধর্মে কোনো শত্রুতা নেই। [নাউজুবিল্লাহ]

---

১. হিন্দুদের ভগবান।

২. হিন্দুদের ভগবান।

৩. এভাবেই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ব্যতীত।

নবির সঙ্গে সম্পর্কহীন নবি পরিবারের সদস্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি অনেক ফিতনার বিবরণ দিলেন। এমনকি চটের ফিতনার বর্ণনা দিলেন। একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! চটের ফিতনা কী? তিনি বললেন, তা এমন ফিতনা যার মধ্যে একজন অপরজন থেকে পলায়ন করবে এবং ব্যক্তির সম্পদ এমনভাবে অপহরণ করা হবে যে, তার নিকট কিছুই থাকবে না। তারপর স্বচ্ছলতার ফিতনা হবে। এ ফিতনার প্রকাশ আমার পরিবারের একজন ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে হবে। সে মনে করবে, সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথচ সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমার বন্ধু তো হলো মুত্তাকিগণ।[১]

এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। এ ধরনের উক্তি করার পর এ সকল পির সাহেবদের ঈমান-ইসলামের আর কতটুকু বাকি থাকে, তা চিন্তা করার বিষয়। উক্তিগুলোর সূত্র উল্লেখ করছি না। কারণ, থুতু যে আমার নিজের উপরই পড়বে! কথাগুলো 'মিথ্যা অভিযোগ' সাব্যস্ত হলে আমার ভালো লাগত। কারণ, তাতে আমার নিজেরও মান বাঁচত।

ইরতিদাদ [ইসলাম ধর্মত্যাগ] সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থাগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ' বইটির ১৩২-১৩৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওহিদের পূর্ণাঙ্গ স্তর অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন! –অনুবাদক।)

[টীকা সমাপ্ত হয়েছে]

২০৭ নং পৃষ্ঠার * * * এর পর

একটি সতর্কীকরণ

পূর্ণাঙ্গ তাওহিদের স্তরে পৌঁছার জন্য এখানে যা কিছু আরজ করা হলো, একে এই মহান উদ্দেশ্য তথা তাওহিদ ও ইখলাসের উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস মনে করা যাবে না। এ তো এ পথের কোনো কোনো পথপ্রদর্শক শুধু প্রাথমিক কাজ হিসাবে লিখেছেন। এতটুকু কাজ এ পথের সূচনা বৈ কিছু নয়।

---

১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬১৬৮ ও সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৪৪।

CamScanner

এ পথ অতিক্রম করার জন্য সাধারণত ইখলাসওয়ালা আল্লাহর কোনো বান্দার নির্দেশনা ও দেখভালের প্রয়োজন হয়-ই। তিনিই পথিকের অবস্থা লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক ছাউনি ও মঞ্জিলে সঠিক পরামর্শ দিতে সক্ষম। বরং এ বিষয়ের ইমামগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য ও ইখলাসের স্তর অর্জনের ক্ষেত্রে জিকিরের যে প্রভাব রয়েছে, তা-ও [বিভিন্ন কারণে, যার বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এটা নয়] পবিত্রাত্মা কোনো সাধকের নির্দেশনা ও দেখভালের কারণে এবং তাঁর সোহবত ও সংশ্রবের বরকতে অধিক শক্তিশালী হয়ে যায়, যদিও এর কারণে জিকিরের পরকালীন ছওয়াবে কোনো বিশেষ কম-বেশি হয় না।[২]

মোট কথা এ পথে রাস্তার হালচিত্র ও মাইলফলক সম্পর্কে অবহিত আল্লাহর কোনো বান্দার সংশ্রব ও নির্দেশনা, সাধারণ অবস্থায় প্রায় অত্যাবশ্যকীয় জিনিসসমূহের-ই অন্তর্ভুক্ত। এ পথের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বর্ণনানুযায়ী এ ছাড়া 'প্রকৃত ইখলাস' অর্জন ও তার উপর অবিচলতা লাভ বিশেষতর ব্যক্তিদেরই অংশ ও ব্যতিক্রম বিষয়।

কবি সত্য বলেছেন- [অর্থ :]

ইশকের ছোঁয়া ব্যতীত দীন হয় না সুসংহত,
অতএব আশেকদের সংশ্রবে থেকেই অর্জন করো দীন;
কারণ, তাঁর বাহ্যিক অবস্থা হলো আগুন ও জ্বলন;
আর অভ্যন্তর তার রাব্বুল আলামিনের নুর।

(ইকবাল)

২. দেখুন, 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি' ৩য় খণ্ড, চিঠি নং ২৫

হাদিসের আলোকে কালিমার ফজিলত ও গুরুত্ব

এ পর্যন্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ, তাওহিদের বিভিন্ন স্তর ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিকের আলোচনা ছিল। এখন পরিশেষে এ পবিত্র ও বরকতময় কালিমার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে এ কালিমার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত কেউ হতে পারে না–

১. প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ হাদিসের অনেক কিতাবে হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি বহুল প্রচলিত হাদিসের প্রথমাংশ নিম্নরূপ–

«الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"».

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।

২. মুসনাদে আহমদ ও মুজামে তাবারানিসহ হাদিসের অনেক কিতাবে হজরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদিসও বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ»، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ : «أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"».

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা নিজেদের ঈমান নবায়ন করতে থাকো। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কিভাবে আমাদের ঈমান নবায়ন করব? তিনি ইরশাদ করলেন– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বেশি বেশি বলো।[১]

১. কালিমা উপকারী হওয়ার জন্য তা মুখে যেমন বলতে হয়, অন্তরেও উচ্চারণ করতে হয়। অন্তরের উচ্চারণের ব্যাখ্যা জানার জন্য পুস্তিকার শুরুতে ১৮৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। –অনুবাদক।

৩. সুনানে নাসায়ি ও সুনানে ইবনে মাজাহসহ হাদিসের অনেক কিতাবে হজরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«أَفْضَلُ الذِّكْرِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"».

জিকিরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

৪. নাসায়ি, হাকিম ও বায়হাকিসহ অন্যান্য ইমামগণ হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেছেন, যার শেষাংশ হলো, আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেছেন-

«لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِيْ كِفَّةٍ، وَ"لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" فِيْ كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِمْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"».

যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ওয়ালা পাল্লা তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে পড়বে।

দ্বিতীয় অংশ : রিসালাতে মুহাম্মদি

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

[মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল]

রিসালাতে মুহাম্মদি

তাওহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর ঈমান আনয়ন করা ও এর সাক্ষ্য দেয়া।

ঈমানদীপ্ত ও ঐতিহাসিক ৬টি বাস্তবতা

রিসালাতের তাৎপর্য ও নবুয়তের পদমর্যাদা বোঝার জন্য, বিশেষত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ক্ষেত্রে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সে বিষয়ে অবগতি লাভের জন্য, নিম্নোক্ত কথাগুলো মনে গেঁথে নেয়া উচিত।

১. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আমরা তাওহিদের সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। সাথে সাথে নিজেদের এ বিশ্বাস ও ঈমানের ঘোষণা এবং এ বাস্তবতা স্বীকার করেছিলাম যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা আমাদের মাবুদ ও উপাস্য। সুতরাং আমরা শুধু এবং শুধু তাঁরই ইবাদত করব। তিনিই আমাদের মনিব ও প্রকৃত মালিক। সুতরাং তাঁর এবং একমাত্র তাঁরই নির্দেশানুযায়ী চলব। তিনিই আমাদের উদ্দিষ্ট ও কাম্য। তাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করব। তাঁর জন্যই জীবন ধারণ করব এবং তাঁর জন্যই মৃত্যুবরণ করব।

২. কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এ সকল কিছু মোটেই সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হব; তাঁর সে সকল বিধানের জ্ঞানও অর্জন করব, যেগুলোর উপর তিনি আমাদেরকে পরিচালিত করতে চান; তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মূলনীতি ও মাধ্যমসমূহও জেনে নেব এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ের সাথেও পরিচিত হব।

আমাদের এ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে নবুয়ত ও রিসালাতের পবিত্র ধারা চালু

করেছেন; এবং উল্লেখিত বিষয়গুলোর শিক্ষাদান ও নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে তাঁর নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন।

নবি-রাসুলগণ নিজ নিজ যুগে নিজেদের জাতির সামনে আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাওহিদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি এবং ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন। উপরন্তু আল্লাহর ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি তাদেরকে জানিয়েছেন। লেনদেন ও সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়ের হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলি তাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উপায়সমূহ স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের সকলের উপর।

৩. কিন্তু আজ থেকে দু-আড়াই হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী জাতিগুলো যেহেতু একে অপর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নিজ নিজ এলাকায় আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ ছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আসা-যাওয়া ও মেলা-মেশার যে সকল পদ্ধতি পরবর্তীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখনো পর্যন্ত সেগুলো আবিষ্কার হয়নি, যার কারণে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী জাতিগুলোর স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণে অস্বাভাবিক পার্থক্য ছিল, তাই তখন পর্যন্ত যে সকল নবি-রাসুল আগমন করতেন, তাঁরা সাধারণত নিজ নিজ এলাকা এবং নিজ নিজ জাতিরই হেদায়েতের জন্য আগমন করতেন।

তাছাড়া তখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতাও ছিল অসম্পূর্ণ, মানবতা যেন তখনও নাবালেগ ও শৈশবকালে ছিল এবং পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন ধারণ করার যোগ্য হয়ে উঠেনি, তাই সেসকল নবি-রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেসব বিধান ও সংবিধান প্রেরণ করা হতো, তাতে তাদের বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি, তাদের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতার প্রতিও খেয়াল রাখা হতো। তাই তাদের শরিয়তসমূহে হুকুম-আহকামের পরিমাণ,

বিবরনের সংক্ষিপ্ততা ও বিশ্লেষণ এবং কঠোরতা ও কোমলতার ক্ষেত্রে পরস্পর কিছু পার্থক্যও হত।

নবুয়ত ও রিসালাতের এ ধারা অব্যাহত থাকে, আর আল্লাহই জানেন, তাঁর পক্ষ থেকে কতজন নবি কোন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন সময় আগমন করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন নবির নাম ও তাঁদের কিছু অবস্থা ও ঘটনাও পবিত্র কোরআনে আমাদের জানানো হয়েছে। সাথে সাথে একথাও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাঁদের ছাড়াও আরো অনেক নবি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমরা সকল নবি ও রাসুলকে সত্য মনে করি। তাঁদের পথনির্দেশিকা ও নবিসুলভ চেষ্টা-সাধনা স্বীকার করি এবং তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব জ্ঞান করি। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের সকলের উপর।

৪. আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর হাজার হাজার পয়গম্বরের শিক্ষা-দীক্ষার পরিণতিতে এবং স্বভাব ও প্রকৃতির হাজার হাজার বছরের ক্রমোন্নতির পর, যখন মানুষের আভ্যন্তরীণ সেসকল যোগ্যতা পূর্ণ হয়ে গেল, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দীন ও শরিয়তের বিধান পালনের আদিষ্ট বানিয়েছেন; অন্য ভাষায়– মানবতা যখন নিজ ধর্মীয় যোগ্যতার বিচারে বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছে, অপরদিকে প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলা সে যুগেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিচিতি লাভ ও মেলা-মেশার এমন উপায়-উপকরণও সৃষ্টি করা শুরু করে দিয়েছেন, যার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং এক দেশের আওয়াজ অন্য দেশ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হওয়ার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হয়ে গেছে; মোট কথা এভাবে যখন পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে বিভক্ত সেই পৃথিবী 'এক পৃথিবী' হয়ে গেছে, তখন সমগ্র পৃথিবীর জন্য একই পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দীন এবং একই আইন ও সংবিধান প্রণয়ন

করার এবং সকল দেশ ও সকল জাতির জন্য একই রাসুল প্রেরণ করার সময় এসে গেছে।

৫. এই স্বভাবগত চাহিদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রীয় শহর পবিত্র মক্কায়[১] দু-জাহানের শ্রেষ্ঠমানব রহমতে আলম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রাসুল ও সকল জাতির পথপ্রদর্শক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। এবং নির্দেশ জারি করেছেন, তিনি যেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেন–

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

আপনি বলুন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর [প্রেরিত] রাসুল, আসমান ও জমিনের রাজত্ব যার। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি, যিনি নিরক্ষর নবি, যিনি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান রাখেন। এবং তাঁর অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও। [সুরা আরাফ : ১৫৮]

আর মানবতা যেহেতু নিজ ধর্মীয় যোগ্যতার বিচারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল[২] এবং তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন ধারণ করার যোগ্যতা এসে গিয়েছিল, তাই সেই নিরক্ষর নবির শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত পূর্ণতাও দান করা হয়েছে এবং ঘোষণা এসেছে–

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾.

১. ২১৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।
২. ২২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।[৩] [সুরা মায়িদা : ৩]

৬. দীনের এই পূর্ণতার পর আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি এটাও হয়েছে যে, এই দীনকে সর্বকালের জন্য বিকৃতি ও মিশ্রণের যাবতীয় প্রকার হতে সংরক্ষিত করে দেওয়া হোক। এবং এ সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক যে, পৃথিবী সর্বকালে তা থেকে আলো পেতে থাকবে। তাই আল্লাহর কুদরত এমন উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, যার ফলে এই শেষ পূর্ণাঙ্গ দীন ও এর কিতাব পবিত্র কোরআন সর্বকালের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে।[৪] এবং কোনো মিশ্রণ, কোনো পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের ছিদ্রপথ অবশিষ্ট রয়নি। এই সংরক্ষেণের দায়িত্বের ঘোষণা পবিত্র কোরআনেও বলে দেওয়া হয়েছে–

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

নিশ্চয় আমিই অবতীর্ণ করেছি জিক্‌র [কোরআন] এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। [সুরা হিজর : ৯]

এর দ্বারা আপনি এ কথাও হয়ত বুঝে নিয়েছেন যে, দীন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতাও লাভ করেছে এবং সংরক্ষিতও হয়ে গেছে, তখন পৃথিবীর আর নতুন কোনো নবুয়ত ও নতুন কোনো সংবিধানের সামান্যতম প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। অতএব মুহাম্মদি নবুয়তের পর নবুয়তের প্রত্যেক দাবি নিরেট মিথ্যা ও আল্লাহর উপর অপবাদ।

৩. ২২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।
৪. ২২১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

২১৭ নং পৃষ্ঠার ১ম টীকা

সর্বকালের ও সমগ্র পৃথিবীর নবিকে আরব দেশে প্রেরণ করার কারণ

আপনি দেড় হাজার বছর পূর্বের পৃথিবীর মানচিত্র ও তৎকালীন বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সামনে রাখুন। তাহলে অতি সহজে এ কথা আপনার অনুবাধন করা সম্ভব হবে- সমগ্র পৃথিবীর নবি হওয়ার জন্য আরবের একজন ব্যক্তিকে কেনো নির্বাচন করা হলো। নিম্নোক্ত বাস্তবতাসমূহ একটু চিন্তা করুন-

১. আরব দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার সম্পূর্ণ মধ্যমণিতে অবস্থিত। ইউরোপও সেখান থেকে নিকটেই, বিশেষত ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল যেখানে তৎকালীন সভ্য জাতিগুলোর অধিকতর বসতি ছিল আরব থেকে প্রায় ততটুকুই দূরত্বে, যতটুকু দূরত্বে ভারতবর্ষের অবস্থান। মোট কথা প্রথমত তো এই বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিশ্বব্যাপী নবুয়তের জন্য তখন আরবই সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান হওয়া সম্ভব ছিল।

২. দ্বিতীয়ত এ বাস্তবতাও অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন সকল জাতির মধ্যে আরব জাতির মাঝেই এমন কিছু স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণ ছিল, যা এত বড় কর্মের জন্য প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাদের মন ও মস্তিস্ক ছিল স্বচ্ছ এবং তাদের জীবন ছিল সহজ-সরল। কোনো দর্শন, কোনো চিন্তাধারা ও কোনো সভ্যতার শিকড় তাদের মন ও মস্তিস্কের ভূমিতে বদ্ধমূল ছিল না, যেগুলো অঙ্কুরে বিনাশ বা মূলোচ্ছেদকরত সেখানে নতুন দর্শন ও নতুন সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর রাখা কঠিন হবে।

উপরন্ত এ জাতি কোনো রাজনৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে এবং দাসত্বের বাতাস থেকেও মুক্ত থাকার ফলে, ছিল অত্যন্ত সাহসী, অত্যধিক দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের অধিকারী, অতীব আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, জন্মগত বীর। যারা নিজেদের কথা টিকিয়ে রাখার জন্য নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে অসংখ্য ও অগণিত বিষয় জলাঞ্জলি দিত। যারা ছিল কঠিন ও অবিরাম পরিশ্রমী। যারা সমস্যা-সংকটে ভ্রু পর্যন্ত কুঞ্চিত করত না এবং নিজেদের স্বভাবে ধারণ করত অত্যন্ত উপযোগী ও ঝকঝকে মণিমুক্তা। ইতিহাস এসব বাস্তবতার সাক্ষী। আর ইসলাম গ্রহণের পর আরবরা পৃথিবীতে যা কিছু করে দেখিয়েছে, তা আমাদের এ আলোচনার উজ্জ্বল প্রমাণ।

৩. তাছাড়া এ জাতির কাছে অত্যন্ত সুউচ্চ, উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি ভাষা ছিল, যা বিশ্বব্যাপী সংস্কারমূলক কোনো বিপ্লবের মাধ্যম হওয়ার জন্য তখনকার অন্যান্য ভাষার তুলনায় অধিক যোগ্য ছিল। আজও তার সেই বৈশিষ্ট্য হুবহু বিদ্যমান আছে। কোনো অনারবের জন্য তো আরবি ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের সঠিক অনুমান করা কঠিন হবে। কিন্তু আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ কথা জানেন যে, এ ভাষায় কি সীমাহীন শক্তি রয়েছে এবং কোনো মিশনের মুখপাত্র ও প্রচারমাধ্যম হওয়ার কত উঁচু যোগ্যতা রয়েছে।

মোট কথা এগুলো এমন কিছু কারণ, যা সামনে রেখে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারে, বিশ্বব্যাপী নবুয়তের জন্য তখন আরব দেশ ও আরব জাতিই নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল।

২১৭ নং পৃষ্ঠার ২য় টীকা

পরবর্তী যুগসমূহে, বিশেষত ইউরোপের চলতি নব জাগরণের যুগে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন-আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইউরোপে যে সকল উন্নতি সাধিত হয়েছে, এর কারণে কারো এই ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, 'মানবিক যোগ্যতা' ধারাবাহিক উন্নয়নশীল। কারণ, এ উন্নতি বস্তুত আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতার উন্নতি এবং এর সম্পর্ক বস্তুজগতের সাথে। আর আমাদের আলোচনা যে যোগ্যতা নিয়ে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি জানে যে, ইউরোপ এ ক্ষেত্রে এক ইঞ্চিও উন্নতি করেনি।

২১৮ নং পৃষ্ঠার ৩য় টীকা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন

পবিত্র কোরআনের এই ঘোষণা ও দাবি থেকে দৃষ্টি এড়ালেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন হওয়া এবং যুগ ও দেশ নির্বিশেষে সর্বকালের ও সর্বস্থানের মানুষের হেদায়েত ও নির্দেশনার জন্য ইসলামের গ্রন্থ পবিত্র কোরআন যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হওয়া, এমন এক স্পষ্ট, দৃশ্যমান ও অভিজ্ঞতার বিষয় যে, কোনো শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

এ যাবৎ কত বিপ্লব এসেছে! কত দর্শন, মতবাদ, আইন-কানুন ও সংবিধান তৈরি হয়েছে ও বিলুপ্ত হয়েছে এবং পৃথিবী সেগুলোকে সেকেলে ও অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করে বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে! কিন্তু নিরক্ষর নবির পেশকৃত

ইসলাম ও এর গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ আপনাবস্থায় বহাল রয়েছে। আজ তের শতাব্দী [এখন বলতে হবে– চৌদ্দ শতাব্দী] অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এর প্রখর ও ধীমান কোনো শত্রু এর কোনো একটি নির্দেশেও সামান্য পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারেনি।

ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গতা ও অপরিবর্তনশীল হওয়ার পক্ষে এর চেয়েও বড় প্রমাণ এই যে, এর প্রত্যাখ্যানকারীরাও ধীরে ধীরে এর মূলনীতিগুলো গ্রহণ করে চলছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। অন্যথায় বলা যেত যে, ইশ্বরবাদ থেকে আরম্ভ করে লেন-দেন ও সামাজিক আচার-আচরণ পর্যন্ত আজকের 'উন্নয়নশীল [?] জাতিসমূহ' কিভাবে ইসলাম বৃক্ষের গুচ্ছ থেকে আহরণ করছে এবং কত দ্রুত ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো আপন করে নিচ্ছে!

বাস্তবতা হলো, ইসলাম তথা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ইসলাম যদি পৃথিবীর কোনো একটি ভূখণ্ডেও বাস্তবরূপে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হত, অর্থাৎ ইসলামের ব্যক্তিগত ও সামাজিক যাবতীয় বিধান এবং শিক্ষা ও নির্দেশনার বাস্তবরূপ যদি কোথাও দেখানো সম্ভব হত[১] তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বহু ক্ষমতাসীন জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে যাওয়ার মধ্যেই নিজেদের এবং পুরো মানবতার মুক্তি মনে করত। হায়! মুসলমান ও মুসলমানদের সরকারগুলো যদি নিজেদের এ মর্যাদা ও এ বিশেষ দায়িত্ব অনুধাবন করত!

২১৮ নং পৃষ্ঠার ৪র্থ টীকা

কোরআন ও ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ

পবিত্র কোরআনের এই সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ এমন এক মোজেজা, যা ইসলাম অস্বীকারকারীদের জন্য আজও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় দলিল ও অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান।

একটু চিন্তা করুন তো, পবিত্র কোরআনের বর্ণনারীতি সাধারণ মানুষ বরং স্বয়ং আরবদের বর্ণনারীতি থেকেও ব্যতিক্রম ও অনন্যসাধারণ। আর যে জাহিলি পরিবেশ ও অন্ধকার পারিপার্শ্বিকতায় তা অবতীর্ণ হয়েছে,

---

১. পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

তাতে তার আলোচ্য বিষয়সমূহও ছিল মানুষের জন্য অদ্ভুত, যার সাথে তারা সামান্যও পরিচিত ছিল না।

তাছাড়া যে সত্তার উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি ছিলেন 'নিরক্ষর'- লেখাপড়ার সঙ্গে ছিলেন অপরিচিত। স্বয়ং কোরআনের বর্ণনানুযায়ী مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ তাঁর অবস্থা। অর্থাৎ তিনি তাঁর কলমে একটি লাইন বরং একটি শব্দ লিখতেও সক্ষম নন। তাছাড়া তাঁর যখন কিছু লেখানোর প্রয়োজন হত, অন্যদের দ্বারাই লেখাতেন।

অন্যদিকে পবিত্র কোরআন পাঁচ-দশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র কোনো পুস্তিকা নয়। বরং যথেষ্ট বড় গ্রন্থ। আর সে যুগে ছাপাখানাও ছিল না যে, কোনো বই একবার ছাপা হলে তা সংরক্ষিত হয়ে যাবে। বরং অবস্থা তো এই ছিল যে, যে দেশ ও জাতির মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনও ছিল অনেক কম। তাই এমনও হয়নি যে, এর অনেক পূর্ণাঙ্গ কপি নববি যুগে তৈরি হয়ে গেছে।

মোট কথা যে গ্রন্থের ইতিবৃত্ত এই এবং যা সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ থেকে এ পরিমাণ রিক্তহস্ত, সে গ্রন্থ এভাবে সংরক্ষিত থেকে যাওয়া যদি মোজেজা, অলৌকিক ও আল্লাহর শক্তির বিশেষ কৃতিত্ব ও নিদর্শন না হয়ে থাকে, তাহলে আর কী হবে?

২২১ নং পৃষ্ঠার টীকা

জিহাদ আগে, না খেলাফত প্রতিষ্ঠা আগে?

যে 'ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থা' ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও বিধানের বাস্তব রূপ আল্লাহর জমিনে কার্যকর করবে, তা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একজন আলেমের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি এখানে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা' থেকে প্রকাশিত একটি পারচায় জিহাদ ও খেলাফত উভয়টির জন্য অভিন্ন শর্তের কথা বলা হয়েছিল। সে সূত্র ধরে উক্ত আলেম লিখেছেন-

জিহাদকে কেনো খেলাফতের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে বা কেনো এ দুটোর শর্ত বা সামর্থ্যকে এক করা হচ্ছে, তা বোধগম্য নয়। জিহাদ শুরু

করার শক্তি থাকলে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে পরে জিহাদ করতে হবে, একথা আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। জিহাদ করার সামর্থ্য থাকা মানেই কি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য থাকা? যার জিহাদ করার সামর্থ্য আছে, তাকে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা জিহাদ শুরু করার শর্ত পূরণ হওয়ার অর্থই হলো খেলাফত প্রতিষ্ঠার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা, এটা কি শরিয়তের বক্তব্য? শরিয়ত কি এটা জরুরি সাব্যস্ত করে?

বর্তমানে অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে, এর জন্য কোনো শর্ত নেই। বর্তমানের অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ। এমতাবস্থায় 'খেলাফত প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য নেই অথচ জিহাদ করার সামর্থ্য আছে' বলে বিস্ময় প্রকাশ করার কি অর্থ হতে পারে?

শত্রুপক্ষ যখন একটি ইসলামি খেলাফতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তখন মুসলমানদের তাৎক্ষণিক ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে, জিহাদের মাধ্যমে সে ইসলামি খেলাফতকে উদ্ধার করা। এখানে স্বভাবসম্মত পদ্ধতিটি কী? জিহাদের জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে? নাকি খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করবে?

আমরা যা বুঝি তা হলো, দীন কায়েমের প্রচেষ্টা শুরু হবে দাওয়াত ও জিহাদ দিয়ে।[১] ধাপে ধাপে এর মাধ্যমে দীনের শত্রুদের আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার পর আসবে খলিফা নির্ধারণ করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়।

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি ও মুহাম্মদ কাসেম নানুতবি রাহিমাহুমাল্লাহ খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? সাইয়েদ আহমদ বেরেলভি ও শাহ ইসমাঈল শহিদ রাহিমাহুমাল্লাহ খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে হোসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহুসহ আরো যারা জিহাদ করেছিলেন, তাঁরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এসব জিহাদে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছিলেন কেন? ...

১. ২৫৪-২৫৭ নং পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই কি খেলাফতের বিরোধী শক্তিগুলো বাধা দেবে না? তারা যখন বাধা দেবে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ছাড়া আর কী ব্যবস্থা আছে? খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই তো এর আগে জিহাদ লাগবে। একটি বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে গেলে আগে জিহাদ হবে, না কি আগে বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার হবে?

আলোচ্য আলেমের বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। শুরুতে উল্লিখিত খণ্ডনকৃত অবস্থান 'মারকাযুদ দাওয়াহ'-র হলেও, ব্যক্তিগতভাবে মারকাযের আমিনুত তালিম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক [হাফিজাহুল্লাহ]-এর অবস্থান সম্ভবত ভিন্ন। কারণ তিনি তাঁর প্রবন্ধসমগ্রে লিখেছেন–

'প্রত্যেক মুসলিম দেশের সরকার এবং প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রসংঘকে জিহাদের এ সবক পুনরায় ইয়াদ করা অপরিবহার্য, যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগ্রহী হন এবং দুনিয়া থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন।

জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। কেননা যদি তাদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া হয় এবং জিহাদের সুন্নত পুনরায় জীবিত না করা হয়, তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকি থেকে যায়। কী দায়িত্ব বাকি থাকে? এর উত্তর পাওয়া যাবে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) শাহ ইসমাঈদ শহীদ (রহ.) এবং সালাফ ও খালাফের এ প্রকৃতির জানবায মুজাহিদগণের জীবনীতে।' ['নির্বাচিত প্রবন্ধ-২', প্রকাশকাল ২০১৬ ঈ., পৃ. ৪০৩-৪০৪ দ্রষ্টব্য।]

[টীকা সমাপ্ত হয়েছে]

২১৮ নং পৃষ্ঠার পর

যেসকল ঈমানদীপ্ত ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা ৬টি পয়েন্টে উপরোক্ত প্রাথমিক আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে –যা যুক্তি ও বর্ণনা উভয় দৃষ্টিতে প্রমাণিত ও মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক– সেগুলোর ফলাফল ও সারকথা এই যে–

আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়েত ও দিকনির্দেশনার জন্য এবং তাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলি ও পছন্দের বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত

করার উদ্দেশ্যে, নবুয়তের যে ধারা পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে চালু করেছিলেন, আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পবিত্র ও বরকতময় ধারার সর্বশেষ হাতল; অথবা স্বয়ং নিজের পেশ করা উদাহরণ অনুসারে নবুয়তের প্রাসাদের শেষ ইট; আল্লাহ তাআলার নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি ও তাঁর মর্জির যথার্থ মুখপাত্র। তাঁর বার্তা আল্লাহরই বার্তা এবং তাঁর নির্দেশনা আল্লাহরই নির্দেশনা। অতএব তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ হুবহু আল্লাহর অনুকরণ ও অনুসরণ এবং তাঁর নাফরমানি ও অবাধ্যতা আল্লাহরই অবাধ্যতা ও নাফরমানি। কারণ, তিনি যা কিছু বলেন, আল্লাহর পক্ষে থেকেই বলেন এবং তাঁর নির্দেশাবলিই পৌঁছান।

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ﴾.

যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। [সুরা নিসা : ৮০]

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى﴾.

আর তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে [কিছু] বলেন না। [যে নির্দেশনা তিনি দান করেন] তা তো ওহিই, যা [তাঁর নিকট] প্রেরণ করা হয়। [সুরা নাজম : ৩]

কবি বলেন– [অর্থ :]

তাঁর বক্তব্য আল্লাহরই বক্তব্য

যদিও তা নির্গত হয় আল্লাহর বান্দার কণ্ঠ হতে।

এ পর্যন্ত যা কিছু পেশ করা হলো, আপনি যদি এর আলোকে রিসালাতের প্রকৃত তত্ত্ব, তার উদ্দেশ্য ও পদমর্যাদা বুঝে নিয়ে থাকেন, তাহলে এ বাস্তবতা এমনিতেই আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে, কাউকে আল্লাহর রাসুল মেনে নেওয়া ও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী এবং এর কারণে ব্যক্তির উপর কী কী দায়িত্ব বর্তায়। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের বর্তমান উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতির দিকে লক্ষ্য করে পরিষ্কার ভাষায় কিছু বলে দেওয়া আবশ্যক মনে হচ্ছে।

কাউকে 'রাসুল' মানার অর্থ ও এর অনিবার্য দাবিসমূহ

আপনি যখন কাউকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনে নিয়েছেন এবং এর সাক্ষ্য দিয়েছেন, তখন আপনি বস্তুত নিজের জন্য এবং আপনার মতে সমগ্র পৃথিবীর জন্য অনেক বড় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সেগুলো এমন সিদ্ধান্ত যে, এর চেয়ে বড় এবং এর চেয়ে অধিক বিপ্লবী কোনো সিদ্ধান্তের কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আপনি যেন আপনার মন-মস্তিস্ক ও মুখে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছেন যে-

১. বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও অস্তিত্বজগতের আবিষ্কারক আল্লাহ সম্পর্কে, পৃথিবীর সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে এবং আসমান-জমিন ও এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে সেই নবি ও রাসুল যা কিছু বলেন, তা-ই এবং শুধু তা-ই হক ও সত্য। কেননা তিনি নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার উপর ভিত্তি করে বলেন না। বরং সবজান্তা ও সর্বজ্ঞাত মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। সারা পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও লেখকরাও যদি এর বিপরীত বলে বা বলতে থাকে, তাহলে সেগুলো বাতিল, অসার, মিথ্যা ও অন্ধের অনুমানমাত্র।

২. তিনি যে সকল অদেখা ও অশ্রুত বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেন, উদাহরণস্বরূপ ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং তাঁদের গুণাবলি ও কার্যাবলির সংবাদ; অথবা কেয়ামতের আগমন, এরপর হাশর-নশর, তারপর পরকালে হিসাব-কিতাব এবং শান্তির ও শাস্তির সংবাদ; অথবা জান্নাত ও জাহান্নাম বিদ্যমান থাকা, জান্নাতের রকমারি নেয়ামত ও জাহান্নামের বিভিন্ন ধরনের কষ্টদায়ক শাস্তি হওয়ার কথা যে ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে তিনি বর্ণনা করেন; সেগুলো সবই সত্য, কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয় ব্যতিরেকে তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। কেননা এ সব কথা তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলেন। অতএব নিশ্চিতভাবে তাঁর থেকে প্রমাণিত কোনো কথা মেনে নিতে কেউ যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে ঈমান ও পরকালীন মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩. এমনিভাবে ইবাদত-বন্দেগি বিষয়ে, আচার-ব্যবহার বিষয়ে এবং সভ্যতা ও সামাজিকতা বিষয়ে তিনি যে সকল বিধান দিয়েছেন; অনুরূপভাবে রাজনীতি ও বিশ্ব-পরিচালনা সম্বন্ধেও তিনি যে সমস্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন করেছেন; মোট কথা মানব জীবনের সকল অঙ্গনে তাঁর যে সকল শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে; সেগুলো সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল রাখা ও কার্যকর করা আবশ্যক।

সেগুলোর বিপরীত যে সকল নিয়ম-নীতি চালু রয়েছে, তা আমাদের ঘর ও পরিবারে চালু থাকলেও; আমাদের বাপ-দাদাগণ চালু করলেও; এবং পৃথিবীর তথাকথিত সবচেয়ে উন্নত জাতি অথবা স্বয়ং আমাদের জাতি ও আমাদের সরকার আপন করে নিলেও, সর্বাবস্থায় সেগুলো ভুল এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। তাই তা বর্জনীয়, বরং ঠুনকো ও ভঙ্গুর।

মোট কথা কাউকে 'আল্লাহর রাসুল' মেনে নেওয়া বাহ্যত যদিও একটি সংক্ষিপ্ত কথা, কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নিহিত রয়েছে নিজের সত্তা ও সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে উপরোক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য নিজের মুখে প্রদান করে এবং এ ভিত্তিতে নিজেকে ঐ নবির উম্মত বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তার অন্তর এ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়, সে মূলত বড় প্রতারণার শিকার এবং রিসালাত ও নবুয়তের অর্থই বুঝেনি!

কোনো নবি ও রাসুলের নবুয়ত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনয়নের অর্থই তো হলো, আমি তাঁর প্রত্যেক শিক্ষা ও উপদেশকে সত্য এবং এর বিপরীত প্রত্যেক চিন্তাধারা, রীতি-নীতি ও সংবিধানকে ভুল ও বাতিল বলে মেনে নিয়েছি এবং আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসসমূহ জানার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে নিজের এমন পথপ্রদর্শক ও দিশারি বলে স্বীকার করে নিয়েছি, যার আনুগত্য করা আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

অতএব নয়, আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক বানাবে। তারপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা পাবে না এবং [তা] মেনে নিবে মেনে নেওয়ার মতো। [সুরা নিসা : ৬৫]

মোট কথা নবি ও রাসুলের শিক্ষা ও নির্দেশিকা সামনে এসে যাওয়ার পর ঈমানদারের জন্য চিন্তা-ফিকির, প্রাধান্যদান ও নির্বাচনের আর অবকাশ থাকে না। বরং তাঁর কাজ শুধু মেনে নেওয়া এবং তা বাস্তবায়নে লেগে যাওয়া। আর এ মান্য করাও নিছক আইনগত ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতির নয়। বরং তা হতে হবে, মনে-প্রাণে এবং হৃদয়-মন উজাড় করে। এটাই ঈমানের শর্ত।

নবি ও রাসুলের পদমর্যাদা দুনিয়ার সাধারণ সংস্কারক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মত নয় যে, তাঁদেরকে নেতা ও সংস্কারক বলে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কোনো কথা আপনার দৃষ্টিতে সময়-চাহিদার পরিপন্থী বা ভুল দৃষ্টিগোচর হলে, আপনার তা না মানার অবকাশ থাকবে। বরং রাসুলের পদমর্যাদা হলো, তিনি আল্লাহর সত্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি, যেমনটি পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, তিনি যে নির্দেশনাই প্রদান করেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদান করেন। তাই নিজের মতামত, আবেগ, পছন্দ ও চাহিদাকে তাঁর হুকুমের গোলাম ও আদেশের অধীন বানিয়ে দেওয়া ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত।

তবে এর অর্থ কস্মিনকালেও এই নয় যে, ইসলাম মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে সম্পূর্ণ অকেজো সাব্যস্ত করে নবি-রাসুলগণের কথা-বার্তা এমনিতেই মেনে নিতে বাধ্য করে। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতি রয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ইসলাম বলে, তুমি নবি-রাসুলকে জানার ক্ষেত্রে তো আপন বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টিকে পুরোপুরি কাজে লাগাও। কিন্তু যখন খুব বুঝে-শুনে কাউকে 'আল্লাহর রাসুল' বলে মেনে নিবে, তখন তাঁর সকল শিক্ষা ও নির্দেশনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে তার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেবে। এমন যদি না কর, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে,

এখনো তুমি তাঁকে 'রাসুল' হিসেবে গ্রহণই করনি, অথবা 'রাসুল' পরিভাষার অর্থই বোঝনি।

পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা এসেছে–

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

আর কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর এ সুযোগ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয় ফায়সালা করেন, তখন তাদের নিজেদের ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে, সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সুরা আহজাব : ৩৬]

হাদিসে নববিতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে–

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার অনুসারী হয়ে যায়। [শরহুস সুন্নাহ]

বস্তুত রিসালাত-পদমর্যাদার দাবি এটাই যে, মানুষের হেদায়েত ও নির্দেশনা বিষয়ে নবিগণ যে সকল কথা বলবেন, বিনাবাক্যে মানুষ তা মেনে নিবে এবং পুরোপুরি তার অনুসরণ করবে।

তাছাড়া নবি-রাসুলদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এর দ্বারা পূর্ণ হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে শুধু অন্তর দ্বারা ও বিশ্বাসগতভাবে নবি মেনে নিবেন এবং তাঁদের শানে প্রশংসা ও গুণকীর্তনমূলক কবিতা আবৃত্তি করবেন। বরং নবি-রাসুলগণের আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের নির্দেশিকানুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾.

আর আমি কোনো রাসুলকে প্রেরণ করিনি তবে এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে। [সুরা নিসা : ৬৪]

সুতরাং কাউকে আল্লাহর রাসুল মেনে নেওয়া ও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ বস্তুত নিজেদের বাস্তব জীবন সম্পর্কেও এই স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে, আমি আমার জীবনকে সেই রাসুলের নির্দেশিকা ও তাঁর আনীত শরিয়তের অধীন করে দিয়েছি। তাঁর অনুসরণকারী হয়েই জীবিত থাকব এবং তাঁর অনুসরণ করা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করব।

পবিত্র কোরআনে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করা ব্যতীত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না–

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন। [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও এর সুস্পষ্ট অনিবার্য দাবি ও ফলাফলকে একটু দীর্ঘ সময় মনে উপস্থিত রেখে চিন্তা করুন, কালিমায়ে তাইয়েবার মধ্যে আমরা যে মুখে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলি এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেই, এর দাবি ও দায়িত্বসমূহ আমরা কতটুকু পূরণ করছি! মুখে আল্লাহর কোনো নবি ও রাসুলের নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, আর সারাজীবন তাঁর বিপরীত পথে স্বস্তির সঙ্গে চলতে থাকা ঈমান নয়, বরং মুনাফেকি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন! আমিন!!

আল্লাহর রাসুলের সাথে ভালোবাসা

কোনো সত্তাকে 'আল্লাহর রাসুল' মানার একটি অনিবার্য দাবি এটিও যে, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ভালোবাসা তাঁর সাথে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর পর তিনিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেমাস্পদ হবেন।

ভালোদেরকে ভালোবাসা যেহেতু মানুষের স্বভাব, আর নবি-রাসুলগণ যেহেতু পৃথিবীর সকল ভালোদের চেয়ে ভালো, বরং সকল ভালোদের সরদার এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার, সমস্ত গুণ ও উৎকর্ষের মূর্তপ্রতীক, উপরন্তু তাঁরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী ও সহানুভূতিশীল, তাই তাঁদের সাথে সর্বোচ্চ স্তরের ভালোবাসা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক কথা। এ ভালোবাসাই বস্তুত নিঃশর্ত অনুসরণ এবং বিনাবাক্যে অনুকরণ ও আত্মসমর্পণের জটিলতাকে সহজ করে দেয়।

আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

এই জমিন ও আসমানকে আমি ভেবেছিলাম
অতিক্রম অসাধ্য কুলহীন পাথার;
কিন্তু প্রেমের এক লম্ফেই হলো সব সাধ্য,
অনায়াসেই আমি হয়ে গেলাম পার।

মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে এবং তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রাখে, তখন তাঁর ইঙ্গিতে চলা এবং তাঁর রঙ্গে রঙিন হওয়া তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর এ পথের পাথরও তার কাছে ফুল মনে হয়। বরং প্রেমাস্পদের ইঙ্গিতে এবং তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে, জীবন দেওয়াও তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

কবি বলেন– [অর্থ :]

প্রেমের যদি হয় গো হুকুম,
করো তোমার প্রাণ নিবেদন;
প্রেমই হলো কাম্য আসল,
কাম্য কভু নয়তো জীবন।

মোট কথা রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়নের মূল উদ্দেশ্য তথা রাসুলের অনুসরণের পূর্ণতাও, রাসুলের ভালোবাসার মাধ্যমেই সাধিত হয়। আর এটাই সেই হাদিসের উদ্দেশ্য, যাতে বলা হয়েছে– 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত

আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় না হব।' [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনার যদি সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা হয়ে যায়, তাহলে এর সর্বনিম্ন অনিবার্য ফল এই হবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুখ-দুঃখে আপনি তাঁর অংশীদার হবেন। অর্থাৎ যেসব জিনিস দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি ও আনন্দিত হতেন, আপনিও সেসব জিনিস দ্বারা প্রফুল্ল ও আনন্দিত হবেন এবং যেসব জিনিস দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ ও আঘাত পেতেন, আপনিও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট ও আঘাত পাবেন। আর তা হবে আপনার বড় সম্পদ।

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য আবেগ, উচ্ছ্বাস, গুণাবলি ও অভ্যাস-চরিত্রের আলোকরশ্মি ও কিরণমালাও আপনার উপর পড়তে থাকবে। কেননা তা ভালোবাসার অনিবার্য ফল।

এভাবে আপনি নিজের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও অভ্যাস-চরিত্র বর্জন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ ও চরিত্র এবং স্বভাব ও প্রকৃতির বরকত নিজের মধ্যে চোষণ করতে থাকবেন। আর এতেই উন্নতির পূর্ণতা নিহিত।

কবির ভাষায়-

তুমি তো এক পুষ্প-কলি
মুস্তফা বৃক্ষ-ঝাড়ের
তাই তুমি হও বাসন্তি ফুল
রাসুল পাকের সেই বাগানের।

কালিমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য

রং ও সুবাস নেবে তুমি
সেই সে পুত বাগান হতেই
আদর্শ যে নিতে হবে
তাঁর উন্নত চরিত হতেই।
পথ হতে তাঁর যদি তুমি
যাও কখনও দূরে সরে
মোদের দলে নও গো তবে
বরং তুমি অনেক দূরে।

সমাপ্ত

মিল্লাতে ইবরাহিমকে নিশ্চিহ্ন করতে এবং দাঈদের অন্তর থেকে তা মিটিয়ে দিতে

তাগুতদের কূটকৌশল

(তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো মানুষ ঈমানদার হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾.

অতএব যে কেউ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। [সুরা বাকারা : ২৫৬] এ পুস্তিকার ১৫৫ ও ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা অতিবাহিত হয়েছে।

মিল্লাতে ইবরাহিম তথা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– ১. ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন ও বিধান প্রণয়ন করে, তাদের বিধান ও আইন মান্য করাও একটি ইবাদত। এ পুস্তিকার ১৪০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হজরত আদি ইবনে হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস দ্রষ্টব্য। ২. শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার ঘোষণা করা। ৩৭ নং পৃষ্ঠায় সুরা মুমতাহিনার ৪র্থ আয়াত দ্রষ্টব্য।

মিল্লাতে ইবরাহিম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾.

আর ইবরাহিমের ধর্ম থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কে বিমুখ হয়, যে নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে? [সুরা বাকারা : ১৩০]

আরো ইরশাদ করেছেন–

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

তারপর আমি আপনার নিকট ওহি প্রেরণ করেছি যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মের অনুসরণ করুন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [সুরা নাহল : ১২৩] –সফিউল্লাহ ফুআদ।)

আপনি যদি মিল্লাতে ইবরাহিম ভালোভাবে বুঝে থাকেন এবং জেনে থাকেন যে, সেটাই সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের অনুসারিদের পথ এবং দুনিয়া-আখেরাতের সাহায্য, সফলতা ও সৌভাগ্যের পথ, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, কোনো যুগের তাগুতই মিল্লাতে ইবরাহিমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। তারা বরং এ ধর্মকে ভয় পায়। এর কারণে শঙ্কিত থাকে। তাই বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে দাঈদের অন্তর থেকে এ ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে।

আল্লাহ তাআলা অনেক আগেই এর সংবাদ দিয়েছেন। মক্কায় অবতীর্ণ সুরা কালামে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

তারা আপনার শিথিল হওয়া প্রত্যাশা করে, তখন তারাও শিথিল হবে। [সুরা কালাম : ৯]

তাগুতরা চায়, দাঈরা মিল্লাতে ইবরাহিম ছেড়ে অন্য কোনো বক্র পথ অবলম্বন করুক এবং নবি-রাসুলগণের এই সুদৃঢ় ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাক। দাঈদেরকে এই সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে তারা আমরণ পরিকল্পনা করে যায়। পরিকল্পনায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার ফাঁদে পড়ে দাঈরা তাগুতদের অনেক ভ্রান্ত বিষয়ে চুপ থাকে, তাদের মনকে খুশি করে অথবা কিছু বিষয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করে নেয়। এক পর্যায়ে দাওয়াতের কাজে ভাটা পড়ে যায়, তা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয় এবং দাঈগণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

তাগুতরা একথা ভালো করেই জানে যে, পরাজয়ের প্রথম ধাপ হলো পশ্চাৎগমন। তারপর অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এই

পশ্চাৎগমন। দাঈরা ধীরে ধীরে দাওয়াতের মৌলিক পদ্ধতি[১] ভুলে যায়। এবং এই বিস্মৃতি ও বিচ্যুতির ফলে তাগুতদের সাথে তাদের অনেক বিষয়ে বা কিছু বিষয়ে সমঝোতা হয়। তাগুতরা প্রথম দিকে এতটুকুই চায়। তাই যদি তারা লক্ষ্য করে, দাঈরা ছাড় দিচ্ছে বা পশ্চাৎগমন করছে, তখন দাঈদের সামনে তাদের ও তাদের দাওয়াতের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে, তাদেরকে কাছে টেনে নেয়, তাদের দাওয়াতি প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা প্রকাশ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا﴾.

আমি ওহি মারফত আপনার নিকট যা প্রেরণ করেছি তা থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, যেন আপনি তা [অর্থাৎ ওহি] ছাড়া অন্য কিছু [বানিয়ে] আমার প্রতি আরোপ করেন। তখন তারা আপনাকে অবশ্যই বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। [সুরা ইসরা : ৭৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন মুশরিকদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের উপাস্যদের তিরস্কার না করেন- দীন ও দাওয়াত সংশ্লিষ্ট এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুশরিকদের দরকষাকষির প্রচেষ্টা উল্লেখ করার পর এ আয়াতের তাফসিরে সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ লিখেন-

এগুলো এমন কিছু প্রচেষ্টা যা থেকে আল্লাহ তার রাসুলকে হেফাজত করেছেন। এগুলো দাঈদের সাথে ক্ষমতাসীনদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। যেমন দাঈদেরকে প্রলুব্ধ করা, যেন তারা দাওয়াতের ময়দানে দৃঢ়তা ও অবিচলতা থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও সরে আসে এবং বিপুল বিনিময় গ্রহণ করে তাগুতদের সাথে মধ্যবর্তী সমঝোতায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

---

১. ২৫৪-২৫৭ নং পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

দাওয়াতি মিশনের অনেকে এ লোভ ও প্রলোভনের শিকার হয়ে দাওয়াত থেকে সরে পড়ে। কারণ, বিষয়টিকে তারা হালকা দৃষ্টিতে দেখে। বস্তুত ক্ষমতাসীনরা এটা চায় না যে, দাঈ তার দাওয়াত থেকে পুরোপুরি সরে পড়ুক। তারা মূলত চায়, দাঈ তার দাওয়াতে হালকা পরিবর্তন আনুক, যেন উভয় কাফেলা এক মোহনায় মিলিত হতে পারে।

শয়তান কখনো এই ছিদ্র পথে দাঈর নিকট প্রবেশ করে। তখন দাঈ ভাবে, কিছু দিক থেকে সামান্য পরিমাণ সরে হলেও ক্ষমতাসীনদেরকে হাতে রাখার মধ্যেই দাওয়াতের কল্যাণ নিহিত। কিন্তু বাস্তব হলো, পথের শুরু অংশের সামান্য বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বিচ্যুতির কারণ হয়। দাঈ যখন দাওয়াতের কোনো অংশে শিথিলতাকে গ্রহণ করে নেয় –তা যত সামান্যই হোক– এবং দাওয়াতের কোনো বিষয়ে উদাসীন থাকে –তা যত অল্পই হোক–; সে তখন প্রথম শিথিলতাগ্রহণের উপর ক্ষান্ত থাকতে পারে না। কেননা, দাঈ যতই পেছনে হটবে, শিথিলতা গ্রহণের যোগ্যতা ও মানসিকতা ততই তার বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষমতাসীনরা দাঈদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকে। তাই যখন দাঈরা কোনো বিষয় মেনে নেয়, তখন ক্ষমতাসীনদের নিকট তাদের প্রভাব ও দৃঢ়তা হারিয়ে যায়। এবং তারা বুঝে ফেলে যে, দরকষাকষি ও মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দাঈদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা অতি সহজ।[১]

আর ক্ষমতাসীনদেরকে দাওয়াতের কাতারে আনার জন্য শিথিলতাকে গ্রহণ করা –তা যত সামান্যই হোক– এক ধরনের আত্মিক পরাজয়। আর এই পরাজয় অর্জন হচ্ছে দাওয়াতের সাহায্যার্থে ক্ষমতাসীনদের উপর ভরসা করার মাধ্যমে। অথচ

---

১. জনৈক বিশ্লেষক এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন– যেমন বাংলাদেশে যখন মূল্যবৃদ্ধি কওমি মাদরাসার সনদকে সরকারী স্বীকৃতি দানের স্তরে পৌঁছেছে, তখন ২০১৩ সালের ৫ই মে-র শাপলা চত্বরে সমাবেশকারী আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম বোঝার ও তার উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন! ২৪৭-২৪৮ নং পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

দাওয়াতের ময়দানে মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা জরুরি। বলাবাহুল্য, পরাজয় যখন অন্তরের গভীরে একবার প্রবেশ করে, তা আর জয়ে রূপান্তরিত হয় না!! [সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।]

বর্তমানে আমরা অনেক দাঈকে দেখতে পাই, তাগুত তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। তারা দাঈদের কোনো ক্ষতি করে না, বিরোধিতাও করে না। কেননা এই দাঈরা তাগুতদের অনেক অসার ও বাতিল বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে, মাঝপথে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করছে এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে বৈঠক করছে।

আমাদের সমকালীন বাস্তবতায় তাগুতদের কূটকৌশলের কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ–

- দাঈ ও নিজেদের অন্যান্য প্রতিপক্ষকে একত্র করার জন্য তাগুতরা বিভিন্ন দেশে সংসদ, জাতীয় পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। তারা সেখানে তাদের সঙ্গে বসে এবং নিজেদের ধর্মবিরোধী অবস্থানগুলোকে আলোচনার বিষয় থেকে সরিয়ে রাখে। ফলে ব্যাপারটা তখন তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাদের আইন ও সংবিধান প্রত্যাখ্যান করা বা তাদের সকল গোমরাহি থেকে দায়মুক্তির মধ্যে থাকে না।[২] বরং তাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতার পর্যায়ে চলে যায়। শুধু কি তাই! বরং এমন দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার টেবিলে বসার পর্যায়ে চলে যায়, যে দেশের শাসক হলো তাগুত, আর সে নিজের কুফরি ও প্রবৃত্তি দ্বারা তা শাসন করে চলছে।

  আজকের দিনে এটি এমন একটি পদস্খলন, যারা এর শিকার তাদের সঙ্গে আমরা বসবাস করছি। এসকল দাঈদের অধিকাংশ নিজেদেরকে আকাবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দাবি করে। অনেকে তো সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের বক্তব্য দ্বারাও

২. অথচ এই প্রত্যাখ্যান ও সম্পর্কছিন্নতা হলো তাওহিদের কালিমার প্রাথমিক দাবির অন্তর্ভুক্ত।

দলিল দিয়ে থাকে।[১] তা সত্ত্বেও তারা তাগুতদের সমর্থনে হাততালি দেয়। তাদের সম্মানে দাঁড়ায়। তাদেরকে বিভিন্ন মুখরোচক উপাধিতে সম্বোধন করে। তাগুত, তাগুতি শাসন ও তাগুতি সৈন্যবাহিনীর অনুগত্যের জন্য মানুষকে আহ্বান করে। এমনকি তাদের কুফরি আইন ও সংবিধানের উপর শপথ পাঠ করে। আফসোস! তাদের দাওয়াতের আর কি অবশিষ্ট থাকল!! আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

- দাঈদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে সরানোর জন্য তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, তারা আলেমদেরকে সঙ্গবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের সময়গুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যস্ত করে রাখে। নিজেদের দল ও শাসনের জন্য যাদেরকে হুমকি মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে আলেমদেরকে লেলিয়ে দেয়[২]। যেমন- সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও শিয়ামতাদর্শী ইত্যাদি বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে, যারা তাদের ও তাদের শাসনব্যবস্থার জন্য হুমকি।

তাই দেখা যায়, তাগুতরা এ সমস্ত ভ্রান্ত দলকে অপছন্দকারী উদ্যমী আলেমদের দারস্থ হয়। তাদেরকে এ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করে। দীন ও দীনদারদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে ও মুসলমানদের নিরাপত্তায় এ সকল দলের ভয় দেখিয়ে আলেমদেরকে ধোঁকা দেয়। এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য আলেমদেরকে আর্থিক ও আত্মিক সাহায্যের যোগান দেয়। ফলে এ সরলমনা আলেমরা তাদের শিকারে আটকে যায় এবং নিজেদের জীবন, সময় ও দাওয়াতকে এক শত্রুর মোকাবেলায় এবং অপর শত্রুর সাহায্যে ব্যয় করে।

---

১. মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর التفسيرُ السِّيَاسِيُّ للإسلام কিতাবে সাইয়েদ কুতুবের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন যেভাবে করেছেন, সেটাই আমার অবস্থান। তার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। –সফিউল্লাহ ফুআদ।

২. 'জামাআতে ইসলামী' প্রভৃতি বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আমাদের কতকের নিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য।

কখনো তো অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, আলেমরা নিকটবর্তী শত্রু তথা তাগুতদের সাথে শত্রুতা করার পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়। বরং একসময় তাঁরা তাগুত ও তার শাসনের একনিষ্ঠ বাহিনী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়। তাগুতদের সেবায়, তাদের ক্ষমতা ও সিংহাসন সুসংহত রাখায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে। বুঝে করুক বা না বুঝে করুক, ঘটনা তো এটাই ঘটে। আফসোস, তারা যদি আল্লাহর নবি মুসা আলাইহিস সালামের উক্তিটি বুঝত!-

﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾.

হে প্রভু! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। [সুরা কাসাস : ১৭]

আল্লামা কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রেওয়ায়েত সামনে রেখে লিখেছেন-

যে ইসরাইলি যুবক হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্য চেয়েছিল, সে কাফের ছিল। কিন্তু 'ইসরাইলি' হওয়ার কারণে মুসা আলাইহিস সালাম তাকে 'স্বীয় দলভুক্ত' বলেছেন। নিজের দলভুক্ত বলার ক্ষেত্রে ধর্মের অভিন্নতা উদ্দেশ্য নেননি। এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে অনুশোচনা করেছেন। কেননা তিনি একজন কাফেরের বিপক্ষে অপর এক কাফেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাই বলেছেন-

﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾.

অতএব আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

আফসোস! এ আলেমরা যদি আল্লাহর নিম্নের বাণী বুঝত, তাহলে যাতে তারা পতিত হয়েছে তাতে পতিত হত না।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন। [সুরা তাওবা : ১২৩]

কারণ, যদিও শিয়া ও সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি লোকেরাও ইসলামের শত্রু, তাই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা ও তাদের অসার অবস্থানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করাও জরুরি। কিন্তু জরুরি বিষয়ের উপর অতীব জরুরি বিষয়কে এবং নিকটতর জিনিসের উপর অধিক নিকটতর জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের নির্ধারিত ও বিদিত নিয়ম।

সুস্থ বিবেকও এর উল্টোটাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। কেননা সরাসরি নিকটতর শত্রুর ভয়াবহতা, তার প্রভাব, অনিষ্ট ও ফিতনা, দূরবর্তী বা পরোক্ষ শত্রুর তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। এজন্যই সাধারণ শত্রুর মোকাবেলার পূর্বে শয়তান ও নফসের মোকাবেলা করা জরুরি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনেও আমরা এর নমুনা দেখতে পাই। তিনি তাঁর নিকটের শত্রু তথা মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে উদাসীন থেকে পারস্য, রোম ও ইহুদিদের মোকাবেলা আগে করেননি।

- অনেক তাগুত এ ঝুঁকিপূর্ণ পিচ্ছিল অবস্থানের অপব্যবহার করেছে। তারা ঐ সকল হকপন্থি দাঈকে প্রতিহত করার জন্য ও ভয় দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁদের ইসলামি দলগুলোর ব্যাপারে আতঙ্কিত করার জন্য অনেক অজ্ঞ আলেমকে ব্যবহার করেছে, যারা হলেন আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে অথবা মাজহাব-মানহাজে ঐ আলেমদের প্রতিপক্ষ। বরং কখনো কখনো তাগুতরা এ সকল আলেম থেকে ফতোয়া হাতিয়ে নিয়েছে হক্কানি দাঈ ও তাঁদের দাওয়াতকে নির্মূল ও মূলোৎপালন করার জন্য; এই বলে যে, তারা খারেজি, বিদ্রোহী, ধর্মত্যাগী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ফাসাদ সৃষ্টিকারী বস্তুত ওরাই। বর্তমানে এই স্খলনে আমরা

অনেককেই নিপতিত হতে দেখছি। আল্লাহর কাছেই এর অভিযোগ করছি।

এ সমস্ত অজ্ঞ আলেমরা জানে না, যাদেরকে তারা খারেজি প্রভৃতি বলছে তারা যত বিচ্যুতই হোক, তা সর্বোচ্চ অজ্ঞতা বা অসাবধানতাজনিত বিচ্যুতি হবে। তার চেয়ে বেশি হলে জ্ঞাতসারে বারংবার ঘটিত ভুল হবে। কিন্তু তা কখনো তাগুতদের বিচ্যুতি এবং তাগুত কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধিতার পর্যায়ে পৌছাবে না।

- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, তারা দাঈ ও মুমিনদের বিভিন্ন চাকরি, পদবি ও উপাধির প্রলোভন দেখায়। যেমন- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, ধন-সম্পদ ও ফ্ল্যাট-বাড়ির লোভ দেখায়। এক পর্যায়ে তাদেরকে তারা আটকে ফেলে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা কেমন যেন এই প্রবাদ-বাক্যের বাস্তবায়ন ঘটায়, 'যার নুন খাও, তার গুণ গাও।'

এভাবেই দাঈ বা অজ্ঞ আলেমরা তাগুতদের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। অবস্থা এক পর্যায়ে এমন হয় যে, স্বয়ং তারাই বিভিন্ন ফতোয়ার মাধ্যমে তাগুতদের কাজের সমর্থন করে। হাততালি দেয়। প্রশংসা গায়। দিন-রাত তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করে।

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তালবিসু ইবলিস' কিতাবে [পৃ. ১২১] বলেন-

ফকিহদের উপর ইবলিসের একটি কূটকৌশল এটাও যে, সে তাদেরকে শাসকদের সংশ্রব ও তোষামোদে জুড়িয়ে দেয়। শাসকদের মন্দ বিষয়গুলোর নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে ফকিহদেরকে বিরত রাখে।

তিনি আরো বলেন [পৃ. ১২২]-

মোট কথা শাসকদের দরবারে গমন করা অনেক ভয়ংকর। কেননা শুরু দিকে নিয়ত যদিও ভালো থাকে, ইখলাস যদিও পূর্ণ থাকে, কিন্তু তাদের হাদিয়া ও সম্মান পাওয়ার পর নিয়ত পাল্টে

যায়। ইখলাস দুর্বল হয়ে যায়। ফলে দাঈরা তাদের তোষামোদ শুরু করে দেয়। এবং তাদের অসারতা বর্ণনা ছেড়ে দেয়।

সুফইয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

আমি শাসকদের অপমানের ভয় করি না। আমি বস্তুত তাদের সম্মান ও আমার অন্তর তাদের দিকে ধাবিত হওয়াকে ভয় করি। [ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে]

সুফইয়ান ছাওরি রাহিমাহুল্লাহ তার সময়কার যে শাসকদের ব্যাপারে এ ভয় করেছিলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি একটু চিন্তা করেন, তাহলে ঐ সকল শাসক ও বর্তমানের তাগুতদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন।[১] আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। বস্তুত ঐ আলেমের তুলনায় ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত কেউ নেই, দুনিয়া যাকে জাহেলদের খেলনার গুটিতে পরিণত করেছে এবং সম্পদের লোভ যার দীনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি 'আল্লাহ তাকে দেখেন' এই মোরাকাবা করে না এবং নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে না, সে ধ্বংস হোক, তার কোনো অভিভাবক নেই।

- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো- তারা দীন ও দাওয়াতের বিভিন্ন শাখার প্রতি নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য, এই পথ অবলম্বন করে এমন আলেম ও দাঈদেরকে কাছে টানা, যাদের ইখলাস ও আন্তরিকতা এবং জনগণ কর্তৃক তাদের মহব্বত করাকে তাগুতরা ভয় করে। তাই তারা কৌশলস্বরূপ এসকল আলেমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আবাসন, প্রচারকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে দেয়। ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও বিশ্বকোষ তৈরি সর্বোপরি ঐসকল কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করে, যেগুলোতে তাগুতদের অনিষ্টতা ও সীমালঙ্ঘনের আলোচনা থাকে না।

---

১. তখনকার শাসকদের অনেকে ছিল ফাসেক। পক্ষান্তরে যারা আইন করে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে বা বিলুপ্ত করাকে মেনে নেয়, তাদের কাজটা 'কুফরে বাওয়াহ' [প্রকাশ্য কুফর] কি-না, তা ভেবে দেখা জরুরি।

এর একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো তাগুতদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানসমূহ। যেমন- রাবেতায়ে আলমে ইসলামি।[২] এ সংস্থার উন্মুক্ত ও কদাকার পদচারণা সত্ত্বেও আমাদের অনেক আলেম না জেনে এর ধোঁকায় পড়েছেন। সংস্থাটি সাধারণভাবে জালিম ও বাতিল সরকারদের চাটুকারিতায় লিপ্ত এবং বিশেষকরে

---

২. এ প্রসঙ্গে রাবেতায়ে আলমে ইসলামির অন্যতম সদস্য, বিদগ্ধ বাংলা সাহিত্যিক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহর একটি ঘটনা উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি, যা আমি প্রবীন আলেমে দীন ও কলামিস্ট মাওলানা ইসহাক ওবায়দী হাফিজাহুল্লাহ থেকে সরাসরি শুনেছি। চলতি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কোনো একদিন নোয়াখালির এক মাদরাসায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামির একটি ঈমানবিধ্বংসী তাগুতি পদক্ষেপের বিবরণ দিলেন। লোমহর্ষক এ ঘটনা শুনে অবাক হলাম। ঘটনাটি তিনি তাঁর নির্বাচিত কলাম- 'যেমন কর্ম তেমন ফল' পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায়-

'... কোনো সাহিত্য সম্মেলনে আমার আগমন এই প্রথম। তাই আনন্দঘন এই সাহিত্য আড্ডা মজা করেই উপভোগ করছিলাম। ইসলামি সাহিত্যের বর্তমান যুগের অগ্রপথিক মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খানকে কেন্দ্র করেই মূলত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। তাঁর দীর্ঘ ৫০/৬০ বছরের সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সংবর্ধিত করে সম্মান জ্ঞাপন করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। তবে তরুণদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁর সাথে আরো নয়জন সাহিত্যসেবীকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানস্বরূপ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মাওলানার সাথে আমার দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হওয়াতে হোটেল কক্ষে বসে অনেক বিষয়ে আলাপ হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ইদানিং ইহুদী জায়নবাদীরা আমাদের পবিত্র কুরআন শরীফকে বিকৃত করার ঘৃণ্য এক প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছে। তিনি বললেন, কিছু দিন পূর্বে রাবেতায়ে আলমে ইসলামির পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি পত্র আসে যে, প্রায় সাতশ কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়, এই আয়াতগুলোকে পবিত্র কুরআন থেকে বাদ দেওয়া যায় কি না- এ মর্মে আপনার সিদ্ধান্ত পেশ করুন। (উল্লেখ্য যে, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাবেতার বাংলাদেশ সদস্য।) খান সাহেব বললেন, আমি কঠোর ভাষায় লিখে দিলাম যে, এই সকল আয়াত বাদ দেয়া তো দূরের কথা, বাদ দেয়ার চিন্তা মনে আনাও জঘন্যতম গোনাহের কাজ। তাই আপনাদের পক্ষে এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের মতামত নেওয়াও হারাম হবে। এই ব্যাপারে আবার মতামত কিসের?'

সৌদি সরকার ও তার তাগুতদের তোষামোদে পঞ্চমুখ! এজন্য দেখা যায়, যখনই এ সংস্থা থেকে কোনো বই বা লিফলেট প্রকাশিত হয়, তাতে সৌদি সরকারের চাটুকারিতা উপচে পড়ে। বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এ সংস্থা ও তার সন্দেহভাজন দায়িত্বশীলরা বিভিন্ন তাগুতি সরকারের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এবং কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে বলতে হলে সৌদি সরকারের মনোবাঞ্ছার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বহির্রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তাগুতরা যেমন চায় তারাও তেমনই চায়। যেমন- লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুআম্মার গাদ্দাফি। সে যখন আরব ও বিভিন্ন তাগুতি রাষ্ট্রে হামলা করল, তখন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও প্রতিবাদের ঝড় নেমেছিল। কিন্তু যখন অবস্থা শান্ত হয়ে গেল, তখন সকল আপত্তি ভণ্ডুল হয়ে গেল, নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় থেমে গেল। অথচ সে আগের সেই গাদ্দাফিই ছিল। তার অবস্থার পরিবর্তন তো হয়নি, বরং আগের চেয়ে আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। তারা যদি এখন তাকে তার নাপাকি ও নাফরমানিসহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে দেখে, একটুও নড়েচড়ে বসবে না। আফসোস! অভিযোগ আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি!

যাইহোক, এ প্রতিষ্ঠান ও এর মতো সংস্থাগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর আমাদের অভ্যাস হলো, তাগুতি সরকারের পক্ষ থেকে আগত ধর্মীয় কোনো উদ্যোগে আমরা আস্থাশীল নই। আমাদের অভ্যাসটি কতই না উত্তম!

- তাগুতরা অনেক সময় দাঈদেরকে দাওয়াত ও ভাষণের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে এবং 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে'র বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত সংস্থার উদ্দেশ্য, উদ্যমী দাঈদেরকে এক প্লাটফর্মে একত্র করা এবং সরকার ও তাগুতদের বিভিন্ন ভ্রান্তি বিষয়ে কথা বলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য তারা দাঈদেরকে সাধারণ লোকদের কিছু অন্যায় কাজে বাধাদানে লিপ্ত করে রাখে। কারণ, প্রথমোক্ত ভ্রান্ত কাজসমূহে বাধাদান তাগুতি

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও তাগুতি শাসনের স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। দাঈরা যতদিন এ সকল সরকার সমর্থক সংস্থা বা লাইসেন্সের সাথে জড়িত থাকে, ততদিন আর উপরের দিকে অগ্রসর হয় না।

- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, মুসলিম সন্তানদের অন্তর থেকে মিল্লাতে ইবরাহিম তথা ইসলাম ধর্ম মুছে দেওয়া। এক্ষেত্রে তারা ইনস্টিটিউট, শিক্ষালয়, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি বিভিন্ন তাগুতি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানের তাগুতরা মূলত ফিরাউন থেকেও অধিক ভয়াবহ। এক্ষেত্রে তারা ফেরাউনের চেয়েও বড় কৌশলী। ফেরাউন তো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সন্তানদেরকে প্রকাশ্যে হত্যার আদেশ করেছিল। কিন্তু বর্তমানের তাগুতরা মুসলমান সন্তানদেরকে ধ্বংস করার জন্য এক নয়া কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে যা অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক। তারা এ প্রজন্মকে ফিরাউনের মত প্রকাশ্যে হত্যা করে না। তাদের শারীরিক কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু তারা মুসলমান সন্তানদের দিল ও অন্তরে মেহনত করে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাদের অন্তর থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দেয়।

তারা মুসলিম সন্তানদেরকে তাগুতদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাগুতি শাসন ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও তা মানার আহ্বান করে। এ জঘন্য কাজটি তারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রচারমাধ্যম দ্বারা আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমাদের মুসলিম সন্তানরা আজ সেখানেই শিক্ষিত হচ্ছে। তারা আজ এসকল প্রচারমাধ্যম নিজেদের ঘরে তুলে আনছে।

মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাগুতরা আজ এ জঘন্য পায়তারাই করে চলছে। তারা মানুষকে 'হাতে মারছে না, ভাতে মারছে'। প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ মানবহত্যায় মগ্ন আছে। সাহায্য ও উপকারিতার নামে তারা আজ এসকল প্রতিষ্ঠান খুলে বসে আছে। যেন মানুষ তাদের নির্দোষ ভেবে তাদের কৃতিত্ব ও প্রশস্তি

গেয়ে বেড়ায় যে, তারা আমাদের নিরক্ষরতা দূর করছে, তারা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্ণধার। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, এসব কিছুর মধ্যদিয়ে তাগুতরা মুসলমানদের একটি বড় অংশকে তাদের ও তাদের শাসন-সংবিধানের একনিষ্ঠ ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুসারী বানিয়ে নিচ্ছে। কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই হচ্ছে যে, এ কৌশলের মাধ্যমে তারা আমাদেরকে এক নিস্তেজ, অজ্ঞ ও বিচ্যুত প্রজন্ম 'উপহার' (?) দিচ্ছে, যারা ইসলাম ধর্মের সত্য ও সঠিক দাওয়াত[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, বাতিলের চাটুকারিতা করছে। ফলে এক পর্যায়ে তারা নিজেদের শক্তি হারিয়ে ফেলছে এবং তাগুতদের মুখোমুখি হওয়া ও তাদের বিষয়ে চিন্তা-যোগ্যতার জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এ বিষয়টি আমরা আরো বর্ধিত পরিসরে আলোচনা করেছি আমাদের إِعْدَادُ القَادَةِ الفَوَارِس بِهَجْرِ فَسَادِ المَدَارِس গ্রন্থে। তাতে আমরা তাগুতদের অনিষ্টকর কৌশলগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছি।

আফসোস! এ ধরনের হোঁচট ও স্খলন দ্বারা দাঈরা কতো অধঃপতিত হচ্ছে! আলেম ও ইসলামি নেতৃত্বের উপর মানুষের যে অনাস্থা[২] –যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি– এ পদস্খলনেরই

---

১. ২৫৪-২৫৭ নং পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

২. আমাদের শিক্ষার স্বীকৃতি, শুকরিয়া মিছিল, শুকরানা মাহফিল ও সরকারী খরচে হজযাত্রায় গমনের পর, গণমানুষের চোখে আমাদের প্রতি কোনো অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তা কী পরিমাণ, নিজেরাই নির্ণয় করি। এই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে দেশের বর্তমান (২০১৯) মন্ত্রীসভার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর বক্তব্যের নিম্নের লিংক।

https://www.youtube.com/watch?v=uqpiwbB93cs

উদাহরণস্বরূপ এ লিংকের ১ ঘন্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড পরবর্তী বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যায়–

'এবার হজেও কিন্তু আমি প্রত্যেকটা কাজ একটু হেকমতের সাথে করতে পারলে ভালো হয় না? আমি আমার যাদেরকে পছন্দ, তাকে নিছি। যারা

ফল। দাঈরা আজ তাগুতদের কাছেও কত হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে! তাগুতদের দিল থেকে তাদের ভয় বিদায় নিচ্ছে[৩]। তাগুতরা আজ দাঈ ও দাওয়াতকে ভয় করে না। দাওয়াতের সামনে তারা আর সঙ্কুচিত হয় না। একে কোনো গুরুত্বই দেয় না।

পক্ষান্তরে তারা যখন দাঈদের থেকে পাহাড়সম অটলতা ও অবিচলতা দেখে, তাগুত থেকে মুক্তি, ঘৃণাভরে প্রত্যাখান এবং তাদের থেকে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করে, তখন তাগুতরা দাঈদের অনেক হিসেব করে চলে। আল্লাহ তখন তাগুতদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দেন। যেমন তিনি কাফেরদের অন্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এক মাসের দূরত্বে থেকেও কাফেররা তাঁকে ভয় করত। অতএব এ সকল পদস্খলন ও তাগুতদের খেলনার গুটিতে পরিণত হওয়া থেকে সাবধান!

আল্লাহ তাআলা তাগুতদের এসকল কল্পনার কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের পরিকল্পনাগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। সেগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। সমাধান পেশ করেছেন এবং সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। কোরআন পাকে সুরা কালামের ৯ নং আয়াতে জানিয়েছেন–

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

চিৎকার করত, তাদেরকেও সাথে নিছি। কী জন্যি? যে নামাজের সময় যদি কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে, নামাজ নষ্ট হয় না? তাহলে কুত্তাডারে যদি এক ভাগ বা এক কেজি মাংস খাওয়াই দিয়া কই– খা, তাহলে মাংস খাইতে থাকল, তা তো আর ডাকাডাকি করতে পারল না। মাঝখান দিয়া এতমিনানের সাথে আমার নামাজটা হইয়া গেল। আমি যাদেরকে নিতে চাইছি, যাদেরকে নিলে আমাদের সুবিধা হবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নিছে। যারা চিৎকার করে ঘেউ ঘেউ করবে, তাদেরও কিছু দিছি। শর্ত ছিল, যাহোক, অনেক লম্বা, সবাই মিলে কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনো গোলমাল-গোলোযোগ হয়নি।'

লিংকের ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ২৭ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট ২২ সেকেন্ড পর্যন্তের বক্তব্যটিও এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাতে বরং আরো বেশি দুরবস্থা ফুটে উঠেছে।

৩. ১৫৬-১৫৮ নং পৃষ্ঠায় 'বর্তমানের মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ' জেনে নিন।

তারা আপনার শিথিল হওয়া প্রত্যাশা করে, তখন তারাও শিথিল হবে। [সুরা কালাম : ৯]

এর পূর্বের আয়াতেই বলেছেন–

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾.

অতএব আপনি মিথুক সাব্যস্তকারীদের আনুগত্য করবেন না। [সুরা কালাম : ৮]

অর্থাৎ তাদের অনুগত্য করবেন না। তাদের দিকে ঝুঁকবেন না। তাদের সমাধান গ্রহণ করবেন না। কারণ, আপনার রব তো আপনাকে সত্য ধর্ম দান করেছেন। সরল পথ প্রদর্শন করেছেন এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তো আপনাকে মিল্লাতে ইবরাহিমের (ইসলামের) প্রতি পথনির্দেশ করেছেন।

- ঠিক অনুরূপ নির্দেশ এসেছে সুরা দাহরে। সেটিও মক্কি সুরা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾.

আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে। অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করবেন না। [সুরা দাহর : ২৩-২৪]

এ আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যের নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার পূর্বে কোরআন নাজিলের মাধ্যমে নবির উপর অনুগ্রহের বর্ণনা এসেছে। এতে দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি ফুটে উঠেছে। কেননা এ পদ্ধতি দাঈগণ নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করেন না। আর তাদের এ অধিকারও নেই যে, তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করবেন এবং তার রূপরেখা নির্ধারণ করবেন। কারণ, তা তো মিল্লাতে ইবরাহিম ও নবি-রাসুলগণের দাওয়াত, যা কোরআন পাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

- আল্লাহ তাআলার অনুরূপ আরেকটি ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে সুরা ফুরকানে। এটিও মক্কি সুরা।

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾.

অতএব আপনি কাফেরদের অনুগত্য করবেন না এবং কোরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জোরদার জিহাদ করুন। [সুরা ফুরকান : ৫২]

অর্থাৎ কোরআনে আদিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া দাওয়াতের অন্য কোনো পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করবেন না। এ কোরআনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করুন। কাফেরদের অনুগত্য হয় এমন কোনো বক্র পথের অনুসরণ করবেন না। এমন কোনো পথও অনুসরণ করবেন না, যাতে কাফেরদের কিছু বাতিল বিষয়ে চুপ থাকা হয়।

- আরেকটি উদাহরণ হলো, সুরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন তেলাওয়াত করার আদেশ করেছেন।[১] এ আদেশের পরপরই নবিকে বলেছেন–

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.

---

১. 'তেলাওয়াত' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে ইত্তিবা বা অনুসরণ। تَلَا الشَّيْءَ : তার অনুসরণ করল। পাঠ করা, শেখা, আকড়ে ধরা ও আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত তথা অনুসরণ করা, এ পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আল্লাহর সার্বক্ষণিক জিকির, তাঁর মোরাকাবা ও তাহাজ্জুদ। যেমন আল্লাহ তাআলা সুরা দাহরের উল্লিখিত আয়াতের পরপরই ইরশাদ করেছেন–

﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾.

আর আপনি আপনার রবের নাম জপতে থাকুন সকাল ও সন্ধ্যায়। এবং রাতের কিছু সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন, এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত। [সুরা দাহর : ২৫] (এ টীকাটি প্রবন্ধকারের পক্ষ থেকে।)

এবং তার আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে, আর তার কাজই হচ্ছে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। আর আপনি বলুন, সত্য বাণী তোমাদের রবের পক্ষ থেকে [আগত]। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। [সুরা কাহফ : ২৮-২৯] উল্লেখ্য, এগুলোও মক্কি আয়াত।

- সুরা শুরার নিম্নোক্ত আয়াতটিও অনুরূপ। এটিও মক্কি আয়াত। আমাদের জন্য এবং হজরত নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা প্রমুখ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা যা প্রবর্তন করেছেন তা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন–

﴿فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.

অতএব আপনি সে দিকেই আহ্বান করুন এবং অবিচল থাকুন, যেরূপ আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। [সুরা শুরা : ১৫]

কাফেরদের খেয়াল-খুশি ও বিকৃত রীতি-পদ্ধতি থেকে সম্পর্ক ছিন্নতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এর একটু পরেই তাঁর নবিকে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এই বলার আদেশ করেছেন–

﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। [সুরা শুরা : ১৫]

- সুরা জাসিয়ার নিম্নোক্ত আয়াতটিও অনুরূপ। এটাও মক্কি আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

অতঃপর আমি আপনাকে দীনের বিশেষ এক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি তারই অনুরসরণ করুন। এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোনো উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে জালেমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু। [সুরা জাসিয়া : ১৮-১৯]

গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে কোরআনে তালাশ করলে আমরা শত শত আয়াত পেয়ে যাব। বস্তুত আল্লাহ মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করে তাদেরকে বেকার ছেড়ে দেননি। আফসোস! দাঈদের জন্য কি এ ধর্মের স্পষ্টতা ও সরলতা যথেষ্ট নয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের জন্য যা যথেষ্ট ছিল, দাঈদের জন্য কি তা যথেষ্ট নয়? গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি? অসারতাগুলো সংশোধনের সময় কি আসেনি? আর কত আমরা তাগুতদের খেলনার পাত্রে পরিণত হব? হককে আর কত গোপন করব? মানুষের সামনে সত্যকে আর কত ঘোলাটে করব? সময় ও সাধনা আর কত নষ্ট করব?

কসম খোদার! যেকোনো একটি গ্রহণ করতে হবে– হয়তো আল্লাহর শরিয়ত, নয়তো মূর্খদের খেয়ালখুশি! তৃতীয় কোনো পথ নেই। অপরিবর্তনীয় শরিয়ত ও পরিবর্তনশীল খাহেশাতের মাঝে মধ্যবর্তী কোনো পথ খোলা নেই।

এসকল আয়াত দাঈদের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারপর আর কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ইসলামের মহান শরিয়তই এ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এতদ্ভিন্ন সবই মানুষের খেয়াল-খুশি, যার উৎস হলো মুর্খতা। দাঈদের জন্য একমাত্র শরিয়তের অনুসরণ করা এবং অন্যান্য সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। শরিয়তের কোনো অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের কোনো খেয়ালখুশির দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নেই।

প্রবৃত্তিপূজারী এসকল তাগুত ইসলামি শরিয়তের বিরোধিতা করতে গিয়ে একে অপরকে সাহায্য করে। তাদের কেউ আমাদের

কাউকে সাহায্য করবে এমন আশা করা বৈধ নয়। তারা সবাই হকের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। একে অপরের বন্ধু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যের কোনো ক্ষতি করার সামর্থ রাখে না। তারা কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ সত্যের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তাঁর অভিভাবকত্ব ও সাহায্যের তুলনায় বড় সাহায্য ও অভিভাবকত্ব আর কী আছে? যে শরিয়তের রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ, তার সামনে দুর্বল, মূর্খ ও ক্ষীণবল লোকেরা কোথায়? আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বন্ধু।

এটাই পথ, আছে কি কোনো পথিক!!

মূল : শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম মাকদিসি

অনুবাদ : মাওলানা মুনীর সাআদাত

ইসলামি দাওয়াতের নববি পদ্ধতি

'হিদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইনায়া' কিতাবের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (মৃ.৭৮৬হি.) রাহিমাহুল্লাহর একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। উদ্ধৃতিটি দ্বারা ইসলামি দাওয়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ক্রম যেমন বুঝে আসবে, অনুরূপভাবে কোরআন পাকের এ বিষয়ের আয়াতসমূহের মধ্যকার বৈপরিত্বের সমাধানও জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। 'হিদায়া'র 'কিতাবুস সিয়ার'-এর ব্যাখ্যায় 'ইনায়া'-র লেখক লিখেছেন–

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করার ও এড়িয়ে চলার আদিষ্ট ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾.

সুতরাং আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন। [সুরা হিজ্‌র : ৮৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। [সুরা আনআম : ১০৬]

তারপর উপদেশদান ও সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার আদিষ্ট হন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾.

আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। [সুরা নাহ্‌ল : ১২৫]

এরপর কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হন যদি আক্রমণ তাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়। ইরশাদ হয়েছে–

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾.

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। [সুরা হজ : ৩৯]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾.

যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। [সুরা বাকারা : ১৯১]

তারপর আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণ না হলেও কিছু সময় তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য রাসুল আদিষ্ট হন।

ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

অতএব যখন নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো। [সুরা তাওবা : ৫]

এরপর সকল সময় এবং সকল স্থানে আল্লাহর শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য রাসুল আদিষ্ট হন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾.

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা [শিরক] দূরীভূত হয়। [সুরা বাকারা : ১৯৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের ঈমান আনে না তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। [সুরা তাওবা : ২৯] ('ইনায়া' কিতাবের উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।)

একজন সিরাত ও হাদিস বিশেষজ্ঞ আলেম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, **কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর নববি যুগে ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে ইসলামের দিকে দাওয়াত দানকারী এমন কোনো কাফেলার অস্তিত্ব ছিল না, যাদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে তারপর জিজয়া প্রদানের আহ্বান ছিল না। এবং জিজয়া প্রদান করতে অসম্মত হলে এরপর যুদ্ধের আহ্বান ছিল না।** নিম্নের হাদিসটি লক্ষ্য করুন–

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ : «إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ :

اُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ؛ فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوْا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ.

فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ...

হজরত সুলাইমান বিন বুরাইদা রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা বুরাইদা বিন হাসিব আসলামি রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো যুদ্ধবাহিনীর আমির বানিয়ে পাঠাতেন, তখন তাঁকে তাঁর নিজের ব্যাপারে এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের বিষয়ে কল্যাণমূলক আচরণে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। এবং বলতেন–

যখন তুমি তোমার শত্রু মুশরিকদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করবে। তারা যদি সাড়া দেয় তাহলে তা তুমি গ্রহণ করো এবং তাদের থেকে বিরত থাকো।

১. তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকো। যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাহলে তাদের সাড়া দেওয়াকে গ্রহণ করো এবং তাদের থেকে বিরত থাকো। এরপর তাদেরকে তাদের এলাকা থেকে মুহাজিরদের এলাকায়

স্থানান্তর হওয়ার কথা বলো। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, যদি তারা এ আহ্বান গ্রহণ করে, তাহলে তারা সেসকল সুবিধা পাবে যা মুহাজিররা পায়; এবং তাদের উপর সে সব দায়িত্ব বর্তাবে যা মুহাজিরদের উপর বর্তায়।

যদি তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে এবং নিজেদের বাড়িঘরে থেকে যায়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের অবস্থা গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের অবস্থার মতো হবে। মুমিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বিধান প্রয়োগ হয়, তা তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হবে। তবে 'ফাই' ও গনিমতের মধ্যে তাদের কোনো অংশ থাকবে না, অবশ্য যদি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয়।

২. আর যদি ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে জিজয়া দিতে আহ্বান করো। যদি তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করো এবং তাদের থেকে বিরত থাকো।

৩. পক্ষান্তরে তারা যদি জিজয়া দিতেও অস্বীকার করে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।...[১]

১. সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফি দুআইল মুশরিকিন দ্রষ্টব্য। হাদিস নং ২৬১৪।

একজন তরুণের অভিব্যক্তি

শোকর তোমার হে আল্লাহ। একমাত্র তোমার তাওফিকেই প্রকাশিত হলো التَّمْهِيْدُ। الوَلَاءُ والبَرَاءُ في الإسلام কিতাবের অংশের অনুবাদ। তোমার ওয়াদা হলো–

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব নিশ্চিতরূপে জানিয়ে দিলেন- যদি তোমরা শোকর কর, অতি অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব। [সুরা ইবরাহিম : ৭]

আমি শোকর করলাম, অতএব তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করো। আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহ, বিশেষকরে সুস্থ্যতা ও অবসর থাকার[২] অনুগ্রহ আরো বেশি দান করো। আমিন!

* * *

কিতাবটির শুরুতে গ্রন্থকার শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ও তাঁর শায়খ আল্লামা আবদুর রাজ্জাক আফিফি রাহিমাহুমাল্লাহর অবতরণিকার আলোকে, তাওহিদের কালিমার আহাম্মিয়্যাত এবং 'ওয়ালা-বারা' তথা শত্রুতা-মিত্রতা বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করার তাড়না অনুভব করছি। আশা করি লেখক-পাঠক সকলের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শায়খ কাহতানি লিখেন, সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অতুলনীয় রহমত ও অনুগ্রহ হলো, তিনি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে সর্বশেষ নবুয়ত বানিয়েছেন। তাকে বানিয়েছেন স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ। ধ্বংস হওয়াই যার পরিণতি, সে ছাড়া কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও

২. এখানে 'অবসর থাকা'র অর্থ হলো, নিজের নির্ধারিত কাজ করার জন্য অন্য সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকা।

CamScanner

পরকাল উভয় জগতের সৌভাগ্য ও সফলতা এ নবুয়তের ঐ সকল অনুসারীদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, যারা তার যথাযথ মূল্যায়ন করে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে তার অনুসরণ করে এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বন্ধু ও তাঁর দল উপাধিতে ভূষিত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা এই শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হয় এবং সরল পথ থেকে বিমুখ থাকে, তাদের কপালে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা লিখে রেখেছেন। উপরন্তু তাদেরকে শয়তানের বন্ধু ও তার দল নামে আখ্যায়িত করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের মূল হলো, তাওহিদের কালিমা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর ভাষায়- 'এই মহান কালিমার জন্যই সকল মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আমলনামা লিপিবদ্ধ করার ধারা চালু করা হয়েছে, জান্নাত-জাহান্নামের বাজার বসেছে। এর ভিত্তিতেই সৃষ্টিকুল মুমিন-কাফের, সৎ-অসৎ- এ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং ইসলামি উম্মাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর স্বার্থেই জিহাদের জন্য তরবারি কোষমুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি তা সকল মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার।

এ কালিমার মূলে রয়েছে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে আগমন করেছেন তা ভালোভাবে জানা, আকিদা বানিয়ে তা সত্যায়ন করা, উচ্চারণ করে তার স্বীকৃতি দেওয়া, ভালোবেসে ও বিনম্রচিত্তে তার অনুগত হওয়া, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তার উপর আমল করা এবং যথাসম্ভব তা বাস্তবায়ন করা ও তার দিকে দাওয়াত দেওয়া। তার পূর্ণতা হলো কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য দান করা এবং আল্লাহর জন্য বিরত থাকা। এক-অদ্বিতীয় আল্লাহকে নিজের ইলাহ ও উপাস্য বানানো।

এ কালিমার হাকিকত নিজের মধ্যে আনার পদ্ধতি হলো, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ক্ষেত্রে একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজের অন্তর্চক্ষু বন্ধ রাখা।'[১]

এই মহান কালিমাটি তার সকল তাৎপর্য ও দাবিসহ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের অনুভূতি ও বাস্তব জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সে সকল দাবিসমূহের অন্যতম হলো 'ওয়ালা-বারা'র বিষয়টি। তবে এই 'হারিয়ে যাওয়া' দ্বারা তার সুস্পষ্ট বাস্তবতার কিছু যায় আসে না। কারণ, বিষয়টি তাওহিদের আকিদার বাস্তব প্রয়োগের কার্যত রূপ। বস্তুত তাওহিদের আকিদা যে পরিমাণ মহান ও গুরুত্ববহ, একজন প্রকৃত মুসলমানের নিকট 'ওয়ালা-বারা'র বিষয়টি সে পরিমাণই গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ। যে ব্যক্তি 'ওয়ালা' তথা বন্ধুত্ব লাভের উপযুক্ত, তার সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ এবং যে ব্যক্তি 'বারা' তথা শত্রুতা পাওয়ার উপযুক্ত, তার সঙ্গে শত্রুতাসুলভ আচরণ করা ব্যতীত পৃথিবীতে কখনো তাওহিদের কালিমা বাস্তবায়ন হতে পারে না।

অধ্যাপক শায়খ আফিফি বলেন, সমকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর রয়েছে অনেক মর্যাদা ও গুরুত্ব। কারণ, তা ইসলামের অন্যতম মৌলিক দিক তথা 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' বিষয়ে রচিত। 'ওয়ালা' হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর নবি-রাসুল ও ঈমানদারদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে 'বারা' হচ্ছে বাতিল ও বাতিলপন্থীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। বলাবাহুল্য, এটি ঈমানের একেবারে মৌলিক বিষয়।

গ্রন্থটি আরো প্রাসঙ্গিক হওয়ার বিচার হলো, দুনিয়ার পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত ঘোলাটে। মানুষের অন্তরে ঈমান ও তার দাবিসমূহ খুবই নড়বড়ে অবস্থায়। লোকেরা ঈমানদারের ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে উদাসীন, যেগুলোর ভিত্তিতে তাঁরা কাফেরদের থেকে পৃথক হন। এমনকি মুমিন নামধারী অনেকের মঝে এমন অসংখ্য কার্যকলাপ দেখা যায় যেগুলো প্রকৃত মুমিনের সাথে যায় না ।

---

১. بَدَائِعُ الفَوَائِدِ তাহকিক, জাবের ইউসুফ, পৃ. ১৪৩

মানুষ এখন কাফের জাতিবর্গ ও তাদের দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে উঠে পড়ে লেগেছে। মুমিনদের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ আচরণ করছে। তাদের মানহানি ও কঠিন শাস্তিপ্রয়োগে নুন্যতম দ্বিধাও করছে না। এ থেকে-ই গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে ফুটে আসে।

তাই এমন একটি গ্রন্থের –হোক না শুধু ভূমিকা পর্বের– অনুবাদ আসা নিঃসন্দেহে বড় সুখকর কথা। অনুবাদের জন্য এখন শুধু ভূমিকা পর্বকে নির্ণীত করার কারণ 'অনুবাদকের কৈফিয়ত' শিরোনামে এ বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

* * *

অনুবাদক মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু] আমার আব্বু। চলতি ১৪৪০-৪১ শিক্ষাবছর আমি মাহাদে তাঁর সাহচর্যে আছি।[১] এ বছর মাহাদের যেসকল কিতাব আমার মারহালায় পাঠ্যসূচিতে রয়েছে, তন্মধ্যে শায়খ ডক্টর মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি

---

১. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,'মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা' নামক মাদরাসাটি ১৪৩৪ হিজরির শাবান মাসে [২০১৩ খ্রি.] আব্বুর এক বিশিষ্ট শাগরিদ মাওলানা আবদুল আজিজ হাফিজাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরিচলানা করে আসছেন। আব্বু সূচনাকাল থেকেই মাদরাসাটির শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক। শুরু থেকেই তিনি 'দারুল উলুম মাদানীনগর মাদরাসা' থেকে এসে প্রতি সোমবারে এখানে দরস প্রদান করতেন। মাদানীনগর থেকে স্থানান্তর হওয়ার প্রায় ৭ মাস পূর্বে [৪ সফর ১৪৩৯ হি./২৫ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. বুধবার] হজরত মুহতামিম সাহেবের নিকট ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদায় চেয়ে, ১৪৩৮-৩৯ শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করার পর ২৫শে শাবান এখানে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

তিনি মাদানীনগর থেকে স্থানান্তরিত হলেও মাদরাসার সকল উস্তাদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা ও মহব্বতের সম্পর্ক পূর্বের মতো বহাল থাকে। পূর্বের মতো পরবর্তী শিক্ষাবছরও [১৪৩৯-৪০] আমি সেখানে পড়াশোনা করি। তারপর গত শাবান [১৪৪০ হি.] মাসের এক শুভ দিনের শুভ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে ও আমার অনুরোধে সিদ্ধান্ত হয়েছে– আগামি শিক্ষাবর্ষ [১৪৪০-৪১] আমি আব্বুর সোহবতে থাকব। পরে আব্বু আমাকে নিয়ে হজরত মুহতামিম সাহেবসহ মাদরাসার উচ্চ পর্যায়ের ১১ জন উস্তাদের সঙ্গে দেখা করে আমাকে কিছুদিন তাঁর নিকট রাখার ব্যাপারে তাঁদের সন্তুষ্টি ও অনুমতি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমার মুহসিন সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন!

রাহিমাহুল্লাহ রচিত الولاء والبراء في الإسلام কিতাবটি অন্যতম। এটি পাঠদানের দায়িত্বে রয়েছেন আব্বু নিজেই। দরস শুরু হওয়ার পূর্বে আব্বু আমাকে ডেকে বললেন, কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন যতটুকু পড়ানো হবে, ততটুকুর অনুবাদ ঐ দিনেই নিয়ে আসবে। আমি দরসের কোনো কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যথাসাধ্য কাজটি অব্যহত রাখি। এরই মধ্যে আব্বু একদিন ডেকে বললেন, পুরো কিতাবের অনুবাদ সম্পন্ন হওয়া তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আপাতত ভূমিকা অংশটি দ্রুত পাঠকের সামনে আসা প্রয়োজন। তখন আমার চেষ্টা লাভ করে নতুন উদ্যম। এভাবে এ কিতাবের আব্বুর অনুবাদের ভিত্তিমূলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানীতে আমাকে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার বিভিন্ন পর্বেও আব্বুর সঙ্গে থাকার তাওফিক লাভ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

* * *

বলাবাহুল্য, জীবনের বর্তমান স্তরে পৌঁছার পথে জানা-অজানা অসংখ্য জনের রয়েছে আন্তরিক প্রচেষ্টা। মনে পড়ে অনেকের কথা। বিশেষকরে আম্মুর। আমার বয়স তখন তিন কি চার বছর। আমার তখনকার প্রিয় বার্মিজ আচার পাওয়া যেত দু' টাকায় পাঁচ প্যাকেট। আমাকে পড়ানো যখন আম্মুর রুটিন ছিল, তখন তো পড়াতেনই। যখন ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, দু' টাকার লোভ দেখিয়ে তখনও আমাকে বসিয়ে দিতেন আমপারা পড়ার জন্য। একবার খতম করলেই দু' টাকা। কী মজা! আম্মু তো প্রায় বলেন- 'তোকে কতবার যে আমপারা খতম করিয়েছি তার হিসাব নেই।' তাছাড়া আব্বুও কি কম করেছেন?! কত কষ্ট সহ্য করে তিলে তিলে বড় করেছেন আমাদের! এই সে দিনও...।

অতএব আমি ইনশাআল্লাহ তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে যাব। যদি আমার বর্তমানে তাঁদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, আমি তাদেরকে 'উফ' বলব না এবং তাদেরকে ধমক দেব না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলে যাব। আর করুণাভরে তাদের সামনে বিনয়ের ডানা ঝুঁকিয়ে যাব এবং মাটির উপরে বা নিচে যেখানেই

থাকুন, বলে যাব- رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন]।

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾. (سورة بني إسرائيل : ٢٣-٢٤)

আমাকেসহ পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সন্তানকে আল্লাহ তাআলা তাঁর এই নির্দেশনা অনুসারে পিতামাতার হক আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

আলোচ্য অনুবাদের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা -তা পুরো কাজের দিকে তাকালে যত ক্ষুদ্রই হোক- উপলক্ষে মনে পড়ে আমার আরবিভাষার প্রথম শিক্ষক মাওলানা লুৎফুর রহমান উস্তাদজির কথাও। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন! কীভাবে পরিশোধ করব তাঁর ও এমন অসংখ্য জনের অসংখ্য ঋণ? আল্লাহ তাআলা সকলকে তাঁর আপন শান ও মর্যাদা উপযোগী দুনিয়া-আখেরাতে সর্বোত্তম জাযা প্রদান করুন। আমিন!

* * *

আব্বু বলেছেন, এ পুস্তিকা অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্য হলো, فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى তথা আসহাবে কাহফের অনুকরণকারী এমন কতিপয় তরুণ তৈরি হওয়া, যারা আপন রবের প্রতি ঈমান আনবে, আর রব তাঁদের বোধ-শোধ বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ আব্বুকে আদর্শ পূর্বসূরি বানান। এবং আমাকে ও সকল উলামা-তালাবা ও সাধারণ মুসলমানকে বানান তাঁর উত্তম উত্তরসূরি। আল্লাহ আমাকে ও প্রিয়ভাজন সকলকে ইখলাস ও ইখতিসাসের [আন্তরিকতা ও বিশেষজ্ঞতার] সাথে দীনের খেদমত করা এবং হজরত ইবরাহিম ও ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের উপদেশ অনুসারে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দিন। আমিন!

পরিশেষে আল্লাহর নিকট আমল করার তাওফিক চেয়ে হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর একটি বাণী উল্লেখ করে এ অভিব্যক্তির ইতি টানছি-

«مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ بِذلِكَ؛ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُوْنَ كَذلِكَ؛ وَقَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاةُ النـاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذلِكَ لَا يُجْدِيْ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا».

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছে, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করেছে, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করেছে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করেছে, তো এর মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জিত হবে। আর কোনো বান্দা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে না, যতক্ষণ না তার অবস্থা এমন হয়, যদিও তার সালাত-সিয়াম অনেক হয়। বর্তমানে মানুষের ভ্রাতৃত্ব হয়ে পড়েছে দুনিয়ার বিষয়াদির ভিত্তিতে। আর এমন ভ্রাতৃত্ব লোকদের কোনো উপকারে আসবে না। [হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ : ৩১২]

وما توفيقي إلا بالله، عليه تَوَكَّلْتُ وإليه أُنِيبُ، وآخِرُ دَعْوَانـا أَنِ الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

বিনীত

সাইফুল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)

১৮-০১-১৪৪১ হি. মোতাবেক ১৮-৯-২০১৯ ঈ.

বুধবার

প্রথম পুস্তিকা-লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম, জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা

- নাম : মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি। [রাহিমাহুল্লাহ]
- জন্ম তারিখ : ১৩৭৬ হিজরি।
- জন্মস্থান : সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের 'আসির' প্রদেশের 'সারাত আবিদ' জেলায়।
- স্নাতক অনুষদ : শরিয়া অনুষদ।
- স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয় : মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সাধারণ বিশেষজ্ঞতা : ইসলামি আইন।
- বিশেষ বিশেষজ্ঞতা : ইসলামি আকিদা।

অংশগ্রহণ ও ইলমি দক্ষতা

- দাওয়া ও ধর্মশাস্ত্র অনুষদের সহকারি অধ্যাপক, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডিং বিভাগের প্রধান।
- মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত আবু বকর সিদ্দিক জামে মসজিদ ও আল-ফুরকান জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব।
- অবসর গ্রহণের পর শরিয়া আইনজীবি।
- সৌদি আরবের পাশাপাশি কাতার, নেদারল্যান্ডস ও ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান।

ইলমি খেদমত

- ✓ الوَلَاءُ والبَرَاءُ فِي الإسلام [رِسَالَةُ مَاجِسْتِيْر].
- ✓ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد [تحقيق] [رسالة دُكْتُوْرَاه].
- ✓ شرح السنة للبربهاري [تحقيق]

- ✓ تزكية النفس لابن تيمية [تحقيق]
- ✓ الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني [تحقيق]
- ✓ الاستهزاء بالدين وأهله.
- ✓ عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق.
- ✓ الإعلام بنقد كتاب نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام
- ✓ ويكون الدين كلُّه لله.

- মৃত্যু তারিখ : ২০-০১-১৪৪০ হিজরি মোতাবেক ০১-১০-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ সোমবার। আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে রাখুন। আমিন!

দ্বিতীয় পুস্তিকার লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রাহিমাহুল্লাহ। ইতিহাসের এক স্বর্ণসন্তান। গভীর জ্ঞান, শেকড়স্পর্শী চিন্তা, উদার চরিত্র, আপসহীন আদর্শ, পরিচ্ছন্ন বোধ, উম্মাহর প্রতি অকৃত্রিম দরদ আর নিমগ্ন সাধনায় তিনি ছিলেন তাঁর কালের এক অনন্য প্রতিভা। কর্মজীবনে অবধ্য তার্কিক, ধীমান মুহাদ্দিস, সময়সচেতন লেখক ও অমিততেজ সম্পাদক। দেওবন্দি চিন্তা, দর্শন, চরিত্র ও আদর্শের চির অম্লান ছবি ছিল তাঁর জীবন। বিনয়ে মৃত্তিকাসম এই মহান মনীষী যখন আদর্শের অঙ্গীকারে লাভাময় হতেন, চারপাশ বিমন্ত্রিত হতো তখন সংগ্রামের মন্ত্রে। বাতাস শব্দময় হতো– এই তো দেওবন্দি আলেমের মুখ!

জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাথমিক জীবন

মাওলানা নোমানি ছিলেন গত শতাব্দির তারকা পুরুষ। ১৯০৫ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার সাম্ভাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২২ বছর বয়সে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর প্রথম ৩ বছর আমরুহায় শিক্ষকতা করেন। তারপর দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় ৪ বছর শায়খুল হাদিসের আসন অলঙ্কৃত করেন।

যাদের আলোয় আলোকিত হয়েছেন

শিক্ষাজীবনে তিনি সমকালীন ইমাম বুখারি বলে খ্যাত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহর যোগ্য শিষ্য। সান্নিধ্য পেয়েছেন হজরত থানবি ও হজরত মাওলানা ইলিয়াস রাহিমাহুমাল্লার। তিনি মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরি রাহিমাহুল্লাহর বিশেষ খলিফা। সবশেষে শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভি রাহিমাহুল্লাহর একান্ত প্রিয়ভাজন, আস্থাভাজন ও চেতনার

সহযাত্রী। দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার মজলিসে শুরার আমরণ সদস্য।

তাঁর রচিত আলোর পিদিম

ইসলামি গ্রন্থাগার তাঁর অতুলনীয় ছোট-বড় রচনাসমষ্টিতে বিপুল সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর *ইসলাম কিয়া হ্যায়?*, *দীন ওয়া শরিআত*, *কুরআন আপসে কিয়া কেহতা হ্যায়*, *কালিমায়ে তাইয়েবা কি হাকিকত*, *মাআরিফুল হাদিস*, *আলফিয়্যাতুল হাদিস* সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার অনন্য নমুনা। তেমনিভাবে একজন সচেতন ও দরদি দাঈর পরিচয় মেলে তাঁর *তাহদিসে নিআমাত*, *মাওলানা মওদুদি কে সাথ মেরি রিফাকাত কি সারগুযাশত আব মেরা মাওকিফ*, *ইরানি ইনকিলাব ইমাম খামেনি আওর শিয়িয়্যাত* এবং *কাদিয়ানি কিউঁ মুসলমান নেহিঁ* ইত্যাদি গ্রন্থে।

একটি বাতি : যার আলো ফুরোই না

মাওলানার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত *মাসিক আল-ফুরকান* পত্রিকা সাধারণ মানুষের মাঝে দীনি জ্ঞান বিতরণের যে অনন্য খিদমত করেছে, তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিশেষকরে পত্রিকাটির *মুজাদ্দিদে আলফেসানি* ও *শাহ ওলিউল্লাহ সংখ্যা* দুটো। তাছাড়া পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ের ছোট-বড় সকল জীবন সমস্যার এমন সুষ্ঠু সমাধানের পথ দেখাত, যেন এটিই সাধারণ মানুষের দীন শেখার অন্যতম প্লাটফর্ম।

জীবনভর তিনি হজরত থানবি, হজরত মাদানি, হজরত রায়পুরি, হজরত শায়খুল হাদিস রাহিমাহুমুল্লাহর সোহবত ও স্নেহধন্যে নিজেকে বিপুল রাঙিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর সকল খিদমত কবুল করুন!

অনন্তকালের দিকে যাত্রা

অতঃপর ১৯৯৭ সালের মে মাসের ৪ ও ৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে মহান রবের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁর কবর হোক জান্নাতের টুকরো! আমিন। (গ্রন্থনা : মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান)

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

নাম, বংশ, জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা

- নাম : সফিউল্লাহ ফুআদ। [আফাল্লাহু আনহু]
- বংশলতিকা : পিতা : আবদুল কাদির। দাদা : আমজাদ আলি। পরদাদা : ওয়ালি মাওউদ। দাদার দাদা : দানিশ মাওউদ। তাঁর মায়ের নানী ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত আরব মহীয়সী। মায়ের নানা তাঁকে হজের সফরে বিবাহ করে আরব থেকে এ দেশে নিয়ে আসেন।
- জন্ম : ১৩৯২ হিজরির ১২ই সফর মোতাবেক ৪ঠা চৈত্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ / ১৮ই মার্চ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার দিবাগত রাত। জন্মস্থান : কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চান্দিনা থানাধীন বসন্তপুর গ্রামের পূর্ব ভুঁইয়াপাড়া।
- প্রথম মাদরাসা : পার্শ্ববর্তী দারোরা গ্রামে অবস্থিত 'জামিয়া ইসলামিয়া আলতাফিয়া' মাদরাসা।
- দাওরা হাদিস : প্রথমে ঢাকার 'জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা' মাদরাসায়। শিক্ষাবর্ষ : ১৪১৪-১৫ হিজরি। তারপর ভারতের 'জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ' বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাবর্ষ : ১৪১৫-১৬ হিজরি।
- আরবি সাহিত্য : দারুল উলুম দেওবন্দে। শিক্ষাবর্ষ : ১৪১৬-১৭ হিজরি।
- আত্মিক দীক্ষা : ঢালকানগরের মুরশিদ মাওলানা আবদুল মতিন বিন হুসাইন হাফিজাহুল্লাহর নিকট। ১৪৩৩ হিজরিতে মাওলানা তাঁকে সোহবত ও বাইয়াতের ইজাজত প্রদান করেন।
- পছন্দের শীর্ষ তালিকায় : মহান দাঈ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি ও মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি

রাহিমাহুমাল্লাহ। শুধু তাঁদের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে ১৪১৩ হিজরির [১৯৯৪ ঈ.] শেষ দিকে তিনি লখনৌ সফর করেন।

শিক্ষকতার জীবন

- দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রেরিত হয়ে ভারতের কেরালা প্রদেশের মানজিরি এলাকার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ 'জামিয়া নাজমুল হুদা'য় হাদিসের উস্তাদ। শাওয়াল ১৪১৭ হিজরি থেকে শাবান ১৪১৯ হিজরি পর্যন্ত।

- 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'-র 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র মুশরিফ উস্তাদ। ১৪১৯ হিজরির শাওয়াল থেকে ১৪২১ হিজরির শাবান পর্যন্ত।

- ঢাকার গেণ্ডারিয়াতে অবস্থিত 'জামালুল কোরআন মাদরাসা'র হাদিসের উস্তাদ। ১৪২১ হিজরির শাওয়াল থেকে ১৪২৩ হিজরির শাবান পর্যন্ত।

- 'আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা'-এর হাদিসের উস্তাদ এবং 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র মুশরিফ উস্তাদ। ১৪২৩ হিজরির শাওয়াল থেকে ১৪৩৯ হিজরির শাবান পর্যন্ত ১৬ বছর।

- 'মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা'র শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক। ১৪৩৯ হিজরির রমজান থেকে। এ পুস্তিকার ২৬১ নং পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

  উল্লেখ্য, মাহাদটি ১৪৩৪ হিজরিতে এ নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন ও পরিচালনা করে আসছেন গোপালগঞ্জ জেলার আলেম মাওলানা আবদুল আজিজ। আল্লাহ মাহাদ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমিন!

মাসলাক

এ পুস্তিকার ১৭০-১৭১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত মূলনীতি ও ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি দেওবন্দি।

তালিবে ইলমদের ব্যাপারে তাঁর স্বপ্ন ও উপদেশ

তালিবে ইলমদের ব্যাপারে তাঁর স্বপ্ন ও উপদেশ তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষভাবে তাঁর এই দুই বইয়ে- 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' ও 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি'।

লিখিত ইলমি খেদমত

১৪৪০ হিজরির রবিউল আউয়াল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর লিখিত ইলমি খেদমতের তালিকা পাওয়া যাবে তাঁর প্রকাশিত আরবি রোজনামচাসমগ্র نَظَّارَةُ مُعَلِّمٍ وَنَظَرَاتُه [একজন শিক্ষক : দর্পণ ও দর্শন]-এর প্রথম খণ্ডের শেষে مُوْجَزُ تَرْجَمَةِ صاحِبِ الْيَوْمِيَّاتِ শিরোনামের অধীনে।

উল্লেখ্য, বাংলাভাষায় 'একজন শিক্ষক : দর্পণ ও দর্শন' নামে তিন খণ্ডে তাঁর যে রোজনামচাসমগ্র প্রকাশিত রয়েছে, نَظَّارَةُ مُعَلِّمٍ وَنَظَرَاتُه কিতাবটি তার আরবি অনুবাদ নয়। বরং এটি আরবি ভাষায় লিখিত ৬ মাসের স্বতন্ত্র রোজনামচারসমগ্র। আল্লাহ চাহে তো অচিরেই প্রকাশিত হবে কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ড। তা হবে পরবর্তী ৬ মাসের লিখিত আরবি রোজনামচাসমগ্র।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল কাজ, সন্তান-সন্ততি ও ছাত্রদেরকে তাঁর এবং কোনো না কোনোভাবে তাঁর উপর যাদের হক রয়েছে তাঁদের সকলের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। সর্বোপরি তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। আমিন!

সংগীত প্রকাশন

সংগত
প্রকাশন
প্রদীপ ঘোলে যাই

CamScanner

গ্রন্থদ্বয় পরিচিতি

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

শায়খ মুহাম্মদ বিন সাঈদ কাহতানি রহ.

পুস্তিকাটি মূলত الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ فِي الْإِسْلَامِ (ইসলামে শত্রুতা-মিত্রতা) গ্রন্থের التمهيد (ভূমিকা) অংশের অনুবাদ। পবিত্র মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত 'উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র আকিদা শাখা থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের থিসিসরূপে গ্রন্থকার এটি রচনা করেছেন। এর পর্যালোচনা পর্ষদে ছিলেন নিম্নবর্ণিত স্কলারগণ-

১. থিসিসটির তত্ত্বাবধায়ক শায়খ অধ্যাপক মুহাম্মদ কুতুব (চেয়ারম্যান)
২. শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফি (সদস্য)
৩. ডক্টর আবদুল আজিজ উবাইদ (সদস্য)

১৪০১ হিজরির শাবান মাসের ৪ তারিখ রোজ শনিবার দিবাগত রাতে গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে গ্রন্থকারকে 'মুমতাজ' গ্রেডে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে।

কালিমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রহ.

পুস্তিকাটিতে ইসলামের দাওয়াতের কালিমা তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ-এর উভয়াংশ (তাওহিদে ইলাহি ও রিসালাতে মুহাম্মদি)-র ব্যাখ্যা পূর্ণ তাহকিকের সাথে যথাসম্ভব প্রভাবপূর্ণ শৈলীতে করা হয়েছে। কালিমার প্রাণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, গ্রহণকারীদের নিকট এর দাবি কী?

সওগাত প্রকাশন

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুন নূর

২য় তলা, ১১/১ ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৯৭১৯৬০০৭১